শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ　মকর সংক্রান্তি / ১৩৪৩

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : প্রসূন বসু
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

কুড়ি টাকা

ভূমিকা

রসো বৈ সঃ ! সচ্চিদানন্দে যে কত রস বিদ্যমান, তার ইতি করা যায় না। আকাশ ও প্রাণরস স্পন্দনে সূক্ষ্ম, স্থূল, .কঠিন, তরল বায়ব সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার যেন ভেল্কি। যাঁরা নিত্য ভাগীরথী সেবা ক'রে থাকেন, হয় তো দেখিয়াছেন—বর্ষাগমে কোথায় কিছু নাই, অকস্মাৎ জাহ্নবী-জীবন কাঁকড়া পোকায় পূর্ণ ; এত অধিক যে অনুমানের অতীত ! সে সময় স্নান-পানে দারুণ অস্বস্তি। আবার তিন চার দিন পরে কোথায় কিছু নাই ! বিশ্ব-সৃষ্টি—ঠিক ঐরূপ !

আবার জল-রসের আশ্চর্য মহিমা ! একই মেঘ-বারিতে বিভিন্ন বীজ, কন্দ, মূল, ফল ও ফুল কিরূপে শ্বেত-পীতাদি বিচিত্র বর্ণে শোভা পায়, ও ঋজু-বক্রাদি আকার ধারণ করে। আর তিক্ত কষায় মিষ্টাদি স্বাদযুক্ত হয়, এবং স্নিগ্ধ, মধুর ও উগ্র গন্ধ হয়, ভাবলে জ্ঞান থাকে না ! পুনঃ প্রাণিপর্য্যায় আকার-প্রকার-ভেদে অন্তরে যুগপৎ হিংসা-প্রীতি, কাম-শান্তি প্রভৃতি সম ও বিষম রসের প্রকাশ, এ রহস্যে দিশাহারা হ'তে হয় !

ঠাকুর যে কি, তা বলা—বোবার স্বপ্ন-দেখার মতো। ভক্ত-কল্যাণ-কামনায় প্রভু গাম্ভীর্য্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, আবার হাস্যকৌতুকাদি কত যে রসের অবতারণা করিতেন—ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। শিবমহিম্ন স্তবে ভক্ত পুষ্পদন্ত গাহিয়াছেন—এমন তত্ত্ব নাই, প্রভো, যাহা তুমি নও। ঠাকুর আমার ঠিক্ তাই। করুণাপুরঃসর কহিতেন—অন্নগত, অল্পবুদ্ধি তোরা, কি ক'রে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধারণা করবি ? আমাতে প্রাণ ঢেলে দে, সর্বার্থ সিদ্ধি হবে।

ভক্তসঙ্গ-বিরত দেখে আমায় একদিন বলেন—বেশ ! আমাকে নিয়েই থাক। যেমন নন্দরাণী গোপীদের উপর অভিমান ক'রে বলেছিলেন—বেঁচে থাক্ আমার চূড়া-বাঁশী, কতশত মিলবে দাসী। সেই অবধি প্রভুই আমার সম্বল। প্রার্থনা—সকলেরই সম্বল হউন।

প্রথম সংস্করণে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় সতীশচন্দ্র অনেকগুলি চিত্রসম্পদে গ্রন্থের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য শত শত আশীর্বাদ।

মকর সংক্রান্তি, ১৩৪৩ সাল,
২০ নং বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়—অবতারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়—ধর্মসম্মিলন

একবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায় – জগদ্‌গুরু-উপদেশামৃত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীর অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

অনুশীলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়—অবতারণা

ধর্ম

ভগবদংশ মানবকে যিনি তৎসকাশে মিলিত করিয়া দেন, তাঁহার নাম ধর্ম। দেশ, কাল, পাত্র, তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ধারণাশক্তি অনুযায়ী, বিভিন্নভাবে প্রচারিত হন বলিয়াই, ধর্ম সনাতন হইলেও যে বহু ভাব ধারণ করেন, তাহাই যুগধর্ম নামে আখ্যাত। এই যুগধর্ম পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত ;—সকাম ও নিষ্কাম। স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিদান-প্রত্যাশায় যাহা আচরিত হয়, তাহা সকাম, আর পুরস্কারের কামনা ব্যতিরেকে কেবল পরার্থে বা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে নিষ্কাম কহে। ফলতঃ পাত্র ও অবস্থা-ভেদে উভয়ই শ্রেয়স্কর ; এবং যাঁহারা এই যুগধর্ম প্রবর্তন করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি, সিদ্ধপুরুষ ও অবতার বলা হয়।

ধর্মগ্লানি

কালবশে অধিকারী অভাবে ধর্মেরও গ্লানি সম্ভব হয়। স্বার্থসিদ্ধির অনুসরণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানব ইহ-সুখ সর্বজ্ঞ-জ্ঞানে সত্য, ধর্ম, পরকাল, এমন কি, জগৎকর্তা জগদীশ সম্বন্ধেও যখন সন্দিহান হয়, এবং ধর্মের ভাণ করিয়া প্রভুত্ব-লালসায় আপন অনুকূল মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করে, এবং পরস্পর-বিদ্বেষী হইয়া এক পক্ষ অপর পক্ষকে ছল বা বল দ্বারা পরাভব করিতে প্রয়াস পায়, তখনই ধর্মগ্লানি চরম সীমায় উপনীত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধর্মগ্লানি কেবল যে ভারতেই ঘটিয়াছিল, এমত নহে, ভারতের সকল দেশেই হইয়াছিল। ইহার ফলে নাস্তিকতারূপ কুজ্ঝটিকা সমগ্র জগৎকেই সমাচ্ছন্ন করে।

সচ্চিদানন্দের ঘনরূপ

জনকল্যাণকারী আপ্তভাবব্যঞ্জক এই ধর্মকে মলিনতা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান যুগে যুগে আপনাকে প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যে জাতির কল্যাণকল্পে আবির্ভূত হইতে হয়, সেই জাতির অনুরূপ দেহ ও আচরণ স্বীকার করা বিধেয় বোধে অসীম হইয়াও, করুণায় সসীম হইয়া মানবকলেবর ধারণে জনসামাজে অবতীর্ণ হন। কারণ, সমজাতীয় বোধ না করিলে কেহই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না, এবং আকৃষ্ট না হইলে তাঁহার সকরুণ ক্রিয়াকলাপও তাহাদের কল্যাণকর হইবে না, বোধ হয়, এই কারণেই সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্তি-পরিগ্রহ করেন। ধর্মপ্রাণ ভারত চিরদিনই ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত, তাই শ্রীভগবান ইহারই শুভার্থে একাধিকবার প্রকট হইয়াছেন ; সেই হেতু প্রাচীন ভারত পুণ্যভূমি নামে বিখ্যাত।

আবির্ভাব—কামারপুকুরে

তাই বুঝি বিভিন্ন ধর্মমতকে সেই একেশ্বরেরই মহিমা-প্রচার বলিয়াই, সম্মিলন-বাসনায় বিভু এবার পূর্ব পূর্ব যুগ-আচরিত বিভূতি পরিহারপূর্বক, এক অচিন্ত্য, অভিনব সাম্যভাব অবলম্বনে, জনপূর্ণ স্থান উপেক্ষা করিয়া ইতিহাসের অপরিচিত স্থানে,

হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার সম্মিলন-ক্ষেত্রে যেন দ্বিতীয় ত্রিবেণী-সঙ্গমে, রাঢ়দেশস্থ একটি ক্ষুদ্র শান্তিপূর্ণ 'কামারপুকুর' নামক পল্লীতে গোপনে আবির্ভূত হইলেন।

শুক্লা দ্বিতীয়ায়

আবার মানবকে আলস্য-জড়িমা, এবং অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে উদ্ধারকরণ অভিলাষে, জীবন ও উদ্যমপ্রদ বসন্ত-সমাগমে ফাল্গুন মাসে এবং নব ধর্মদানে দ্বিজত্বে উন্নীত করিবেন ভাবিয়া শুভা শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভূমিষ্ঠ হইয়া বসুন্ধরাকে সনাথ করিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে

অর্থই অনর্থের মূল, ইহাতে মানব-মস্তিষ্ক বিকৃত হয়;—বিশেষতঃ বর্তমান বিলাসিতার যুগে। বোধ হয়, এই কারণেই জগদীশ দারিদ্র্যকে বরণ করিলেন, কারণ, দারিদ্র্য অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। এই নিমিত্ত ঋষি ও সাধককুল সকলেই দারিদ্র্যের মর্যাদা করিয়াছেন। আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারে জাতিকুল-নির্বিশেষে সকলকেই ভগবৎ-সন্নিধানে লইয়া যাইবেন ভাবিয়াই, সত্য ও ধর্মনিষ্ঠ, অতি দরিদ্র অথচ ঋষিকল্প ব্রাহ্মণকুলে, ঈশ মহিমা-প্রকাশক ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিলেন।

পিতৃ-পরিচয়

পিতার নাম শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়; শান্ত স্বভাব হইলেও তপঃপ্রভাব জন্য গ্রামস্থ সকলে ইঁহাকে এতই শ্রদ্ধা করিত যে, ইনি স্নান বা ভ্রমণেচ্ছায় পুষ্করিণী বা পথে গমন করিলে, পাছে কোনো অপ্রিয় আচরণ করা হয়, এই আশঙ্কায় সকলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইত। উচ্চ শাখা হইতে পুষ্পচয়নে অসমর্থ দেখিয়া, কুলদেবতা শ্রীশীতলাদেবী বালিকাবেশে বৃক্ষশাখা অবনমিত করিয়া দিতেন। এতই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, বিচারালয়ে যাইয়া জমিদারপক্ষে সাক্ষ্যদানে পাছে মিথ্যা বলা সম্ভব হয়, সেই আশঙ্কায়, পৈতৃক ভদ্রাসন ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, কামারপুকুর গ্রামে এক বন্ধুপ্রদত্ত অল্প-পরিসর ভূমিতে কুটির নির্মাণ করিয়া সানন্দে বসবাস করেন।

চক্রধারীর মায়ায় বিষধর ফণীর আবেষ্টন হইতে ইষ্টদেবকৃপায় রঘুবীর-লক্ষ্মণযুক্ত যে শালগ্রামশিলা উদ্ধার করেন, তাঁহারই নামোচ্চারণে অল্প পরিমাণ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, তাহা হইতে প্রচুর ধান্য লাভ হইত—যদ্দ্বারা সপরিবারে প্রাণধারণ ও অতিথিসেবা সম্পন্ন হইত। আবার এতই শিবভক্ত ছিলেন যে, কার্যোপলক্ষে গ্রামান্তর-গমনকালে দূরপথ যাইয়াও, নব বিল্বদল দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া সংগ্রহপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং তদ্দ্বারা সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে আনীত বাণলিঙ্গের অর্চনা করিয়া পুনরায় গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হন।

মাতৃ-পরিচয়

মাতার নাম শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী; কোমলস্বভাব বশতঃ চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়িনী, এবং করুণা ও সরলতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। অতিশয় সরলা দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা আদর করিয়া তাঁহাকে পাগলী বলিত। দিব্যচক্ষে এই দেবী নানা দেবদেবী দেখিতেন এবং তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়াইবার আগ্রহও প্রকাশ করিতেন।

গদাধর

কেবলমাত্র বিভূতি-প্রকাশে মানব-কল্যাণসাধন ফলপ্রদ হইবে না জানিয়া, গদাধারী নারায়ণ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পিতৃলোকের মুক্তিকামনায় তাঁহার পাদপদ্মে পিণ্ডদানে সমাগত দেখিয়া কৃপাদেশ করেন যে, তিনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই হেতু গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমনের পরে সন্তান জন্মিলে গদাধর নাম রাখা হয়।

বহুলোকহিত এবং বহুজনসুখকল্পে ঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব অনুধ্যান করিয়া ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র গাহিয়াছেন—

"দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির-ঘরে।
মরি মরি রূপ হেরি নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে।
ভূতলে অতুল মণি কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরি অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা হাস কাঁদ কার তরে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতারতত্ত্ব

ভগবান যদি কৃপা করিয়া আত্মপরিচয় না করেন, অজ্ঞ মানব কিরূপে তাঁহার মহিমা-অবধারণে সমর্থ হইবে? তাই বোধ হয়, আশ্রিতকে অনুকম্পা করিয়া ঠাকুর একদিন কহেন, রাজা কিংবা জমিদার, রাজ্য বা জমিদারির বন্দোবস্ত করিতে যে প্রিয় ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া পাঠান, তাহাকে রাজপ্রতিনিধি বা নায়েব কহে। প্রজাগণের নিকট সমুচিত সম্মান পাবার জন্য, তার সঙ্গে লোকজন ও রাজার মতো আড়ম্বরও জোগায়ে দেন। না হলে প্রজারা কি করে তাঁকে মানবে? কিন্তু প্রজাদের অবস্থা দেখবার ইচ্ছায় রাজা বা জমিদার যখন স্বয়ং আসেন, তখন অতি গোপনে; কোনো জাঁকজমক থাকে না; বরং তিনি এসেছেন বলে জনরব হলেই সেখান হতে পালিয়ে যান।

অবতার-পুরুষ সেইরূপ ঈশ্বরের অংশ বা প্রতিনিধি-স্বরূপ—বিশেষ বিভূতি নিয়ে ধর্ম-সংস্থাপন করতে আসেন। কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানকে অর্থাৎ তিনি যখন স্বয়ং আসেন, তখন অতি গোপনে, কোনো ঐশ্বর্য (বিভূতি) থাকে না, কেবল মাধুর্য। আবার দু-পাঁচজন ভক্ত ভিন্ন সাধারণে জানাজানি হবার পূর্বেই অন্তর্ধান হতে বাসনা করেন। এই হেতু এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শুভাগমনে ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নেই। কেবল মাধুর্য। শ্রদ্ধাবান পাঠক ইহাই অবধারণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়—বাল্যলীলা

বিবিধ উপচার-যোগে অন্নাদি ভোজন এবং মূল্যবান বসন-ভূষণে অঙ্গশোভন-স্পৃহা ভগবৎ-লাভের অন্তরায় বুঝিয়া, পিতার অযাচিত বৃত্তিলব্ধ শরীর-ধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনে পরিতৃপ্ত থাকিতেন; এবং ধর্মলাভের অনুকূল সুদৃঢ় দেহ ও শান্তিপূর্ণ চিত্তগঠন অভিপ্রায়ে অবরোধশূন্য স্থানে আপন ভাবে ক্রীড়া করিতেন।

বিদ্যার্জন

বিদ্যার্জন বিনা ভবিষ্যতে আত্মোন্নতি, সংসারোন্নতি এবং সমষ্টিসংসার সমাজেরও উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইয়া গদাধরকে পাঠশালায় পাঠানো হয়। কিন্তু অপূর্ব বালক বিদ্যা-শিক্ষায় আস্থাপ্রকাশ না করিয়া, পূর্বস্মৃতি-বশতঃ বয়স্যগণসহ মাঠে বা মাণিক রাজার আম্রকাননে যাইয়া পূর্বগ অবতারগণের লীলা-অভিনয়ে আনন্দ বোধ করিতেন। গয়াধামে শ্রীগদাধরের আদেশস্মরণে পিতা কিছু না বলিলেও অগ্রজেরা মধুর তাড়না করিলে, মৃদু হাস্যে কহিতেন—'এ বিদ্যাতে কি হয়? চালকলা হয়, টাকা হয়, মান যশ হয়, কিন্তু ভগবান লাভ তো হয় না। সুতরাং এমন বিদ্যা শিখতে ইচ্ছা হয় না।' সর্ববিদ্যার বীজ যাঁহার অন্তরে বিদ্যমান, তাঁহার কি আর পুঁথিগত বিদ্যায় রুচি হয়?

কারণ, ভাবিলেন- বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ করিলে বিদ্যার কুহকে ঈশ্বর-লাভরূপ পরাবিদ্যায় বঞ্চিত হইতে হইবে। আবার উত্তরকালে হয়তো লোকেও বলিবে—গদাধর একজন মহাপণ্ডিত, অখণ্ড যুক্তি-তর্ক দ্বারা একটা নূতন মত প্রবর্তন করেছেন। বোধ হয়, এই কারণেই বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। তোতাপাখীর মতো পুঁথি না পড়িয়া, সাধন-প্রভাবে শিক্ষার প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়া, ভবিষ্যতে সকল অক্ষর অর্থাৎ শাস্ত্রকে উদ্ভাসিত করিবেন, যদনুশীলনে লোকে স্ব স্ব ধর্মে নিষ্ঠাবান হইয়া ভগবদারাধনায় আত্মোৎসর্গ করিবে; হয়তো এই নিমিত্তই নিরক্ষর হইলেন। কিংবা মাধুর্যময় বালকভাবের অপকর্ষ হয়, এই আশংকায় বিদ্যাশিক্ষায় আস্থা করিলেন না।

মেধাশক্তি

দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের তথ্য নিরাকরণের নাম মেধা। জন্মাবধিই ধী, স্মৃতি ও মেধা যাঁহার কবচস্বরূপ, কেবল আবশ্যক মতো বিকাশের অপেক্ষা, তিনি যে মেধাবী হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি। সুতরাং অসাধারণ মেধাপ্রভাবে আশ্চর্য বালক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা, কথকতায় গীত পুরাণাদি, এবং যাত্রা-পাঁচালিতে যে সমস্ত অভিনয় একবার দেখিতেন বা শুনিতেন, সমুদয়ই তাঁহার নির্মলচিত্তে চিরদিনের মতো অঙ্কিত হইয়া থাকিত। সুতরাং এই দিব্য বালকই শাস্ত্রসম্মত অদ্বিতীয় শ্রুতিধর।

প্রকৃতিলীন

আবার মহীয়সী প্রকৃতিদেবী যেন তাঁহার গুণময়ী ভাব মন্থন-পূর্বক এই শুদ্ধসত্ত্ব বালককে প্রসব—অর্থাৎ তাঁহাতে লীন অবস্থা হইতে সমুত্থিত করিয়া, তাঁহার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানরাজি এতই যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা মাঠ, ঘাট, পত্র, পুষ্প, পশু, পক্ষী, শ্মশান, মন্দির এবং বিভিন্ন মানব ও তাহাদের আচার-নিরীক্ষণে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা, অর্থাৎ সেই একেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া সর্বক্ষণ এক অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

প্রকৃতির শিক্ষাদান

সুতরাং মানবে না শিখাইলেও প্রকৃতিদেবীর প্রেরণায় কলাবিদ্যা অর্থাৎ নৃত্যগীত, চিত্রলিখন, প্রতিমা এবং মূর্তিগঠনাদিতেও এমন পারদর্শী হন যে, বিচক্ষণ শিল্পীরাও মিষ্টান্ন দানে প্রীত করিয়া স্ব স্ব শিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করাইয়া লইত। আবার একদিন গৃহমধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে স্বামীহস্তে হুঁকা দিতে দেখিয়া নষ্টামি বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্র লিখিয়া কতই না উল্লসিত হন।

অনুকরণ-শক্তি

উর্বর-মস্তিষ্ক কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না। ভালো হউক বা মন্দই হউক, কিছু না কিছু করিবার জন্যই ব্যগ্র। এই কারণে লোক-চরিত অবধারণ ও তাহাদের আচরণ অনুকরণে এই কৌতুকপ্রিয় বালক অদ্বিতীয় ছিলেন। তাই পল্লীর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চলন, বলন ইত্যাদির এমন অভিনয় করিতেন যে, যাহাদের অনুকরণ করিতেন, তাহারাও দেখিয়া আশ্চর্য হইত।

বহুরূপী

কখনো তাহার অন্তঃপুরে পর-পুরুষ, এমন কি, বালকও প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া পল্লীর কোনো একজনের বড়োই স্পর্ধা ছিল। তাই তাহার গর্বনাশ-মানসে বহুরূপী গদাধর একদিন সন্ধ্যাকালে রমণীর বেশে বাড়ির কর্তাকে ভুলাইয়া, তাহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহিলাদের সঙ্গে এরূপ আলাপ ও আচরণ করেন, যাহাতে তাহারাও তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই; পরিশেষে গৃহ হইতে আহ্বান শুনিয়া 'যাচ্ছি গো--দাদা' বলিয়া উত্তর দিলে সকলেই অবাক হয়। কর্তাও তাঁহার গর্ব খর্ব হওয়ায় লজ্জা বোধ করেন।

গীতশক্তি

গদাধরের যেমন মোহনীয় রূপ ছিল, কণ্ঠস্বরও তেমনি বীণাঝংকারসম সুমিষ্ট ছিল। আবার ভাব-ভরে এমন গান করিতেন যে, সকলে শুনিয়া মোহিত হইত। এজন্য প্রতিবেশিনীরা মিষ্টান্ন-দানে পরিতুষ্ট করিয়া স্ব স্ব আলয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইত এবং প্রাণভরে তাঁহার রূপ দেখিয়া ও গান শুনিয়া সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা লাঘব করিত।

ভূত-সনে আনন্দ

কেবল যে মাঠে গোঠে খেলা করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন, এমত নহে, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এই নির্ভীক বালক, কখনো কখনো অন্ধকার রাত্রে গ্রামের প্রান্তরে বুধুই মোড়লের শ্মশানে যাইয়া ভূতগণের আচরণ নিরীক্ষণ করিতেন এবং কখনো কখনো মিষ্টান্ন দিয়া দেখিতেন যে, পাত্র সমেত মিষ্টান্ন কেমন শূন্যেপানে উঠিয়া যাইতেছে। ভূতনাথ কি না, তাই ভূতসনে আনন্দ।

শাস্ত্র-মীমাংসা

জীবন-রহস্য সমাধান করিতে যাঁহার আগমন, স্বভাবসিদ্ধ প্রজ্ঞাবলে তিনি যে শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব-মীমাংসা করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? কোনো এক পর্বদিনে লাহাবাবুদের আলয়ে পণ্ডিতগণ সমাগত হন, এবং 'শিব বড়ো, না রাম বড়ো' বলিয়া এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বহু বাদানুবাদে সিদ্ধান্ত হইল না দেখিয়া গদাধর বলেন--শিব বা রামকে আমরা কেহই দেখি নাই, শাস্ত্রে শুনিয়াছি মাত্র। যিনি যে মতের উপাসক, তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন, এই কারণেই কেহ শিবকে বড়ো, কেহ রামকে বড়ো করিয়া থাকেন। বালকের এই অদ্ভুত মীমাংসায় পণ্ডিতগণ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

সমাধি

বিষয়ে মনের সম্যক্ অধিগমনের নাম সমাধি। সৌন্দর্যপ্রিয় এই দৈবী বালক মেঘের

কোলে সৌদামিনী, সান্ধ্য-গগনে নানা বর্ণের সমাবেশ এবং নীল মেঘের পাশে শুভ্র বককুল দেখিয়া বিভোর হইতেন। একদিন যাত্রাতে শিবের অভিনয়-কালে আপনাকে শিব ভাবিয়া এতই বাহ্যজ্ঞান-হারা হন যে, তাঁহার জীবন-আশঙ্কায় যাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আবার রন্‌ রন্‌ ভন্‌ ভন্‌ রবে অগণন মৌমাছি অভ্রান্তভাবে স্ব স্ব চক্রে প্রবেশ ও বাহির হইতেছে দেখিয়া আত্মহারা হইতেন।

শিক্ষা

গুরুরূপী গদাধর জ্ঞান দিলেন যে, তোতাপাখীর মতো পুঁথি পড়িয়া গর্ব করা উচিত নয়। ভাষা উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, ভিতরে প্রবেশ করে না। আপন অন্তরে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াসই প্রকৃত শিক্ষা। গুণ-সমাবেশ বিনা মহত্ত্ব-লাভ হয় না। গদাধরে অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি মহতেরও মহৎ হইয়াছেন।

উপনয়ন

যজ্ঞসূত্র-ধারণে (ব্রহ্মবাচক) গায়ত্রী (গীত হইয়া ত্রাণ করেন) দীক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণ-তনয়ের গুরুগৃহে উপনীতের নাম উপনয়ন। উদ্দেশ্য বেদাধ্যয়ন, বৃত্তি ভিক্ষা ও গুরুসেবা। ইহাই সনাতন রীতি। অধুনা আভিজাত্যে উপনীত হওয়ায় উপনয়ন এবং যজ্ঞগৃহে যৌতুক লইয়া পিতৃ-আলয়ে অবস্থানই বর্তমান প্রথা। ব্রাহ্মণ-সন্তান গদাধর ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় আত্মোৎসর্গ করিবেন, এই নিমিত্ত শুভদিনে তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয়া গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকেও ভিক্ষা লইতে হয়। ব্রহ্মচারীর ব্রাহ্মণের নিকট ভিক্ষা-গ্রহণই বিধি; কিন্তু কি জানি কি অভিপ্রায়ে এই পুরাতন রীতি লঙ্ঘন করিয়া গদাধর ধনী কামারণীর হস্তে প্রথমেই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ভিক্ষা-গ্রহণ

শাস্ত্র-বচন—পবিত্র আহারে সত্ত্বশুদ্ধি এবং পরিগ্রহে দাতার সত্তা গ্রহণ হয়। এজন্য যাহার তাহার বা আচারভ্রষ্ট ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দান গ্রহণ অবিধেয়। কিন্তু লোভবশতঃ বা হঠকারিতা-প্রযুক্ত ব্যতিক্রম করিলে পতিত অর্থাৎ ভগবদ্‌ভাব হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। বোধ হয়, এই কারণে দ্বিজাতিগণ অন্ন ও দান গ্রহণে সতত সতর্ক ও বিচারবান। ভক্তি-শাস্ত্রমতে হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহার প্রেমপূর্ণ দান গ্রহণে প্রত্যবায় হয় না। শূদ্রা হইলেও ধনী কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা, ও তাঁহার প্রতি স্নেহপূর্ণা দেখিয়া গদাধর তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন, এবং তাহার আগ্রহে, অগ্রজের সম্মতিতে তাহারই নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে দেখাইলেন যে, আচার বা নিয়ম অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, এবং ঈদৃশ ভক্তের দান-গ্রহণ দোষাবহ নহে।

তন্ময়তা

এখন হইতে নবীন ব্রহ্মচারীর সাধনার সময় আসিল, ত্রিকালীন সন্ধ্যা (জগদীশ-মহিমা) বন্দনা, গায়ত্রী-আরাধনা, ব্রহ্মভাব-ব্যঞ্জক বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম অর্চনা এবং কুলদেবতা শ্রীশীতলাদেবীর পূজায় সানন্দে আত্মনিয়োগ করিলেন। পূজাকালে এতই তন্ময় হইতেন যে, সময়ের বিচার থাকিত না, বা যথাসময়ে দেবতাকে অন্নভোগ দিতে হইবে, তাহারও চিন্তা আসিত না। ইহাতে শিখাইলেন যে, তন্ময়তাবিহীন উপাসনা বিড়ম্বনামাত্র।

বাল্যলীলা অনুশীলনে অনুমান হয়, যেন বিভু আপনাকে প্রকট করিয়াছেন, এবং

শৈশব-আলোকে গদাধরও জানিয়াছিলেন—তিনি কে বা কি অভিপ্রায়ে তাঁহার আবির্ভাব !

চতুর্থ অধ্যায়

কলিকাতায় আগমন ও ঘটনাচক্র

এত দিন যেন আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন ; কিন্তু চিরদিন কখনো সমান না যায়। পিতৃবিয়োগে অবস্থা-বিপর্যয়ে অগ্রজের সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে হয়—উদ্দেশ্য মাতৃসেবা। অথবা ঠাকুর গান করিতেন—'ছেলেবেলা ধূলিখেলা, প্রাণ সঁপেছি এই বেলা। বঁধূ তুমি আমার পরাণের পরাণ।' তাই বুঝি সেই বঁধূর সন্ধানে, আজ তাঁহাকে স্নেহময়ী জননী, পুণ্য জন্মভূমি এবং প্রিয় বয়স্যগণকে পরিত্যাগ করিতে হইল। যদিও এ স্থান পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলরবপূর্ণ, তথাপি ইহাই তাঁহার ভাবী লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

দক্ষিণেশ্বর

অগ্রজ রামকুমারের সহিত যখন তাঁহার ঝামাপুকুরের টোলে অবস্থান করেন, তখন জানবাজারের খ্যাতনামা রাণী রাসমণি (ঠাকুর বলেন, জগদম্বার শাপভ্রষ্টা সখী) জগন্মাতার আদেশে ৺কাশীধাম-গমন-সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারই আদ্যামূর্তি শ্রীকালীপ্রতিমা স্থাপন জন্য, কলিকাতার সন্নিকট ভাগীরথীর পূর্বতটে (দক্ষিণ শহর) দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বিস্তীর্ণ ভূমি অর্জন করিয়া, তদুপরি ভগবতী, দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও রাধাশ্যামের মন্দির নির্মাণ করান। আবার ব্রতচারিণী হইয়া সুদক্ষ ভাস্কর দ্বারা মহামায়ার মূর্তি গঠন করাইয়া, ভক্তিমান অর্চক অভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন।

ভগবতীর আবির্ভাব

ঠাকুর বলেন, প্রতিমা যদি মোহনীয় হয়, কর্মকর্তার চিত্ত তদ্গত হয় এবং পূজক ভক্তিমান হয়, তাহা হইলে পরম-দেবতার আবির্ভাবের বিলম্ব থাকে না। ভক্তিমান অর্চকের অভাব হইলেও রাণীর অনুরাগে ভক্তিপ্রিয়া ভগবতী স্বতঃই চৈতন্যা হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দেন—আর কত দিন আমাকে আবরণ করিয়া রাখিবি ? ঘর্মাক্ত হইয়া আমি যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছি। তৎপর হও, উপযুক্ত অর্চক মিলিবে।

অর্চকের আগমন

ইতস্ততঃ অন্বেষণের পর জনৈক কর্মচারী রাণীকে বলেন—তাঁহার দেশস্থ অতি নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য ঝামাপুকুরে এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া অযাচিত বৃত্তিতে জীবিকা-যাপন করেন। তাঁহাকে কোনোমতে প্রসন্ন করিতে পারিলে জগদম্বার পূজার উত্তম ব্যবস্থা হয়। ইহা অবগত হইয়া এবং ভগবতীর আদেশ স্মরণ করিয়া, রাণী সাগ্রহে কহেন—আপনি যদি কোনো উপায়ে তাঁহাকে এ বাটিতে আনিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই। প্রভুকে পরিতুষ্ট করা সেবকের কর্তব্য বোধে, কর্মচারী ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুনয়-বিনয় করিয়া রাণীর নিকট আনয়ন করেন।

রাণীর নিবেদন

ঋষিতুল্য পিতৃ-পরিচয় শ্রবণ এবং তাঁহার তপঃপূর্ণ রূপ দর্শনে রাণী ভট্টাচার্য মহাশয়কে নিবেদন করেন—কাশী যাবার মানসে গঙ্গাতে একশত কিস্তি দ্রব্য-সম্ভারে সজ্জিত করি ;

কিন্তু জগন্মাতার আদেশে তাঁহার শ্রীমূর্তি-স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়া প্রতিমা ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছি। প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রীমূর্তি দর্শনে পাছে কেহ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, এই আশংকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। বস্ত্রাবরণে ঘর্মাক্ত হইয়া মহামায়া স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন—'আর কত দিন এমন অবস্থায় থাকিব? আগামী জ্যৈষ্ঠের শুভ পূর্ণিমায়, আমারই ষোড়শ যাত্রার ভবমোচনী পুণ্যদিনে বা আমারই নারায়ণরূপের স্নানযাত্রা-বাসরে* আমাকে শ্রীমন্দিরে স্থাপন কর।' কিন্তু ভক্তিমান অর্চক অভাবে নিদারুণ সন্তাপ ভোগ করিতেছি।

যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ভূদেব, ত্যাগ তপস্যাই যাঁহার গৌরব, আমি, কি অর্থে বা কোন্ সাহসে, সেই বামনরূপী ব্রাহ্মণকে অর্থলোভে প্রলোভিত করিতে পারি? তবে জগদম্বার কৃপায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে, একমাত্র ভক্তিতেই ভূদেব প্রীত ও বশীভূত।

প্রার্থনা

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পৌরোহিত্যে পাছে সদ্‌ব্রাহ্মণের অগৌরব হয়, এবং সদ্‌ব্রাহ্মণগণও দেবালয়ে শ্রীকালীমাতার প্রসাদ-গ্রহণে অস্বীকার করেন, ইহাই ভাবিয়া দেবীর শ্রীমূর্তি ও মন্দির, এবং সেবার নিমিত্ত সম্পত্তি সমুদয়ই গুরুদেবের নামে অর্পণ করিয়াছি। পান্ডবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্যাসদেব যেমন তাঁদের যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, প্রণাম-পুরঃসর প্রার্থনা করি—আপনিও কৃপা করিয়া এই দেবীযজ্ঞে ব্রতী হইয়া ব্রাহ্মণগৌরব রক্ষা করুন, এবং আমাকেও চরিতার্থ করুন।

পূজাভার গ্রহণ

ভক্তাধীন ব্রাহ্মণ রাণীর ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মঙ্গলময় মাধবকে স্মরণ করতঃ কালীমাতার পূজাকার্যে সম্মত হইলেন। রাণীও তাঁহার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়া নিবেদন করিলেন—জগন্মাতার প্রতিমা যতদিন শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিবেন, ততদিন আপনি এবং আপনার বংশধরগণকে মহামায়ার পূজাভার গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণের অবনতি

অতীত যুগে ধর্মরাজের রাজসূয়-যজ্ঞে তপোদীপ্ত ব্রাহ্মণগণের পদ ধৌত করিয়া, পাণ্ডব-সখা দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণ-মর্যাদা বর্ধন করিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। ইদানীং সেরূপ ব্রাহ্মণ সহসা পরিদৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রচর্চায় জগৎবিস্মৃতি, ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় দারিদ্র্যেও আনন্দ, এবং কঠোর তপস্যায় পরব্রহ্মে অবস্থানে যে ব্রাহ্মণ বিরাটপুরুষের মুখস্বরূপ অর্থাৎ সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, কালমাহাত্ম্যে এখন সেই ব্রাহ্মণ (হেঁয়ালীছন্দে) 'ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়, গলায় পইতে বামুন নয়।' ব্রহ্মজ্ঞানহীন হইয়াও অর্থলালসায় সন্তাপহারকের স্থানে শিষ্যের বিত্তাপহারক হইয়াছে বলিয়াই, ঠাকুর ব্যঙ্গ করিয়া এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে 'কানে ফু' উপাধি দিয়াছেন। আবার অল্পকালমধ্যে বহু যজমানের গৃহদেবতার যথাবিধি পূজা না করিয়া দুই চারিটি পুষ্পদানে কোনোমতে নৈবেদ্য আত্মসাৎ করায় ঠাকুর বলেন, ইহারা 'শাঁখে ফু'

---

* বামকেশ্বর তন্ত্রে উল্লেখ—জ্যৈষ্ঠে মহাস্নানযাত্রা অম্বুবাচীদিনত্রয়ম্
আষাঢ়ে রথযাত্রা চ দিগ্‌দিন-(১০ দিন) ব্যাপিনী পরা॥

সম্প্রদায়। পরিশেষে আচারভ্রষ্ট ও মূর্খ হইয়া পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করায় ঠাকুর ইহাদের নাম 'চোঙায় ফু' রাখিয়াছেন।

সংযম

চতুষ্পাঠি ছাড়িয়া অগ্রজ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং কালীমাতার পূজাকার্যে রত হইলেন বটে, ঠাকুর কিন্তু ঝামাপুকুরেই থাকিলেন, তবে প্রতিষ্ঠার দিন সমারোহ দেখিবার ইচ্ছায় দেবালয়ে আগমন করেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ দিন তথায় জলগ্রহণ না করিয়া সন্ধ্যাকালে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। অগ্রজ ভগবতীর পূজাভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তৎকর্তৃক অর্চিত দেবতার প্রসাদগ্রহণ তাঁহার পক্ষে দোষাবহ নহে, কিন্তু নিজে যখন কোনোরূপে পূজা বা সেবাকার্যে নিরত হন নাই, তখন কিরূপে তথাকার নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন ? ইহা যুক্তিসঙ্গত। অথবা আমাদিগকে লোভ-সম্বরণ শিখাইবার অভিপ্রায়ে সংযমী গদাধর লোভনীয় পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন গ্রহণে স্পৃহা করেন নাই। তবে স্নেহবশে অগ্রজকে দেখিতে আসিলে, আমান্ন লইয়া গঙ্গাতীরে পাক করিয়া খাইতেন, ইহাতে কাহারও অনুরোধ মানিতেন না।

পূজকের বাসনা

একে তো বিদ্বান, তাহাতে পিতৃপরম্পরায় ভক্তিমান, সুতরাং মহামায়ার অর্চনে এতই তন্ময় হইতেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও, পুষ্পমাল্যাদিতে দেবী-অঙ্গ সুশোভন করিয়া আনন্দ করিতে পারিতেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন শিল্পী, তেমনই ভক্তিমান, তিনি যদি জগদম্বার বেশ-ভূষায় সহায়তা করেন তো বড়ই ভালো হয়, কিন্তু রাণীর আগ্রহ বিনা তাঁহাকে কিরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন ?

রাণীর সাধ

যাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই ইষ্টদেবীকে পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত দেখিবার জন্য রাণীর অন্তর নিরন্তর ব্যাকুল থাকিত। ভক্তিপূর্ণ পূজায় যখন অর্চকের সময় চলিয়া যাইত, তখন কি করিয়া তিনি পুষ্পবেশ করিতে পারেন ? এই হেতু আগ্রহ করেন– তিনি যদি তাঁহার মতো কোনো ভক্তিমান ব্যক্তিকে এ কার্যে আনয়ন করেন।

ভ্রাতার পরিচয়

ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন–তাঁহার কনিষ্ঠ যেমন ভক্তিমান, তেমনই শিল্পী, কিন্তু অতি স্বাধীনচেতা আপন বুদ্ধিতে যাহা ভালো বুঝে, তাহাই করে, তাই আমি তাহার আচরণের প্রতিবাদ করি না। তবে আমাকে দেখিতে আসিলে আপনারা যদি তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, হয়তো আপনাদিগকে উপেক্ষা না-ও করিতে পারে।

দেবালয়ে আগমন

এক দিন দেবালয়ে আসিয়া যখন ভগবতীর পূজা দেখিতেছেন, এমত কালে রাণী ও তাঁহার জামাতা পুষ্পাঞ্জলি দিবার অভিপ্রায়ে মন্দিরে সমাগত হন এবং গদাধরের দিব্য রূপলাবণ্য ও গাম্ভীর্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই মথুর সম্ভাষণে প্রার্থনা জানান, যদি তিনি দয়া করিয়া দেবীর পুষ্প-সজ্জার ভার গ্রহণ করেন।

দেবীর পুষ্পবেশ

যাহা হউক, এখন কি প্রেরণায় বা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ঠাকুর ভগবতীর পুষ্পবেশ করিতে

সম্মত হইলেন, এবং দেবালয়ে অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রসাদও গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅঙ্গের কোন্ অংশে কোন্ পুষ্পপত্র বা মাল্য যোজনা করিলে রূপ-শোভার উৎকর্ষ হয়, ভক্তিভরে তাহাই করিতেন। ভুবনমোহিনীর নিত্য-নবসাজ দেখিয়া রাণী ও তাঁহার জামাতা বড়ই আনন্দ লাভ করেন; এবং এই কারণেই ঠাকুরের প্রতি দিন দিন তাঁহাদের প্রীতি বর্ধিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবতীর পূজাগ্রহণ

লোকদৃষ্টিতে দুর্ভাগ্য, কিন্তু ভগবদ্‌বিধানে তাঁহার সৌভাগ্য-ঊষার বিকাশে, অথবা কালবশে অগ্রজের দেহান্তর ঘটিলে রাণীর আগ্রহে তাঁহাকে দেবীর অর্চক হইতে হইল। শ্রদ্ধা ও তপস্যার অভাবে, ঠাকুর বলেন, কলিযুগে বৈদিকমন্ত্র নির্জীব হইবে জানিয়া করুণাময় সদাশিব দ্বৈতভাবের আবেষ্টনে অদ্বৈত-প্রাপ্তির জন্য যে তন্ত্রমত প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার শরণ বিনা ব্রহ্মশক্তির পূজায় অধিকার হয় না। তাই বিশ্বসৃষ্টির মূল অনির্বচনীয়া মহামায়া-আরাধনায়, তাঁহার কৃপালাভ করিব ভাবিয়া কোনো এক মন্ত্রচৈতন্য পুরুষের নিকট দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। 'শাঁখে ফুঁ' অর্থাৎ দেবল-ব্রাহ্মণবৃত্তি আদরণীয়া না হইলেও ভবিতব্যবশে এখন তাঁহাকে তাহাতেই ব্রতী হইতে হইল।

উচ্চ নীচ সকল কর্মই শ্রীভগবানের পূজা, কেবল সদসৎ অভিসন্ধিতে হেয় বা প্রেয় হয়। দেবাঙ্গস্পর্শন ও পূজনই যে পরম-দেবতার দর্শনলাভের উপায়, আমাদিগকে ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশে, সানন্দে দেবল-ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অথবা ঈশ্বরী জ্ঞানে অনুরাগের পূজায়, মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাও দেখাইবার জন্য দেবল-ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

আমাদের পূজা

ভূতে দেবতার পূজা করিতে পারে না, আবার দেবভাবে ভাবিত না হইলে মানবও দেবতার পূজা করিতে সমর্থ হয় না। জীবমাত্রই বিরাট পুরুষের অঙ্গ—আমরা কয়জন ধারণা করিতে পারি? আবার স্বীয় দেহভাণ্ডে অন্তর্যামী ঈশ্বর যে বিদ্যমান—ইহাও কি আমরা চিন্তা করি? সুতরাং আমাদের বিধিবিহীন পূজা, ভূতের পূজার মতো কস্মিন্‌কালে ফলপ্রদ হয় না।

ঠাকুরের পূজা

এই হেতু প্রকৃত পূজা করিবার মানসে, ভূতশুদ্ধি করিবার সময় ঠাকুর অনুভব করিতেন—যেন তিনি বহ্নিময় প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া বাহ্যবিঘ্ন হইতে রক্ষিত। আবার উপলব্ধি করিতেন—সৃষ্টির মূলকারণ পরমাপ্রকৃতি সংস্কার সহ জীবকে ধারণ করিয়া, সুপ্ত-প্রায় মূলাধারপদ্মে বিরাজ করিতেছেন। প্রাণায়াম-যোগে জাগ্রতা হইয়া ক্রমে যে যে চক্র বা ভূমিতে উত্থিতা হইতেছেন, তখনই তত্তৎস্থানে উজ্জ্বল দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল প্রভৃতি প্রস্ফুটিত কমল তাঁহার বিশ্রাম জন্য অপেক্ষা করিতেছে; এবং ঐ সকল কমলদলে বিদ্যার বীজস্বরূপ বর্ণমালা জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে যখন বোধ করিতেন—কুণ্ডলিনীশক্তি তড়িদ্‌গতিতে দ্বিদলপদ্ম ভেদ করিয়া সহস্রারে মহিমাপূর্ণ পরমশিবে

মিলিত হইতেছেন, অমনই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা একাকার হইয়া যাইত।

পূজা-প্রশংসা

ঠাকুর বলেন, 'দেউড়ীতে দরওয়ানদের মার-ধর খেয়ে কোনোমতে রাজার দর্শন পেয়ে, পূর্ণকাম হলে যেমন কাঙাল আর বাইরে আসতে চায় না, তেমনিই সুকৃতিবান জীব প্রাণপাত-চেষ্টায় কিংবা ভগবৎ-কৃপায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে একবার সহস্রারে উপনীত করতে পারলে তার জন্মমরণ-সংস্কার নিবৃত্তি পায় এবং সে আর প্রত্যাগত হতে চায় না বা পারেও না। কিন্তু কোটি-কোটি জীবের মধ্যে কদাচিৎ কারও ঈদৃশ সৌভাগ্য হয় কি না সন্দেহ। তবে যাঁর হয়, তিনি জীবেশ্বর।'

প্রকৃত পূজা

এইরূপে তিনি ব্রহ্মশক্তি-প্রতীক শ্রীকালীমাতার প্রকৃত পূজা করিয়াছিলেন বলিয়াই অল্পকালমধ্যে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন পান। কখনো বা উচ্ছ্বাসভরে গান করিয়া ভাবিতেন, যেন ভগবতী তাঁহার গীতে প্রীতা হইয়াছেন। ঐকান্তিক অনুরাগে আকাঙ্ক্ষা হইত, যেন সতত দেবীর চরণপ্রান্তে অবস্থান করেন। কিন্তু আপ্তবৎ সেবাবিধানে অন্ন-ভোগের পর মহামায়ার আরাম কল্পনায় মন্দির-দ্বার বন্ধ হইত।

দেবালয় সুখহীন

দেবী আনন্দদায়িনী হইলেও, বিভিন্ন আশয়ের লোকপূর্ণ দেবালয় তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না, সেই জন্য সাধ্যানুসারে তাহাদের সঙ্গত্যাগবাসনায় দেবালয়ের প্রান্তে কোনো নিভৃত স্থানে যাইয়া নারায়ণীর ধ্যানে উপবিষ্ট থাকিতেন। অপরাহ্ণকালে জগদম্বার নিদ্রাভঙ্গ-প্রচেষ্টায় নহবৎখানায় গীতবাদ্য আরম্ভ হইলে মন্দিরে আসিতেন এবং যেন তাঁহার জাগৃতি হইয়াছে ভাবিয়া মধুর গানে মন্দির-দ্বার খুলিতেন।

দর্শন-বাসনা

দিবা গত এবং যামিনী আগতপ্রায় সময়ের নাম সন্ধ্যা। এই সন্ধিক্ষণে প্রকৃতির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে ভাবুক-অন্তরে এক দিব্য ভাবের উদয় হয়। সুতরাং এই সময় বিষয়-চিন্তা পরিহার পূর্বক ঈশ্বর-চিন্তায় সমাহিত হওয়া কর্তব্য। তাই ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধর সান্ধ্য-উপাসনা মানসে নীরদবরণী শ্যামার চরণপ্রান্তে ধ্যানাবলম্বন করিতেন। উপাসনান্তে নিরাময়দায়িনীর নিরাজন করিয়া প্রত্যক্ষ বাসনায় কতমতো প্রার্থনা জানাইতেন। আবার সান্ধ্য-ভোগের পর নিদ্রা-কল্পনায় যতক্ষণ শয়ন প্রদান না হইত, ততক্ষণ যেন আত্মহারা হইয়া শ্রীমূর্তি-দর্শনে বিভোর থাকিতেন।

ব্যাকুলতা

পূজা দ্বিবিধ ;—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রমতো মন্ত্র-স্তোত্রাদি সহ ধীর-স্থির-ভাবে যে অর্চনা, তাহা বৈধী ; আর প্রাণের আবেগে মন্ত্রতন্ত্র ভুলিয়া একান্ত অনুরাগে যাহা আচরিত হয়, তাহাকে রাগানুগা পূজা কহে। এই রাগানুগা পূজায় মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় গদাধর ব্যাকুলভাবে বলিতেন, 'মা, তুমি যখন রামপ্রসাদ, কমলাকান্তকে দেখা দিয়াছ, তখন আমাকেও দেখা দিয়া কৃতার্থ কর ; তোমার পুণ্যদর্শন বিনা আমার জীবন বিড়ম্বনা বোধ হইতেছে।'

বিলাপ

ভগবৎ-তেজে উদ্ভাসিত মার্তণ্ড, ময়ূখমালায় দিক রঞ্জিত করিয়া সৃষ্টিকর্তার দর্শন-আবেগে যখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেন, অনুরাগমত্ত গদাধর মনোবেদনায় সরোদনে বলিতেন, 'মা, দিন চলিয়া গেল, দিনমণিও তোমাতে মিশিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য জন্য আমি আজও তোমার দর্শন পেলাম না, আমার জীবনবিম্বও তোমার প্রতিবিম্বে মগ্ন হয় না। তুমি তো ভালো জানো মা, যে তোমা ভিন্ন জগতে আমার কেহই নাই। আর জগতের কোনো পদার্থেও আমার বাসনা নাই। আবার কি করিলে তোমাকে পাব, তাহাও জানি না, তুমি নিজ মহিমায় দর্শন দিয়া আমায় চরিতার্থ কর।'

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন

বালকের ন্যায় রোদন ও ব্যাকুল-প্রার্থনায় সফলকাম না হওয়ায়, বিষম বিষাদে কিছুদিন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে যুগপ্রায়, গত হইল। এক দিন ভবতারিণীর পূজাকালে এমন এক ভাবের উদয় হয়, যখন তিনি উন্মত্তভাবে ভবানীকে কহেন, 'যদি তুমি এখনই আমাকে দর্শন না দাও, তাহা হইলে তোমারই হাতের অসি লইয়া তোমারই শ্রীপদে এই দুঃসহ প্রাণকে বলি দিব'—বলিয়া যেমন অসি-গ্রহণে উদ্যত, অমনই দিব্যচক্ষে দেখেন যে, দেবী মৃন্ময়ীতেই চিন্ময়ীরূপে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মহামায়ার বিশ্বব্যাপী চৈতন্য এবং তন্মধ্যে জ্যোতির্ময়ী, ঘনশ্যামা, প্রফুল্লবদনা রূপ দেখিয়া ভাবে এতই বিভোর হন যে, তখন তাঁহার জগৎ বা নিজদেহ বোধ কিছুই ছিল না; ছিল কেবল তাঁহার অন্তর্বহি ঈশ্বরীর তুরীয় ও ঘন-চৈতন্য রূপ।

ভাবের পূজা

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শনাবধি বৈধকর্মে বিরাগ হইলেও, তিনি তাঁহার হৃদয়-শোভনা শ্যামার অর্চনায় সাধ্যমত বিরত হন নাই। তবে এ পূজা আর পূর্বমতো নহে, এখন ভাবের পূজা। দেখিতেন, ব্রহ্মময়ী সব ঘটে বিরাজমান, তাই একদিন মন্দির মধ্যে এক বিড়ালী দেখিয়া জীবন্ত ভগবতী জ্ঞানে তাহাকে কালীমাতার নৈবেদ্য হইতে মিষ্টান্ন দান করেন। আবার দেখিতেন, নিবেদন করিবার অগ্রেই ভগবতী, প্রতিমা হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছেন; ইহাতে বালকের মতো কোনোদিন বলিতেন, 'খাবি তো জানি, তা মন্ত্রটা বলবার অপেক্ষা করলি না?' আরও দেখিতেন, ভগবতী বালিকাবেশে নৃত্য করিতে করিতে সোপান বাহিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিতেছেন ও দ্রুতপদে অবতরণ করিতেছেন। গান শুনাইবার সময় দেখিতেন, মহামায়া পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া তাঁহাকে ব্যজন ও তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিতে বলিতেছেন। এইজন্য এক এক দিন যেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভবানীর নিকট শয়ন করিতে হইত। পাঠক বলিবেন—অসম্ভব।—সত্য। একের বহু হওয়া যদি সম্ভব হয়, জলের যুগপৎ জমাট ও তরল হওয়া যদি সম্ভব হয়, ভগবানের বিগ্রহ-ধারণ যদি সম্ভব হয়, তখন ইহাই বা সম্ভব হইবে না কেন?

দেবী চৈতন্যা

ঈশ্বর যাঁহার প্রতি অনুকূল, মানবের সাধ্য কি যে তাঁহার প্রতিকূল হয়? পূজাকালে ভাবভরে যেরূপ আচরণ করিতেন, দেবালয়বাসীদের অভিমত না হইলেও কেহ

প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না, যেহেতু রাণী ও তাঁহার জামাতা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এবং উল্লাস করিয়া বলিতেন, 'এত কালের পর এই মহাপুরুষের পূজায় ভবতারিণী চৈতন্যা হইয়াছেন।' গুরুরূপী গদাধর জ্ঞান দিলেন—ঐকান্তিক অনুরাগই ঈশ্বরলাভের প্রকৃত উপায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হইলেও অন্তরায় হয় না।

অদর্শনে রোদন

এইরূপে ঈশ্বরীর ঘন-চৈতন্য রূপ ও অরূপ দর্শনে অহর্নিশি আপনভাবে অবস্থান করিতেন। ভাব-তরঙ্গে ভাসমান-জন্য দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইলেও যত্নাভাবে তাঁহার প্রাকৃত তনু ক্ষীণ হইতেছে দেখিয়া বহুজন-কল্যাণ-কামনায় ভবানী উহা রক্ষণ, বা তাঁহাকে অবকাশ দিবার বাসনায় তাঁহার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেন। অথবা বিচ্ছেদ-বিহনে মিলন-সুখ উপাদেয় হয় না ভাবিয়া, অধিকতর সুখী করিবার জন্য তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, উচ্চ রবে এতই রোদন করিতেন, যাহাতে দর্শকগণ তাঁহার শুভেচ্ছা না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিত না। এই সময় সমবয়স্ক ভাগিনেয় হৃদয়নাথ তাঁহার সেবা করিতেন ও ভবতারিণীর অর্চনা করিতেন।

উপদেবতার আবেশ

ভগবদ্‌ভাবের আবেশে কখনো উন্মত্ত এবং কখনো বা বালকের মতো আচরণ দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু ভাগ্যাভাবে যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি বিকৃত, তাহারাই জল্পনা করিত, হয়তো অনাচার-প্রযুক্ত উপদেবতার আবেশ হইয়াছে, অথবা জাগ্রত দেবতার বিধিবৎ অর্চনে অবহেলা করায়, তাঁহারই কোপে উন্মাদ হইয়াছেন।

দিব্যোন্মাদ

যাহা হউক, তাঁহাদের ছোট ভট্টাচার্যকে নিরাময় করিবার অভিপ্রায়ে মথুরানাথ চিকিৎসার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু প্রকৃত রোগ নিরাকরণে অপারগ হওয়ায় চিকিৎসকগণের ঔষধাদি প্রয়োগ সমস্তই বিফল হয়। পরিশেষে পূর্ববঙ্গনিবাসী একজন বিজ্ঞ কবিরাজ বলেন—সাধারণ লোকের ন্যায় এই মহাপুরুষের বায়ুরোগ নহে; ইহা দিব্যোন্মাদ অবস্থা, ক্বচিৎ কোনো ভাগ্যবানের সম্ভব হয়, সুতরাং আমরা ইহার প্রতিকার করিতে অপারগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেশে গমন

চিত্ত-উত্তেজক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে, স্বতঃই শরীর ও মনের অবসাদ হইয়া থাকে। সুতরাং যে স্থান এরূপ, তথা হইতে কিছুদিন অন্তরে থাকিলে উপকার সম্ভব, ইহা ভাবিয়া এবং মাতার অনুরোধ জানিয়া গদাধরকে এখন তাঁহার জন্মস্থানে পাঠানো হইল। তথায় মাতৃস্নেহ, উপযুক্ত পথ্য, সেবা, বাল্যলীলাভূমি ও বয়স্যগণ পাইয়া ক্রমশঃ দেহ পুষ্ট ও চিত্ত প্রসন্ন হইতে থাকিল। অন্তরে যে অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছে, কিছুদিনের জন্য তাহা নির্বাপিতপ্রায় দেখাইল। তবে কি জানি, বৈরাগ্য-বাতাসে তাহা যে

আবার কখন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার শঙ্কাও রহিল। সে যাহা হউক, পুত্রকে উপস্থিত সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া জননী মনে করিলেন, যদি এই সময় কোনোমতে শ্রী-যুক্ত করিতে পারি অর্থাৎ বিবাহ দিতে পারি, নববধূ পাইয়া মনের গতি সংসার-পানে ফিরিতেও পারে। সেই জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং গদাধরও সম্মত হইলেন।

বিবাহ

দারপরিগ্রহ ভগবান-লাভের অন্তরায় হয় না, ইহাই আমাদিগকে দেখাইতে, অথবা সনাতন মতের আশ্রম-মর্যাদা রক্ষা করিতে গদাধর ভার্যা গ্রহণ করিলেন। কোনো কারণ বশতঃ একদিন কহেন—দশবিধ সংস্কার সম্পন্ন না হইলে মনোবৃত্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ না করিলে, প্রকৃষ্টরূপে ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য হওয়া যায় না। ইহাই বা চিন্তা করিয়া বিবাহ করেন।

এই বিবাহ আমাদের উদ্বন্ধনের মতো বিভ্রাটজনক নহে। ইহা জগতের মাতা-পিতা গৌরী-শঙ্করের মিলন। কাব্য-নাটক আলোচনায় ভোগসুখ-লালসায় স্ত্রীযুত, সুতরাং উদ্ভ্রান্ত হইয়া আমরা যেমন উৎসন্ন যাই, তদ্বিপরীতে ঠাকুর পত্নীকে শ্রীভগবতীর মূর্তিবিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিপূজা করিতেন। বলিতেন, দেবী মহাশক্তি-স্বরূপিণী বাগ্‌দেবতা সরস্বতী-অংশসম্ভবা। রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া হীনচেতা ব্যক্তি পাছে অপরাধগ্রস্ত হয়, তাই এবার বাহ্যরূপ লুকাইয়া অন্তরে দিব্যরূপের সজ্জা করিয়াছেন। নিত্য-সম্বন্ধবশতঃ আমার শরীর পালনে যুগে যুগে আগমন করিয়া থাকেন। দেবী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; উঁহারই বুদ্ধির আশ্রয়ে পাগল আমি কার্যক্ষম হইয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন

জীবদায়ে যিনি দায়ী, তিনি কি আর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ? সুতরাং কিছুদিন পরে দেবালয়ে আসিলেন এবং জগন্মাতার পূজায়ও মনোনিবেশ করিলেন। ঠাকুর বলেন—উকিল, ডাক্তার ও সাধু দেখিলে যেমন বিষয়-ব্যবহার, রোগ-প্রতিকার এবং ভগবদ-বিষয়ের উদ্দীপন হয়, তেমনই তাঁহার অর্চিত শ্রীশ্রীকালীমাতার দর্শনে ও পূজনে অনুরাগের এমন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়, যাহাতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অভিনব ভাবে সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। রাণী ভাবিলেন—যখন তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছেন, তখন তিনি কোন্ সাহসে আবার তাঁহাকে কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারেন ? তাই হৃদয়নাথের উপর পূজাভার পুনরায় অর্পিত হইল।

সাধন

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী দর্শনে যিনি আত্মতৃপ্ত, তাঁহার আবার সাধনার প্রয়োজন কি ? তবে বোধ হয়, লোকশিক্ষা ও শাস্ত্র উদ্ভাষণকল্পে সাধনার অবতারণা। তাই বুঝি ঠাকুর ভাবিলেন—অহঙ্কারই যত অনর্থের মূল, ইহাকে নিধন এবং পথের কণ্টক—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়কে পরিহার করিতে না পারিলে ভগবান-লাভ একপ্রকার অসম্ভব। এই হেতু দেবালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে নগ্ন হইয়া ঈশ্বরীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। জাতিকুলমান-ত্যাগ বাসনায়, ব্রাহ্মণত্ব-পরিচায়ক যজ্ঞসূত্রটিকে ভূমিতে রক্ষা করিতেন, আবার ঘৃণা ও অহঙ্কার

নাশ-বাসনায় দেবালয়ের লোকদিগের শৌচস্থান (পাছে কেহ বাধা দেয়) সকলের অজ্ঞাতসারে মার্জনা করিতেন। দিবা বা নিশায় ঈশ-দর্শন আবেশ আসিলে সকল সম্পদের আস্পদ প্রাণকেও তুচ্ছ করিয়া বিপদসঙ্কুল বনে গিয়া ধ্যান করিতেন। প্রাণের ভয় যাঁহার নাই, তাঁহার কি আর লোকনিন্দার ভয় সম্ভব ?

মায়া

জাতিকুলমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও অহংকার-বিজয়ে সিদ্ধকাম হইয়া মনে করিলেন—যে মায়াপ্রভাবে জগৎ-সংসার আচ্ছন্ন, তার অধিকার হইতে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া যায় ? মায়া কি ? ইন্দ্রজালে যিনি সকলকেই মোহিত করিয়াছেন, তিনিই মায়া। অর্থাৎ ঋষিরা ইঁহাকে অঘটন-ঘটনকারিণী বলিয়াছেন, অমিতাভ ইহাকে মার বলিয়াছেন এবং ঈশামসি ইঁহাকে শয়তান আখ্যা দিয়াছেন।

কামিনী-কাঞ্চন

যাঁহার সবই নূতন, সেই ঠাকুর কামিনীকাঞ্চন বলিয়া মায়ার আর একটি নূতন নামকরণ করিলেন। কারণ, মানবমাত্রেই সুখ-লালসায় কামিনী-কাঞ্চনে মোহিত। এখন কোন্ উপায়ে ইহাকে জয় করিতে পারা যায় ? যেমন চিন্তা, অমনই উপায়ও উদ্ভূত হইল।

কাঞ্চন-বিজয়

এক হস্তে মুদ্রা, অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া সুরধুনীতটে বসিয়া বিচার আসিল—টাকাতে কি হয় ? আর মাটিতেই বা কি হয় ? টাকাতে ঘর, বাড়ি, মান, ঐশ্বর্য হয়। মাটিতেও ঠিক তাই হয়, কিন্তু ভগবান-লাভ তো হয় না, তখন টাকা ও মাটি একই বস্তু, সুতরাং কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যজ্য। এইরূপে কিছুক্ষণ 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে যখন টাকাকে মাটি বলিয়া ধারণা হইল, তখন উভয়কেই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!

কামিনী-বিজয়

এবার কামিনী সম্বন্ধে বিচার আসিল, বলিলেন, 'মেয়ে মেয়ে মেয়ে, জগৎ দিলে খেয়ে ; যত বড়ো বীর হও না ; লড়াই ফতে কর না কেন, কামিনী-কটাক্ষে জড়সড়।' আবার কহিলেন—কামিনী-দেহটা কোন পদার্থে নির্মিত ? হাড়ের খাঁচা, মাংসের ছৈ, তাতে চুল গাছ দুই, তার উপর রং এক পোঁচ। কিন্তু যতই কেন বিচার কর না, কাম-আকর্ষণী কামিনীর মোহিনীশক্তি হতে পরিত্রাণ অসম্ভব। 'কাজর কী ঘরমে যেত্তা সিয়ান হো থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে। যুবতিকো সাত যেত্তা সিয়ান হো থোড়া কাম জাগে পর জাগে।' তবে ভগবতী-জ্ঞানে মাতৃ-সম্বোধনে যিনি নতশির হইয়াছেন, তিনিই ইহার অধিকার হইতে নিস্তার পাইয়াছেন। এই কারণে নারীমূর্তি দেখিলে ঠাকুর, মা আনন্দময়ী বলিয়া প্রণাম করিতেন। বলা বাহুল্য যে, আমাদের মতো সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুকদের তাঁহার সহিত গমনে অনেক সময় বিড়ম্বনা বোধ হইত। তাই প্রভুর কৃপালব্ধ কবি গিরিশচন্দ্র গাহিয়াছেন, 'কামিনী-কাঞ্চন একই মায়া দুই রূপে করে আকর্ষণ ; কেহ মান করিতে অর্জন বহে শিরে দীর্ঘজটা, কেহ সন্ন্যাসীর ভাণ ভুলাইতে বামাগণে।'

শরীর মন আয়ত্ত

দেহ ও মনকে আয়ত্ত করিয়া নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় কিরূপে ঈশ্বর-চিন্তা করিতে

পারেন ? স্বরাট দেহ-মনকে বিরাট দেহ-মনে নিমজ্জিত করায়, ধারণা হয়, যেন তাঁহার শরীর ও মন অটল ও বৃত্তিশূন্য হইয়াছে, তৎসঙ্গে অনুভবও করেন; কে একজন তাঁহার দেহগ্রন্থি এমনভাবে রুদ্ধ করিয়া দিল যে, ইচ্ছা করিলেও অঙ্গসঞ্চালন-সামর্থ্য রহিল না। আবার আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক ব্যাপারে পাছে ধ্যানচ্যুত হন, তাই দেখেন, উগ্র ভৈরবের ন্যায় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ শূল হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুক্ষস্বরে বলিতেছেন— পরমাত্মার ধ্যানে উন্মনা হইলে তাঁহাকে নিপাত করিবেন।

দিব্যদর্শন

এইরূপে যোগারূঢ় হইয়া উপলব্ধি করেন—সপ্তমভূমি বা সহস্রদল কমলে পরম শিব পদ্মাসনে মিলন-বাসনায় কুণ্ডলিনী দেবী জীবসহ কখনো ভেক, কখনো মীন এবং কখনো বা মর্কট গতিতে উত্তরোত্তর ভূমি বা কমলে উত্থিত হইতেছেন। আরও দেখেন, যেন তাঁহারই চিদাকাশে বিবিধ নামরূপ-বিশিষ্ট বিশ্ব বুদ্বুদের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া আবার তাঁহাতেই লীন হইতেছে। কখনো বা অনুভব হয়—সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া আপনিও যেন তাহাই হইয়াছেন।

মানবে অসম্ভব

ইহাতে ধারণা হয় যে, ভগবান ভিন্ন মানবের পক্ষে ঈদৃশ অভূতপূর্ব সাধন করা অসম্ভব; এবং ইতিহাসেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেহেতু মানব যতই সুকৃতিবান হউক না কেন, বিশেষ কোনো একটা সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে তাহার জীবন কাটিয়া যায়। কিন্তু লোকোত্তরচরিত ঠাকুর আত্মপ্রেরণায়, অনুরাগভরে এই সকল অলৌকিক সাধনে স্বল্প-কালেই কৃতকার্য হন। বাজীকর যেমন ভেল্কি দ্বারা সদ্যরোপিত বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফলোৎপাদন করিয়া অন্তরে বিস্ময় উৎপাদন করে, মহা ঐন্দ্রজালিক ঠাকুরও তদ্রূপ অসাধারণ সাধন-ক্রীড়া দ্বারা ভক্তচিত্তকে অভিভূত করিয়াছেন।

একাকার

বলিতেন—'ঝড় উঠিলে যেমন আম-গাছ তেঁতুল-গাছের প্রভেদ করা যায় না, আমার অনুরাগের ঝড়ে সব একাকার বোধ হয়েছিল। মনের ঊর্ধ্ব গতিতে বক্ষ ও বদন আরক্তিম হইয়াছিল। চক্ষু এতই স্থির যে, পলকটিও পড়ত না, শীত, বাত, তাত সমবোধ। নিদ্রা আসত না, অবসন্ন হলে যোগদণ্ড ভর করে আবার সরল হয়ে বসতাম। নেশার মতন এমন একটা ঝোঁক আসে, তাতে দিন-রাত বেহুঁশ হয়ে (সমাধিস্থ) থাকতাম। দিন-রাত কোথা দিয়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ভাগ্যে (তাঁহার না আমাদের ?) হৃদু ছিল, তাই শরীরটা ভেঙে যাবার ভয়ে ভাতের থাল সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে খাও গো বলতে বলতে তবে হুঁশ আসত, তখন খেতে হয় শরীর ধারণ জন্য বলে, কটু তেতো মিঠে কঠিন তরল সব এক করে দু-চার গ্রাস খেতে খেতে আবার বেহুঁশ (সমাধি); এর জন্যে অনেক দিন কিছুই পেটে যেত না।'

ধ্যানসিদ্ধ

অল্পকাল ধ্যান-চেষ্টায় পাছে আমরা স্ফীত হই, তাই সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে বলেন,— ঈশ্বর চিন্তায় শরীরে আস্থা না থাকায়, মাথায় জটা হয়েছিল, আর স্থাণুর মতো থাকায় পাখীতে জটার ভেতর বাসা করেছিল। ধ্যানসিদ্ধ হলে এই অবস্থা হয়।

মহাভাব

সদা-সর্বক্ষণ দিব্যভাবে অবস্থান করায় তাঁহার দৈবী দেহে অশ্রুকম্পপুলক প্রভৃতি মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। আবার বিরাটের সহিত যখন একাত্ম বোধ করিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিলে, বেদনা বোধ করিতেন, যেন তাঁহারই বুকের উপর দিয়া যাইতেছে। আবার এমন গাত্রদাহ উপস্থিত হইত যে আর্দ্রবস্ত্রে আবৃত হইয়া, কবিরাজের তৈলাদি ব্যবহার করিয়া, এক বন্ধু-প্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়াও কিছুতেই শান্তি বোধ না হওয়ায়, সমস্ত দিন জাহ্নবীজলে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া থাকিতেন।

কৃপাবাণী

কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেন—বারো বৎসর এখানকার উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। কেন? তোরা সব কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, কঠোরে অবসন্ন হবি, তাই জন্যেই এত উগ্র তপস্যা, নইলে এখানকার (আপনার) জন্যে নয়। তাই প্রভু কৃপাপুরঃসর বলেন—বিশ্বাস কর, তোদের জন্যে ভাত বেড়েছি, খেয়ে আনন্দ কর। জীবন তো চলে যায়, সে বিশ্বাস কৈ? ভরসা কেবল করুণা; আশা, বঞ্চিত হব না—যেহেতু আশ্রিত।

অষ্টম অধ্যায়

ভৈরবী আগমন

হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ের সংযোগ বিনা কোনো অনুষ্ঠানই সংসিদ্ধ হয় না। চিন্ময়ীর দর্শনাবধি ঠাকুর কেবল হৃদয়ের প্রেরণায় সাধন করিতেছিলেন। এখন যাহাতে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্ক-যোগে ধর্মরাজ্যের সকল দিকই আয়ত্ত করিতে পারেন, বোধ হয়, এই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী এক ভৈরবীকে আনয়ন করিলেন।

ভৈরবী-মিলন

এক দিন সন্ধ্যা-সমাগমে গঙ্গাগর্ভ হইতে আবাসে আসিবার কালে দেখেন যে—স্নানার্থীদের বিশ্রামমণ্ডপে (চাঁদনীতে) এক প্রৌঢ়া ভৈরবী বসিয়া আছেন; গলে রুদ্রাক্ষমালা, এক হস্তে খুঙ্গী (পূজোপকরণ ও বস্ত্ররক্ষা জন্য তালপত্র-নির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকা), অন্য হস্তে বস্ত্রাবৃত পুঁথি। আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহাকে সদ্বংশজাতা ও সিদ্ধা বলিয়া বোধ হয়, এবং কি জানি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ঠাকুরের অন্তরে মাতৃভাবের উদয় হয়। স্বস্থানে আসিয়া হৃদয়কে কহিলেন—চাঁদনীতে এক ভৈরবী এসেছেন, তাঁকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া আনো। হৃদয়ের সঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই ভৈরবী আশ্চর্য হন, এবং বাৎসল্যভাবে বলেন, 'বাবা! তুমি এখানে লুকায়ে আছ, আমি যে নানাস্থানে তোমারই সন্ধানে ফিরিতেছি।'

সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে ভগবানের অভিজ্ঞান হয় না, এবং অভিজ্ঞান না হইলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হওয়াও যায় না, এবং আকৃষ্ট না হইলে ভগবানও আত্মপ্রকাশ করেন না; সুতরাং আকর্ষণই ভক্ত-ভগবানের মিলনকারণ। ভৈরবী চিনিয়াছিলেন ঠাকুরকে, এবং তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য, জ্ঞানগুরু হইয়াও ঠাকুরের বালকভাবের অবতারণা। ভৈরবী উপবেশন করিলে ঠাকুর বালকের মতো বলিতে থাকেন—কত চিকিৎসা হল, কবচ ধারণও করলাম, আবার গঙ্গার জলে গা ডুবায়ে বসে থাকি, তবুও গায়ের জ্বালা সারিল না। যখন আপন মনে কাঁদি, তখন মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে ওঠে, সুমুখ দিয়ে কেউ চলে

গেলে মনে হয়, যেন আমারই বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কেহ বলে পাগল হয়েছি, কেহ বলে ভূতে পেয়েছে। কেন আমার এমন হল, আর এ গায়ের জ্বালা কি ভালো হবে না?

বিস্ময়

ভৈরবী দেবী অতিমাত্রায় বিস্মিতা হইয়া ভাবেন—জগদীশ এবার এতই বালকভাব ধরেছেন যে, সর্বেশ্বর হইয়াও আত্মবিস্মৃত। চারি যুগে এমনটি তো সম্ভব হয় নাই, বা পুরাণাদিতে দেখিতেও পাই নাই। অতুল্য! আপনিই আপনার তুলনা! প্রকাশ্যে কহেন—ভয় কি বাবা, এখনই তোমার গাত্রদাহ ভালো করিয়া দিতেছি। হৃদয়নাথকে কহিলেন—কিঞ্চিৎ শ্বেতচন্দন, আর একছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা আনো, হৃদয়ও আনিলেন। তখন ভৈরবী দেবী চন্দন দ্বারা ঠাকুরের দেবাঙ্গ চর্চিত করিয়া গলে পুষ্পমালা দিবামাত্রই ঠাকুর বলেন—ওরে, ঠিক যেন আগুনে জল পড়বার মতো গায়ের জ্বালা তখনই ভালো হয়ে গেল।

আনন্দ-সংবাদ

যোগজ বিভূতি বা চিকিৎসায় দাহশান্তি হইলে ঠাকুর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এবং মথুরানাথকে আনন্দ-সংবাদ দেন,—আজ সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণী এসেছেন, তাঁরই দৈব-শক্তিতে গায়ের জ্বালা ভালো হয়েছে, আর কাল সকালে তোমাকে আমার কথা বলবেন।

দেখা যায়—শ্রদ্ধাবান হইলেও ঐশ্বর্যমদ কিছু-না-কিছু মনোবিকার আনয়ন করে। পরদিন প্রভাতে ভৈরবী যখন কালীমাতার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করেন, মথুরানাথ যদিও তাঁহার বিভূতি-বিকাশ শ্রবণ এবং তপঃপূর্ণ কান্তি দর্শনে শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তথাপি ঐশ্বর্য-গরিমায় বলেন, 'ঠাকুরাণীকে ভৈরবী বলিয়া মনে হইতেছে, আপনার ভৈরব কোথায়?' ভৈরবী শান্তভাবে কহেন—'বাবা, আমার ভৈরব নীরদবরণীর পদতলে।' 'তিনি যে অচল।' —চাপল্যবশতঃ এই কথা বলিলে, ভৈরবী গম্ভীরভাবে কহেন—অচলকে যদি সচল করিতে না পারিব, তবে এ পথে অগ্রসর কেন?' শুনিয়া মথুরানাথ স্তম্ভিত ও অপ্রতিভ।

ঠাকুরের পরিচয়

ঠাকুরের গৃহে মথুরানাথ-সহ পরিচিতা হইয়া ভৈরবী কহেন—আপনারা যাঁহাকে ছোট ভট্টাচার্য বলিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া দেখিতেছি। আপনাদের অশ্রুতপূর্ব ইঁহার দিব্যভাব, যাহা আপনারা ব্যাধি-জ্ঞানে চিকিৎসায়ও ফল পান নাই, ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে মহাভাব বলে। ভগবদ্‌ভাবে অহর্নিশ অবস্থান করায় বাহ্যে এই অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়। দ্বাপর যুগে শ্রীমতীর এই ভাব হইয়াছিল, যাহা অবলম্বনে বৈষ্ণব-কবিগণ পদাবলী রচনায় ভূতলে ভক্তিবন্যা আনিয়াছেন। আবার কলিযুগে হরিনামে মাতোয়ারা নিমাইচাঁদের এই মহাভাব হয়। সুদুর্লভ এই ভাব কদাচ মানবভাগ্যে সম্ভব হয় না, কেবলমাত্র জীবেশ্বরেই ইহার বিকাশ হয়। সুতরাং আপনাদের ছোট ভট্টাচার্য প্রকৃত মানব নহেন, ইনি জীবেশ্বর। যদি সংশয় হয়, অনুরোধ করি, পণ্ডিতগণ আবাহন করুন, সভাতে প্রমাণ করিব—ইনি জীবেশ্বর—জীবদায়ে আবির্ভূত।

ঠাকুরকে বুঝান

এই সমস্ত শুনিয়া ঠাকুর বলেন—তোমরা তো কত কথা কহিলে, আমি তার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভৈরবী—'বুঝলে বাবা! ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগে তুমি আত্মবিস্মৃত, আর না হবেই বা কেন, অনুরাগ তো দ্বৈতবুদ্ধি রাখে না, তাই আপনাকে

চিনতে পারছ না। সভাতে প্রকাশ করব, তুমি কে বা কি হেতু বালকের মতো আচরণ।'

মথুরানাথের নিমন্ত্রণে যে সমস্ত পণ্ডিত আগমন করেন, সাধনসম্পন্ন বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। ইনি ঠাকুরের দেবোপম ও অমানুষিক ভাবদর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ হন, তথাপি কি জানি মনোভাব ব্যক্ত করিতে বিরত হইতেছেন দেখিয়া ভৈরবী দেবী গম্ভীরভাবে বোধ হয় এই ভাবেই অভিভাষণ করেন।

ভৈরবীর অভিভাষণ

(ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া) আজ আমরা এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সমাগত। সদ্গুরু-প্রসাদে শাস্ত্রমর্ম অবধারণ, তীর্থপীঠে সাধন ও শ্রদ্ধেয় সাধুগণ সহ সদালাপে আমার ধারণা যে, ধর্মগ্লানি ঘটিলে শ্রীভগবান আপনাকে প্রকট করিয়া ধর্ম-মর্যাদা রক্ষা করেন। সনাতন ধর্ম নারায়ণের অঙ্গস্বরূপ, উহা বিকৃত হইলে তাঁহারই শ্রীঅঙ্গ মলিন হয়, সুতরাং তিনি উহার মার্জন-বাসনায় দেশ-কালপাত্র অনুসারে যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। জ্ঞান-ভক্তির চরম শাস্ত্র ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'—অর্থাৎ ভগবদবতারের ইতি করা যায় না। তাই বোধ হয়, এই মহাবাক্য প্রতিপাদনকল্পে—শ্রীভগবানই কপিল, দত্তাত্রেয়, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই এক সনাতন ধর্মকেই নানাভাবে উপদেশ করতঃ জগতের হিত-সাধন করিয়াছেন।

এই অলোকসামান্য পুরুষ বালকভাবে ভাবিত হইলেও আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ইনিই নিখিল শাস্ত্রবক্তা ও ধর্মগোপ্তা জীবেশ্বর যোগদৃষ্টিতে পূর্বগ অবতারগণের সমতুল হইলেও আমার ধারণায় ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু একাধারে অশেষ ভাবের সমাবেশ অন্য অবতার পুরুষে দেখা যায় না, তাঁহারা অল্পাধিক ঐশ্বর্য (বিভূতি) অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইনি নিরাবিল মাধুর্যময়। জড়চর্চা-প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া ঐহিক সুখলাভই পুরুষার্থ, এই বিষয় যখন মানব সমাজকে ধ্বংস করিতেছিল, তখন বালকের ন্যায় নির্মলচিত্ত না হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকার অসম্ভব। তাই জনকল্যাণ জন্য জগদীশ এবার বালক-স্বভাব হইয়াছেন। ধর্মতত্ত্ব গুহানিহিত (সুগভীর) বলিয়াই, 'নানা মুনির নানা মত', সুতরাং শাস্ত্রও বহুল এবং তাহাদের টীকা-টিপ্পনীও জটিল। আবার শাস্ত্রকর্তারাও স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠায় কতই না বিতণ্ডা করিয়াছেন। এই হেতু শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতিরেকে, কেবল পুরুষোত্তমের আরাধনায় সমগ্র শাস্ত্র ও সকল ধর্মকে উদ্ভাসিত করিবার ইচ্ছায় সর্বজ্ঞ এবার লোকদৃষ্টিতে যেন নিরক্ষর হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান অভাবে সাধারণ মানব ইহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকাশ বা মহাভাবকে ব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে; আমি কিন্তু স্পর্ধা করিতে পারি, যাঁহার করুণায় অগণন নরনারী ভবব্যাধিমুক্ত হইবে, সেই এই ব্রহ্মমানবের কি প্রাকৃতজনের ন্যায় উন্মাদ রোগ সম্ভব?

শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা শ্রীমতীরই এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইয়াছিল, অপর কোনো ঋষি বা ভক্ত-ভাগ্যে ঘটে নাই—আর ভক্তিমূর্তি শ্রীমহাপ্রভুর দেবদেহে ইহার প্রকাশ পাইয়াছিল। এ তো অতীতের কথা। ঈশ্বরীয় কৃপায় আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন, এই পুরুষপ্রবরে সেই প্রাচীন কালের দৃষ্ট, শাস্ত্র-কথিত অষ্টসাত্ত্বিক ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মহাভাব জীবের ভাগ্যে উদিত হয় না; যাঁহার হয়, তিনি জীবেশ্বর—নরাকারে নারায়ণ। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি—ইহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গতে শাস্ত্রবর্ণিত ভাগবতী লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে—বিশ্বাস করুন; যদি সংশয় হয়, শাস্ত্রমত বিচার করুন। ইহাই প্রার্থনা।

ভৈরবী দেবীর তত্ত্বপূর্ণ অভিভাষণে পণ্ডিতমণ্ডলী কহেন—আমাদের ধারণা হইল, (ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইনি একজন অসামান্য মহাপুরুষ।

বৈষ্ণবচরণের স্তব

অসম্ভব সম্ভব হইলেও তাহা দর্শন বা শ্রবণ করিয়া সহসা লোকসকাশে প্রকাশ করা অনুচিত। যেহেতু অনেক সময় সংশয়-সম্পাতে উহাতে সাধারণ মানবের অপকার সম্ভব। বোধ হয়, এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী, ঠাকুর সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন, পণ্ডিতগণ তাঁহারই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন আনন্দচিত্তে একটি স্তোত্র রচনা করিয়া ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্তুতি করেন, যাহা শুনিয়া সকলেরই চমক ভাঙিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বহু সন্ধানেও উহা উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।

ঠাকুরের ভাব

ঠাকুর বলেন—ভৈরবী বামনী কত কথাই কহিল, বৈষ্ণবচরণও স্তুতি করিল, কিন্তু ব্রহ্মময়ী মা তো আমাকে বলেন নাই আমি কে? তিনি যখন দয়া করে জানাবেন, তখন বিশ্বাস করব, নইলে এদের কথায় ভুলব না। আমি যেমন তাঁর বালক, তেমনই থাকিব।

বিষম ক্ষুধা

বহুদিন ব্যাপিয়া উৎকট তপস্যায় ঠাকুরকে অনেক সময় অনাহারে অতিবাহিত করিতে হয়। অনুরাগ-ঝটিকা সাম্য হইলে, সহজ অবস্থায় তাঁহার এত ক্ষুধার উদ্রেক হয় যে, প্রচুর ভোজনেও নিবৃত্তি পায় না। বলেন—ঠিক যেন পেটে ভস্মকীট ঢুকেছে রে, যা-ই খাই, অমনিই পরিপাক। ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদি আর জগদম্বাকে বলি—কে আমার খাবার জোগাবে? বামনীকে জানালে বলেন—এও এক দৈবী অবস্থা; তুমি দামোদর কি না, তাই সাধারণের মতো ভোজনে ক্ষুধাসাম্য হচ্ছে না। ভয় কি বাবা? এখনই উহার শান্তি করিয়া দিতেছি। তখন বহুবিধ আহার্য ঠাকুরের ঘরে রাখিয়া কহেন- যখনই ইচ্ছা খাইবে। এইরূপ করায় ঠাকুর বলেন, তিন দিনের মধ্যেই বভুক্ষার অবসান হয়।

নবম অধ্যায়

তন্ত্রমতে সাধন—ব্রাহ্মণীর চিন্তা

ভৈরবী ভাবিলেন যে, অনুরাগের অর্চনায় জগন্মাতার দর্শনে ও ধ্যানে ঠাকুর আত্মবিস্মৃত। সুতরাং ইঁহাকে প্রবোধিত ও তৎসহ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-শাস্ত্রকেও উদ্ভাসিত করিতে, এখন ইঁহাকে শাস্ত্রমতে সাধন করাইয়া লোকদৃষ্টিতে সিদ্ধাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

তন্ত্র-শাস্ত্র

সদসতের পরপারে বর্তমানা হ্রীঙ্কাররূপিণী মহামায়া, যিনি স্বীয় মহিমায় গুণময়ী হইয়া আপনাকে বহুধা রচনায়, নামরূপ ধারণে ঘোরা ও [illegible] এবং সম ও বিষমভাবে সৃষ্টি-সামঞ্জস্য করিতেছেন; এবং যাঁহার আরাধনায় চতুর্বর্গ অনায়াসলভ্য—ইহাই যে শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহাকে আগম-শাস্ত্র কহে। কিংবা প্রবৃত্তিলুব্ধ মানবকে কৌশলে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত করিবার উপায় [illegible] উপদিষ্ট, তাহাকে তন্ত্র-শাস্ত্র বলে অথবা (বিষয়)-বিষদুষ্ট মানবকে বিষচিকিৎসা দ্বারা নিরাময়পদ্ধতি যাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই নাম তন্ত্র-শাস্ত্র।

প্রকাশক

করুণাই যাঁহার মূর্তি এবং ত্যাগ যাঁহার ভূষণ, যিনি জগৎ-অমঙ্গল হলাহল পানে নীলকণ্ঠ, এবং জীব-শুভ-চিন্তায় যাঁহার অঙ্গকান্তিও শুভ্র, সেই মঙ্গলময় অঘোরনাথ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই তন্ত্রশাস্ত্র 'পশুপতিমত' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জপসাধন

মনকে ত্রাণ করেন বলিয়াই মন্ত্র বা মহাকাব্য গুরু ও ইষ্টসহ অভেদ ভাবনায়, তন্ময়চিত্তে আবৃত্তির নাম জপ। হিংসা ও আড়ম্বরহীন এই জপযজ্ঞ তন্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ সাধন। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে কঠিন পাষাণ যেমন ক্ষয় হয়, তেমনি জপানন্দ ক্ষরণে চিত্ত বিগলিত হইয়া জগন্মাতার পরমপদে বিলীন হয়। ইহাই শিববাক্য এবং ইহা নিঃসংশয়। প্রভু কহেন- ডুবুরিরা শিকল ধরে যেমন সমুদ্রতলে নেমে যায়, সেইরূপ নাম অবলম্বন করে নামীর কি না ভগবৎপাদপদ্মে মন ডুবে যায়।

ভৈরবীর প্ররোচনা

দ্বিজাতিগণ বৈদিকমার্গ অনুসরণে অপবর্গ লাভ করিবে, কিন্তু যাহারা দ্বিজ নহে, বা দ্বিজকুলোদ্ভব হইয়াও পথভ্রষ্ট, তাহাদের এবং সকল বর্ণের নর-নারীর পরিত্রাণ-বাসনায়, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ত্রিধারা মিলনে করুণাময় সদাশিব যে সুখ-সাধ্য তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছেন, উপাসকের দোষে অধুনা উহা বিকৃত। সুতরাং যাহাতে উহা পুনরুদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে এই মতে সাধন করিতে প্ররোচিত করেন।

মাতৃ-আদেশ-সাপেক্ষ

বর্ষীয়সী ঠাকুরাণীর অনুরোধ উপেক্ষা করিলে পাছে তিনি ক্ষোভিতা হন, ইহা ভাবিয়া ঠাকুর কহেন—যদি আদ্যামাতার আদেশ পাই, তবে কেবল তন্ত্র কেন, নিখিল ধর্মমতে সাধন করিয়া সকল দিক দিয়াই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ দর্শন করিতে পারি। আবার আমারই শুভেচ্ছায় শুভংকরী যখন তোমাকে আনিয়াছেন, তখন তাঁহারই ইঙ্গিতে তোমার অনুজ্ঞা পালন করিব।

আয়োজন

ভগবতীর সম্মতি পাইয়াছেন জানিয়া ভৈরবী দেবী আনন্দিতা হন, এবং গোগ্রাস দান হইতে আরম্ভ করিয়া চৌষট্টি তন্ত্রের বিবিধ সাধন উপচার সংগ্রহ করিতে থাকেন। জন-শূন্য স্থান অনুকূল বলিয়া দেবালয়ের উত্তরপ্রান্তে বিল্বতরুমূলে ঠাকুরের সাধন-স্থান মনোনীত হইল। পঞ্চমুণ্ড বেদিকায় উপাসনা অচিরে সিদ্ধিপ্রদ, তাই ব্রাহ্মণী বহু আয়াসে সে মহাসনও রচনা করিলেন।

সাধনা

এই মহাসাধনায় গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সংযমী ও নির্বিকার হইতে হয়, নচেৎ প্রতি পদে বিঘ্ন। কারণ, একদিকে যেমন ভোগসুখ-প্রদায়ক লোভনীয়, অপর দিকে তেমনই ভীতিপ্রদ দ্রব্যজাত উপকরণরূপে গৃহীত হয় বলিয়াই বিরল কেহ কৃতকার্য হন। বহুদিন ধরিয়া নিত্য নবভাবের সাধনান্তে একদিন ভৈরবী দেবী ঠাকুরকে যুগপৎ লোভনীয় ও ভয়াবহ এক দিব্যাসনে মহামায়ার ধ্যানাবলম্বন করিতে বলিলে, ঠাকুর বড়ই ভীত হন।

কিন্তু জগন্মাতার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনায় এমন এক আবেশ হয় যে, মহাসনে বসিয়া দু-চার বার জপ করিতেই একেবারে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। পরে ভৈরবীর চেষ্টায় ব্যুত্থিত হইয়া, দিব্যাসনকেই ভগবতীবোধে অর্চনা করেন।

ঠাকুরের মহত্ত্ব

তন্দর্শনে ভৈরবী অতিমাত্রায় বিস্মিতা হইয়া বলেন—'তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনে জানিয়াছি—এই মহাসাধনায় কেবল কন্দর্প-নিসূদন কপর্দীই সিদ্ধকাম হইয়াছেন। কিন্তু আজ বহু ভাগ্যে দেখিলাম, এই পরমসাধনে কেবলমাত্র তুমিই বাবা, মর্ত্যে দ্বিতীয় শিবরূপে কৃতকার্য হইলে, আর তোমার মতো শিষ্যকে সহায়তা করিয়া আমিও নিজেকে ধন্য বোধ করিলাম।

যোগ—বিভূতি

ঠাকুরের সাধন-সময়ে ভৈরবীর আহ্বানে চন্দ্র ও গিরিজা নামে দুইজন যোগৈশ্বর্যবান দেবালয়ে আগমন করেন। চন্দ্র লোকচক্ষুর অদৃশ্যে গমনাগমনে সক্ষম। গিরিজা পার্শ্ব দিয়া এমন জ্যোতি প্রকাশ করিতেন যাহাতে ঠাকুর অন্ধকার রাত্রে সাধন-স্থান হইতে নিজ-গৃহে আসিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠাকুরের শিবত্বলাভের পর, উহাদের বিভূতি সূর্যোদয়ে তারকার মতো অদৃশ্য হইলে, উঁহারা ঠাকুরের ভক্তরূপে পরিণত হন। ইহাতে জ্ঞান হয়, জননী যেমন শিশুকে খেলনা দিয়া ভুলান, ভগবান তেমনই অকৃতাত্মা মানবকে দর্শন-দান না দিয়া, অকিঞ্চিৎকর বিভূতিতেই পরিতুষ্ট করেন।

ভৈরবীর আকর্ষণ

ভৈরবী দেবী দেবালয়ের উত্তরে দেবনাথ মণ্ডলের চাঁদনীতে বিরাজ করিলেও ঠাকুরের সাধন-সময়ে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার ইচ্ছায় 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া ডাকিলে, তিনি যেন অবশভাবে তীর বাহিয়া তাঁহার নিকট যাইতেন এবং তাঁহার হস্তস্থ খাদ্য-গ্রহণে তাঁহাকে আনন্দিতা করিতেন। ঠাকুর বলেন—'এই সময় বামনীর ভাব ঠিক যেন নন্দরাণীর মতো দেখাত।'

দশম অধ্যায়

কতিপয় ঘটনা—আপ্তকাম

প্রাণপাত-সাধনায় যিনি আপন অস্তিত্বকে জগন্মাতার বিরাট সত্তায় বিলীন করিয়াছেন, তিনিই আপ্তকাম। সুতরাং মহামায়ার প্রেরণায় তাঁহার বাসনা থাকে না; আবার অভিলাষ-পূরণে অভীষ্ট দেবতারই জয়ঘোষণা করেন। অথবা যাঁহার দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রীরূপা মহা-শক্তি আপনাকেই প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার মহিমা গান না করিয়া কিরূপে আত্ম-গৌরব করিবেন?

পঞ্চবটী

ঠাকুরের সাধ পঞ্চবটীতে বসিয়া ঈশ্বরীর লীলারসে নিমগ্ন হন; তাই বিশেষ চেষ্টায় পঞ্চবটীও রোপণ করেন, কিন্তু আবেষ্টন অভাবে ছাগল-গরুতে উহা নষ্ট করিয়া দেয়। মনোবেদনা জানাইলে অঘটন-ঘটনকারিণী পরদিন জাহ্নবী-জীবনে বান ডাকিবার সময় আবেষ্টন উপযোগী একবোঝা খোঁটা, দড়ি ও একখানি কাটারি কূলে আনিয়া দেন।

তদ্দর্শনে জগদম্বারই কীর্তি জানিয়া ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করেন এবং ভর্তাভারী নামে একজন ভৃত্য-সহায়ে বোঝাটি তুলিয়া মনের সুখে আবেষ্টন দেন। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) অনুরোধে ঠাকুর ব্যাপারটি আমাকে বলেন ; আরও কহেন—'মহামায়ার এমনি খেলা যে, দ্রব্যগুলি সই সই।' ইহাতে ধারণা—বিভু এবার মাধুর্যময় হইলেও যোগবিভূতি যেন কিঙ্করের ন্যায় অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে।

পূজার অবসান

'আমি জ্ঞানী, আমি মুক্ত' এই অভিমানে কর্মকাণ্ডকে হেয়জ্ঞান নিন্দনীয়। ভাবা উচিত যে, ধর্মমার্গে প্রগতির জন্য কর্মই প্রধান সোপান। জীবনযাত্রাও যখন কর্ম-পরিহারে নির্বাহ হয় না, তখন ঈশ-অচনরূপে কর্মানুষ্ঠান সর্বতোভাবে পালনীয়। জগন্মাতা কৃপাপূর্বঃসর অবকাশ দান করিলেও ঠাকুর সাধ্যমতো তাঁহার অর্চনা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু ভাবের পূজায় যেদিন দেখেন যে বৃক্ষরাজি বিশ্বরূপের মস্তকে গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প-দান করিতেছে, এবং বিহগকুল স্ব স্ব রবে বিভূগুণই গাহিতেছে, তখন—দু-চারটা ফুল দিয়া আমি তাঁর কত পূজা ও স্তুতি করিব—ভাবিয়া মনে এতই লজ্জা হয় যে, ঐদিন হইতে তাঁহার পূজাকার্যের অবসান হয়।

স্তবপাঠে সমাধি

তথাপি কোনো একদিন আবেশ-ভরে শিবমহিমা গানে যখন 'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রম্, সুরতরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্বী। লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্ব-কালং, তদপি চ তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।' শ্লোকটিতে এতই বিহ্বল হন যে, সংস্কৃত ভুলিয়া 'মহাদেব গো! আমি তোমার মহিমা কি আর বলব গো' বলিয়া রোদনসহ সমাধিস্থ হন। বাহ্যবোধ হইলে দেখেন, মথুরানাথ জনতার মাঝে অসিহস্তে দণ্ডায়মান। পরে জানিতে পারেন, তাঁহার ভাবভঙ্গ-আশঙ্কায় মথুরের এই আচরণ।

অন্তর্যামিত্ব

বিবাট মনেরই অংশ সরাট মন ; সুতরাং বিরাট মনের ন্যায় মানব-মনেও অসাধারণ শক্তি বিদ্যমান। উপযুক্ত চেষ্টায় উহার উদ্বোধনে অক্ষম হইয়াই মানব অজ্ঞ ও শক্তিহীন। ঠাকুর কহেন 'সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলেই নেশা আসে না, উহা আনিয়া বাটিয়া খাইলে তবে মাদকতা হয়। সেইরূপ 'আমরা ঈশ্বরের অংশ' মুখে বলিলে ফলোদয় হয় না, বরং উপহাসাস্পদ হইতে হয়।' আমাদের ন্যায় নিষ্ফল অথচ সুললিত বাক্যবিন্যাস না করিয়া, মহা সাধনায় বিরাট মনের সহিত আপন মনকে মিলাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, সরাট মনোমধ্যে যে সমস্ত স্ফুট উদ্ভব হইত, ঠাকুর তাহা সহজেই অনুভব করিতেন। এই কারণে কোনো একদিন রাণী ঈশ্বর-প্রতীক শ্যামামায়ের পূজাকালে বিষয়-চিন্তা করিতেছেন জানিয়া 'বেটি! এখানেও ওই চিন্তা!'—বলিয়া কল্যাণার্থে পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাতে পুনরায় তাঁহাকে দেবীর ধ্যানে সমাহিত করেন। দিব্যশক্তির বিকাশে এইরূপ যে কত ঘটনা হইত, কে তাহা সম্যক বলিতে পারে?

আপনাকে চিনিয়াও বালক

প্রথমে বালকের ন্যায় অনুরাগ, পরে গুরু-উপদেশ বিধিবৎ সাধনায় সচ্চিদানন্দময়ীর তুরীয় ও ঘনরূপ দর্শন এবং তাঁহাতে অভেদভাবে অবস্থান করিয়া আপনি কে, তাহা

সম্যকরূপে জানিয়াছিলেন। তথাপি সহজ অবস্থায় বালকের মতো আচরণ করিতেন। কারণ, বালকচিত্ত স্বচ্ছ বলিয়াই উহাতে ভগবানের অধিষ্ঠান। এই বালস্বভাববশতঃ কহেন—'জগদম্বাই জানেন—মথুর এখানকে (আমাতে) তার ইষ্টরূপ দেখেছিল ; তাই আমাকে ভক্তি করে, আমার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে।'

ঠাকুরের মধ্যে মথুরের ইষ্টদর্শন

বলেন—'একদিন ঘরে বসে আছি, মথুর এসে পা-দুটো জড়িয়ে বললে, 'বাবা ! তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তুমি যখন বারান্দায় পাইচারী কর, কুঠিঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে তখন তোমাতে শিব ও কালীরূপ দেখে কৃতার্থ হয়েছি।' আমি বললাম, 'বাপু, আমি ও সব তো কিছু জানি না, মহামায়ার কৃপায় বা তোমার ভক্তিতেই ওই রকম দেখেছ, এখন ওঠ, রাণীর জামাই অমনভাবে থাকলে লোকে কি ভাববে ?' মথুর বলে, 'বাবা ! আমি লোকের কথা গ্রাহ্য করি না, আর তোমার কথায়ও ভুলি না। আমার কুষ্ঠীতে আছে—আমার ইষ্টদেবতা আমার সঙ্গে থাকবেন, আজ তা সার্থক হল, আর আমিও কৃতার্থ হলুম।'

একাদশ অধ্যায়

মনই গুরু

মধুমাছি যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আহরণে ভাণ্ডার পূর্ণ করে, ঠাকুরও তদ্রূপ ভগবানের মাতৃভাব অবধারণ করিয়া রামরস আস্বাদনে দাস্যভাবে সাধন বাসনা করিলেন। বিশুদ্ধ মনই গুরু হইয়া যাহা কল্যাণকর, তাহাতেই শিষ্যকে নিয়োগ করেন। প্রকৃত দাস্যভাবের উদয় না হইলে রামদর্শন অসম্ভব—মনের প্রেরণায় তাই দাস্যভক্তির প্রতীক শ্রীমন্মহাবীরের উপাসনায় নিরত হন, উপাস্যকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে উপাসককে তন্গতচিত্ত হইতে হয় (ঠাকুর বলেন তাতেই ডাইলুট হতে হয় ;) নচেৎ সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। সুতরাং মহাবীরের ভাবনায় লোকসঙ্গ ছাড়িয়া বৃক্ষমূলে বা বৃক্ষোপরি আসীন হইতেন এবং অনশন বা ফলাসনে তৃপ্ত থাকিয়া রাম রঘুবীর রব তুলিতেন। এইরূপে অল্পদিনেই বালার্ক-সদৃশ মহাবীরের দর্শন হয়।

সীতারাম-দর্শন

ঠাকুর বলেন, মায়ারূপিণী সীতা, পরব্রহ্ম রামকে আবরণ করে রেখেছেন, সুতরাং তাঁর প্রসন্নতা বিনা প্রাণারাম রাম-দরশন অসম্ভব। পঞ্চবটীতলে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমত সময় দেখিলেন—চন্দ্রকান্তি-সদৃশা অমানুষী রূপলাবণ্য ও কারুণ্যপূর্ণ এক রমণীমূর্তি, দিক আলো করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা ! দর্শনমাত্রেই রাম-রমা বলিয়া চিনিতে পারিলেন ; কিন্তু পূর্বভাব স্মরণে আনন্দে বাহ্যহারা হইলে, বৈদেহী তথা হইতে অদৃশ্য হন। প্রথমে জনমদুখিনী সীতাকে দেখেন বলিয়াই ঠাকুর কহেন, তাঁহার দেহে নানা দুঃখের (পীড়ার) সঞ্চার হইয়াছে। ভুবনমোহিনী ভগবতী তাঁর মায়া হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ায়, অচিরেই শ্রীরামচন্দ্রদর্শন লাভ হয়।

সাধু-সমাগম

আলোচনা বিনা অনুষ্ঠানের পরিপুষ্টি হয় না। আবার আদর্শ যদি ব্যবহারে পরিস্ফুট না হয়, তবে তাহার সার্থকতা কোথায় ? তাই বোধ হয়, মহামায়ার ইচ্ছায় এখন দেবালয়ে

বিশেষ বিশেষ রামাৎ সাধুর আগমন। ঠাকুর বলেন—'তখন রেলপথ হয় নাই. মিউনিটিরও (মিউটিনিরও) পূর্বে পশ্চিমের সাধুরা পায়ে হেঁটে বাংলা দেশে আসতেন—অভিপ্রায় কালীপীঠে কালীমাতার পূজায় আর সাগর-সঙ্গম-স্নানে শুদ্ধচিত্ত হয়ে পুরুষোত্তম দর্শনে ভেদবুদ্ধির পারে যাওয়া। এখানে তাদের সমাদর হত বলে কিছুদিন থেকে গন্তব্য স্থানে চলে যেতেন।

রামাৎ সাধু

এক সাধু আসেন, যিনি অবিরাম রামনাম জপে নিবিষ্ট থাকিতেন এবং পট্টবসনাবৃত একখানি পুঁথি ভক্তিভরে পূজা করিতেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার সখ্যতা হয়; তাই পুঁথিতে কি লেখা জানিতে চাহিলে, সাধুজী দেখান, তাহাতে কেবল রামনামটি লেখা আছে। জিজ্ঞাসায় বলেন—যখন একমাত্র প্রভু হইতেই তাঁর লীলা-বিকাশ, তখন লীলা পাঠে সময় নষ্ট না করে, নাম-রূপ অভেদ জেনে, নামেরই পূজা ও জপ করে থাকি। ইঁহার ভাবে ঠাকুর বড়োই প্রীত হন এবং মনে মনে প্রার্থনা করেন, যেন ইঁহার ন্যায় তাঁহারও রামভক্তি হয়।

জটাধারী

আর একজন জটাধারী সাধু। ইঁহার নিকট রামলালা (বালকরাম) নামে একটি ধাতুমূর্তি ছিল। ইঁহার সাধন-ভজন কিছুই ছিল না, রামলালাতেই বিভোর। কি করিলে রামলালা খুশি হইবেন, তাহাতেই ব্যগ্র। আমাদের দৃষ্টিতে ধাতুমূর্তি হলেও, জটাধারী ইঁহাকে চৈতন্য-বিগ্রহ দেখিতেন তাঁহার সহিত স্নেহ-সম্ভাষে আনন্দে ভাসিতেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে ও স্কন্ধে লইয়া ফিরিতেন। দিন দিন মিলন ও আলাপনে জটাধারী ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন; আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার প্রতি রামলালারও এতই অনুরাগ হয় যে, তিনি সতত ঠাকুরের প্রতীক্ষা করিতেন। মন্দির হইতে জগদম্বার বালভোগ আসিলে, ঠাকুর তৎসমুদয়ই রামলালার জন্য পাঠাইয়া দিতেন; তিনি উপস্থিত হইলে রামলালা তাঁর চির-সেবক জটাধারীকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে ও স্কন্ধে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন।

রামলালার আচরণ

রমতে রাম—পর্যটনশীল সাধু, পাছে গৃহস্থকে পীড়া দেওয়া হয় ভাবিয়া, বহুদিন একস্থানে অবস্থান করেন না। নিয়মভঙ্গে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে না; এই কারণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাই বোধ হয়, জটাধারীর গমনোদ্যোগ দেখিয়া, রামলালা রোদন করিয়া কহেন— সুরধুনীকূলে এমন স্থান, আর এই দেবম নবকে ছাড়িয়া আমি আর তোমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি না; ইঁহার উপর আমার এতই অনুরাগ হইয়াছে যে, আমি ইঁহার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব না; হয় ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া চল, না হয়, আমাকে ইঁহার কাছে রাখিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর; ইঁহার নিকট আমি বড়োই আনন্দে থাকিব।

জটাধারীর বিলাপ

এত কাল যাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছেন, আজ তাঁহার এই মর্মহীন কথায় জটাধারী ব্যথিত ও বিস্মিত হইলেন এবং মনের ক্ষোভে কহিতে লাগিলেন,—'ভালো জানি—তুই কোনো কালে কাহাকেও সুখী করিস নাই, সকলকেই কাঁদিয়েছিস। মনে নাই, তোর অদর্শনে পিতা প্রাণত্যাগ করিল, মাতা কৌশল্যা চোখের জলে অন্ধ হইলেন, সোণার

অযোধ্যা শ্মশান হল। আবার কৃষ্ণ অবতারেও ওইরূপ। পিতা নন্দ, মা যশোদা, ব্রজরাখাল, ব্রজগোপী সকলেই তোর আচরণে কাঁদিয়া আকুল, সাধের গোকুল অন্ধকারে ডুবিল'—বলিয়া সাশ্রুনয়নে কতই না বলিতে থাকিলেন। তাঁহার তিরস্কারে প্রাণের প্রাণ রামলালাকে রোদন করিতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'তুই যখন এই দেবপুরুষের কাছে আনন্দে থাকবি, তখন তোর সুখের জন্য তোকে ইঁহাকে সমর্পণ করে, তোর নাম নিয়ে আমি কেঁদে বেড়াইব' এই বলিয়া জটাধারী তাঁহার প্রাণস্বরূপ বা প্রাণাধিক রামলালাকেই ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিয়া শূন্য ও ক্ষুণ্নমনে গমন করিলেন। তদবধি রামলালা ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বহুকালাবধি শ্রীমন্দিরে জগদম্বার নিকট বিরাজ করিয়াছিলেন।*

ঠাকুরের দর্শন

মন্দিরে যাইলে ঠাকুর কোনো কোনো দিন রামলালাকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেন এবং নিজ শয্যাতে শয়ন করাইয়া রাখিতেন। তিনি দেখিতেন, রামলালা তাঁহার স্তন্যপান করিতেছে, কখনো বা স্কন্ধে উঠিয়াছে; আবার কখনো বা রোদে দৌড়াদৌড়ি ও জাহ্নবী-জলে খেলা করিতেছে।

আমরা অন্ধ

ঈশ্বরের ঐকান্তিক অনুরাগ বা উগ্র তপস্যার প্রভাবে যে দিব্যদৃষ্টি হয় উহার অভাবে অকৃতাত্মা আমরা চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধ। সুতরাং এই মধুর লীলা প্রত্যক্ষ বা ইহার রসাস্বাদ করিতে পারিতাম না; কেবলমাত্র ঠাকুরকে ব্যগ্র হইয়া কহিতে শুনিতাম,—'ও রে? জলে মাতিসনে, রোদে ছুটিসনে, অসুখ হবে, খেতে পারবিনে' ইত্যাদি কত কথা বলিয়া ও আদর করিয়া নিকটে আনিতেন এবং রামলাল দাদাকে দিয়া জগদম্বার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

বাৎসল্য—ভাবের পরাকাষ্ঠা

পীড়া বা অন্য কারণে সন্তান অনিদ্র হইলে, জননী যেমন নিদ্রাসুখ অনুভব করেন না বা পারেন না, ঠাকুর বলেন, বাৎসল্য-ভাবের পরাকাষ্ঠায় ঠিক তাঁহার এইরূপ হইয়াছিল। রামলাল দাদা কোনো এক রাত্রে রামলালাকে শয়ন করাইতে বিস্মৃত হওয়ায়, বহু চেষ্টায় তাঁহারও সেই রাত্রে নিদ্রার উদ্রেক হয় নাই। জগদম্বার মঙ্গলারাত্রিক করিতে যাইয়া যেই রামলালাকে শয়ন করানো হয়, আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরও তদ্দণ্ডে নিদ্রিত হন।

অসম্ভব ও সম্ভব

পাঠক হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চিতই কহিবেন—ইহা অসম্ভব। আমরা যদি সৌভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের আশ্রয়-লাভ না করিতাম, আমরাও বলিতাম—অসম্ভব। প্রাকৃতিক নিয়মে তরল জলের ঘনীভূত (বরফ) হওয়া যেমন সম্ভব, সচ্চিদানন্দের কৃপাহিমে জমাট বাঁধিয়া নরাকারে আবির্ভাব এবং ভক্তসহ লীলাবিলাস যদি সম্ভব হয়; তখন বালক রাম রামলালার

* রামলালা-বিগ্রহ প্রায় বৎসরাধিক পূর্বে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর অলংকার সহিত তস্করগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে—সংবাদপত্রের পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অপরাধীগণ গ্রেপ্তার হইয়া কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

জটাধারী এবং ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপ ও ক্রীড়া কিরূপে অসম্ভব হইবে? পুরাণ ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রকৃতিভাবে সাধন

বাল্যে বয়স্য সনে ক্রীড়া, কৈশোরে অনুরাগ আবেগে চিন্ময়ীর দর্শন, শাস্ত্রমর্যাদা-রক্ষণে যৌবনে ঈশ্বরের মাতৃভাব অনুভূতি, দাস্য-ভক্তিতে প্রকৃতি-পুরুষ সীতা-রামের সাক্ষাৎকার, রামলালা-বিগ্রহে বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, এখন ব্রজেশ্বরী মধুরভাবের আস্বাদনে ঠাকুরের অভিলাষ হইল।

মধুর ভাব

মধুর ভাবটি কি? কামগন্ধহীন হইয়া আত্মসুখ পরিহার পূর্বক প্রিয়তমকে সুখী করিবার প্রয়াসই প্রেম। সুতরাং অমৃতময় প্রেমের উন্মাদনায় ভগবানকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া আত্মসমর্পণে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়, তাহাই মধুর ভাব। আর ইহার অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগে বাহ্য যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকেই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বা মহাহ্যাভাব কহে।

প্রকৃতিভাবে সাধন

গোপালনন্দনে যাঁদের চিত্ত বিভোর, তাঁরাই গোপী। ইঁহাদের কৃপা না হইলে তাঁদের শিরোমণি রাধারাণীর সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব। আবার কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীমতী, তাঁহার কান্ত-সনে মিলন করিয়া না দিলে, কাম-আকর্ষণী শ্রীকৃষ্ণকে কোনো মতেই পাওয়া যায় না। ইহা ভাবিয়াই ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য গোপী-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং প্রকৃতি-বেশ-ধারণে গোপীদিগের মতো আচরণ করিতে থাকিলেন। রসায়ন-যোগে তাম্র যেমন কাঞ্চন-সম দেখায়, তেমনি তাঁহার বৃত্তি এমন তদাকার হয় যে, তখন তাঁহাকে দেখিয়া রমণী ভিন্ন কেহই পুরুষ বলিতে পারেন নাই।

এমন কি, জানবাজারে রাণীর ভবনে শারদীয়া পূজার সময় নারীবেশে যখন ভগবতীকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পরম ভক্ত মথুরানাথও তাঁহাকে কোনো অপরিচিতা আত্মীয়া জ্ঞান করেন। পরে পত্নী-মুখে ব্যাপার শুনিয়া বিস্ময়ে বলেন, বাবা (ঠাকুর) আমার বহুরূপী ভগবান, যখন যে রূপ ধরেন, তাহা অবিকল ও অপরূপ!'

শ্যাম দর্শন

অনুরাগ-যোগে হৃদয় বৃন্দাবনসম হইলে, গোপিকাবেষ্টিত রাধালতাজড়িত শ্যাম-দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুর অহর্নিশি প্রেমানন্দে বিরাজ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ল্যাংটার আগমন

গুণময় ঠাকুর এত দিন গুণময়ীর রাজ্যে ভগবানের বিবিধ বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সত্য, তথাপি যথায় আমি তুমি, সেব্য সেবক, বা জীবজগৎ ভাবের আভাষ মাত্রও নাই,

এমত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বা অদ্বৈতভাবে অধিরূঢ় হইতে না পারিলে, লোকদৃষ্টিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন না, তাই ব্রহ্মময়ী তাঁহার তুরীয় ভাবসিদ্ধ এক মায়াবাদীকে* উপস্থিত করিলেন। ইনি পশ্চিম দেশবাসী (পাঞ্জাবী), স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়, উলঙ্গপ্রায় সাধু। অঙ্গে ভস্মরাগ, মস্তকে জটাভার, কৌপীনমাত্র আবরণ, পাণিদ্বয়ে ধাতব জলপাত্র ও দীর্ঘ চিমটা থাকিলেও দেখিতে সৌম্য-মূর্তি।

চিন্তা

গুণবান না হইলে কেহ গুণের মর্যাদা করিতে পারে না। তাই, ইনি ঠাকুরের দিব্য লক্ষণ ও জ্যোতিঃপূর্ণ বপু দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবেন, বাল্যে গৃহত্যাগ করতঃ গুরু-সঙ্গে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছি বটে, কিন্তু কোথাও এমন চিত্তাকর্ষক রূপ দেখি নাই। যোগিজনসুলভ সমাধির ভাব যেন ইঁহার স্বভাবজাত। যদি ইঁহাকে সন্ন্যাস-দানে বেদান্ত-বেদ্য মহাবাক্যে দীক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে লুপ্তপ্রায় বেদান্ত-শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ইঁহার সখ্যতায় আমিও আপ্যায়িত হই।

জিজ্ঞাসা

এই অভিপ্রায়ে নিকটে আসিয়া কহেন, 'বাচ্ছা! কুছ্ সাধন করোগে?' ঠাকুর বলেন, 'মাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর আদেশ হইলেই করিব।' ঠাকুরের ধারণা, তিনি জগন্মাতার গর্ভজাত সন্তান, (কেহ তাঁহাকে মাতৃ উৎসন্নে গালি দেওয়ায় ভয় পান, পাছে মহামায়া তাঁর প্রতি রুষ্টা হন) এই কারণে সকল বিষয়ে তাঁহার অভিমত অনুসারে চলিতেন—ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ভৈরবীর ভয়

পুরুষ বা নারী হউন না কেন, মানবের স্বভাব—একবার যার উপর আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে, যদি সে কোনো কারণে হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে মর্মবেদনা অনিবার্য। এই হেতু ভৈরবী দেবী বিদুষী হইয়াও কহেন—'দেখিবামাত্রই বুঝিয়াছি, এই উলঙ্গ সাধু বেদান্তবাদী —শুষ্কমার্গী। উহার অনুসরণে তোমার ভক্তিভাবের উচ্ছেদ হইবে। এই আশঙ্কায় তোমার বেদান্ত-সাধন অনুমোদন করি না।'

ভ্রম

কিন্তু স্বার্থ বা স্নেহান্ধা ভৈরবী বুঝিতে পারেন নাই যে, লোককল্যাণ জন্য যাঁর আবির্ভাব এবং যাঁদের মঙ্গলকামনায় কর্মযোগ ও ভক্তিমার্গকে সাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, অথবা যিনি নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত, তিনি সর্বধর্মসার বেদান্ত-সাধন উপেক্ষা করিয়া জীব-শিবের একত্বপ্রতিপাদক, সুতরাং নির্বাণপ্রদ জ্ঞান-মার্গকে কি অবহেলা করিবেন? এই নিমিত্ত বোধ হয় ঠাকুর ভৈরবীকে কহেন, 'জগদম্বাকে জানাই, তিনি যেমন বলিবেন করিব।'

* ইঁহার নাম তোতাপুরী—ইনি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের পুরীনামার অন্তর্গত। আজীবন কঠোর সাধনা দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া অদ্বৈত-বেদান্ত মতে ইনি সিদ্ধ হন। পাঞ্জাব প্রদেশে লুধিয়ানা জেলায় ইঁহার গুরু ও গুরুভ্রাতার মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাতৃভক্তি

ঠাকুর স্বীয় গর্ভধারিণীকে জগন্মাতার মূর্ত বিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিপূজা করিতেন। সাধুর সঙ্গে যাইলে পাছে তাঁহার অশ্রুপাত হয়, এবং বৃদ্ধবাস্থায় সেবাশুশ্রূষারও ত্রুটি হয়, ইহা ভাবিয়া, কিংবা আমাদিগকে মাতৃভক্তি শিখাইবার বাসনায় ন্যাংটাকে বলেন, 'মাতার আদেশ পেয়েছি, কিন্তু তোমার মতো মর্মহীন হয়ে জননীকে ছেড়ে অন্যত্র যাইয়া সাধন করিতে বাঞ্ছা হয় না ; ইচ্ছা হয়, এইস্থানে করাও, প্রস্তুত আছি।' নির্মম হইলেও কি জানি কেন ঠাকুরের দর্শনাবধি সাধুজী মোহিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং মুগ্ধ মনের আর বিচার কোথায় ? তাই বলেন, বাচ্ছা ! তাহাই হইবে ; তোর পক্ষে সকল স্থানই অনুকূল।

মানবের অপরাধ

সচ্চিদানন্দ নিজ মহিমায় প্রকাশমান ; জন্মগত সংস্কারবশে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও মলিন ; সুতরাং তাঁহাকে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। আবার ব্যক্তিমাত্রকেই আত্মবৎ না ভাবিয়া পরবোধে তাদের অন্নে উদর পূরণ করায় মন্ত্রোচ্চারণ-কারক জিহ্বাকে দগ্ধ করিয়াছি। সেই মতো শরীর রক্ষা মতো যৎসামান্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট না হইয়া বিলাস-বাসনায় অধিক দ্রব্য গ্রহণে কার্যকরী হস্ত দগ্ধ হইয়াছে। অবশেষে শিবজ্ঞানে জীবসেবা উপেক্ষা করিয়া, তদ্বিপরীত তাহাদের প্রাক্তন বা ভগবৎকৃপালব্ধ সৌভাগ্যতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বরং আমারও কেন ঐরূপ হইল না, এই ঈর্ষায় ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ মনও বিদগ্ধ হওয়ায় অপরাধী হইয়াছি। সুতরাং দগ্ধ জিহ্বা, হস্ত ও মন দ্বারা ভগবৎ-আরাধনায় মন্ত্রোচ্চারণ, পূজার্চন এবং ধ্যান-জপাদি যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমুদয়ই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ড হইয়াছে। এই বিষম অপরাধ-ভঞ্জনে উৎকট প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। এই হেতু সকল অনর্থের মূল যে অহমিকা, তাহাকে পরিতাপ-রূপ তুষানলে দগ্ধ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও বেদান্ত-সাধন

সম্যক্‌রূপে এষণা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। বৈদিক যুগে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল না, বা সন্ন্যাস গ্রহণে এখনকার মতো অনুষ্ঠানও ছিল না। আজীবন ঈশ-আরাধনায় মোহ অপগত হইলে নির্বেদচিত্তে বানপ্রস্থ আশ্রয়ে, যখন অন্তর্বাহি পরমাত্মার অনুভূতি হইত,—তখন কোনো মুনি বা ঋষি একরস হইয়া এমন সমাহিত হইতেন যে, সেই অবস্থায় দেহপাত হইত। কোনো ঋষির বা সর্বভূতে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ-দর্শনে উৎফুল্লচিত্তে বিচরণকালে যথা তথা শরীরপাত হইলেই কৈবল্য হইত। ঠিক যেন পিঞ্জরের পাখির পিঞ্জর-ত্যাগে পলায়ন। মহাভারতে দেখা যায়, ধর্মমূর্তি বিদুরের এইরূপ সন্ন্যাস হইয়াছিল। আবার পাণ্ডবগণও কালপূর্ণ জানিয়া দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। এখনও যে বৈদিক সন্ন্যাস বিদ্যমান নাই—কে বলিতে পারে ?

যজ্ঞকর্মে পশুঘাত দর্শনে বুদ্ধদেবের হৃদয় বিগলিত হয়, বোধ হয় এই কারণে তিনি বৈদিক মতের বিদ্রোহ করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত ধর্মপ্রচারে যে ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহার পদ্ধতি সম্যক জানা যায় না। লুপ্তপ্রায় সনাতন-ধর্মের পুনঃ

প্রতিষ্ঠায় আচার্যপাদ শঙ্কর যে সন্ন্যাস প্রবর্তন করেন, অনেকটা নিশ্চত যে, উহা পশুপতি মত (তন্ত্রবিধি) অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস আবার দ্বিবিধ। ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিবিদিষা (জানিবার ইচ্ছা) বা ক্রমসন্ন্যাস ; আর ব্রহ্মবিৎ হইয়া যাহা অবলম্বন, তাঁহাকে বিদ্বৎ বা পূর্ণ সন্ন্যাস কহে। ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণে পিতৃ, দেব ও ঋষিগণের পূজান্তে অগ্নিস্থাপন করিয়া, আত্মশুদ্ধার্থ আহুতি প্রদানে আপনাকে জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবনা করিতে হয়। পরে পরব্রহ্ম স্মরণে গলদেশ হইতে উপবীত অবতরণ করিয়া অগ্নিতে হোম করিতে হয়। তৎপর যে শিখা-আশ্রয়ে পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ এবং আশ্রমত্রয়ের কর্মসমুদয় অবস্থান করেন, সেই ব্রহ্মপুত্রী শিখা ছেদন পূর্বক অগ্নিতে সমর্পণ করিতে হয়। দ্বিজাতিগণের যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগেই সন্ন্যাস গ্রহণ হয়। কিন্তু যাঁহারা দ্বিজাতি নহেন, তাঁহাদের কেবল শিখা হোম করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট মহাবাক্য লাভে নিরহঙ্কার হইয়া ব্রহ্মভাবে অবধূনকল্পে বিচরণ করিতে হয়। ইহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস।

বিদ্বৎ বা পূর্ণসন্ন্যাস ঃ—জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে শিখাচ্ছেদ করিলে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ হয়। আবার যাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত, তাঁহাদের যজ্ঞ পূজার প্রয়োজন নাই ; এবং স্বেচ্ছাচারী অর্থাৎ অন্তরে সন্ন্যস্ত হইলে, কোনো প্রত্যবায় হয় না। ইঁহাদের সন্ন্যাসই বিদ্বৎ সন্ন্যাস ; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া পরে সন্ন্যাস। ইঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং নারায়ণস্বরূপ—শাস্ত্র ইহাই প্রচার করেন। যিনি স্বয়ং নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাসের অবতারণা কেবল শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষণ।

সাধন-স্থান

পঞ্চবটীতলে স্বহস্তে, যে সাধনকুটির নির্মাণ করেন, উহাই তাঁহার বেদান্তসাধনের স্থান হইল। তথায় গুরু শিষ্য সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে (রাত্র-দিবার সন্ধি সময় যখন প্রকৃতির পরিবর্তন জন্য ভাবুক-অন্তরে স্বতঃই দিব্যভাবের উন্মেষ হয়) অনুমান হয়, ন্যাংটা (তোতাপুরী) লোকশিক্ষাকল্পে তাঁহাকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রবুদ্ধ করিতে যে কতিপয় উপদেশ করেন, তাহা এই—

ন্যাংটার উপদেশ

বাচ্ছা! দেহধারণ মাত্রেই ব্রহ্মা হতে কীট পর্যন্ত সকলেরই নিকট ঋণী, এ জন্য তাঁদের প্রসন্ন করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের শুভ কামনা দ্বারা অগ্রণী হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে ; যেহেতু ইঁহারা সকলেই ঈশ্বরাংশ এবং ইঁহাদের প্রসন্নতা বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

গুরু-দক্ষিণা

ব্রহ্মজ্ঞান হইলে গুরুশিষ্যে প্রভেদ থাকে না ; আবার অদক্ষিণ অনুষ্ঠানও সিদ্ধ হয় না অতএব অগ্রেই আমাকে দক্ষিণা দানে তুষ্ট কর। তনু, মন ও ধন দানই গুরু-দক্ষিণার প্রকৃষ্ট বিধি। তুমি যখন আমারই মতো নগ্নপ্রায়, তখন ধনদান অসম্ভব। কিন্তু তনু ও মন যাহা তোমার আয়ত্তে, তাহাই দিয়া আমাকে তৃপ্ত কর ; অর্থাৎ আমি যেমন উপদেশ করিব, সেই মতো করিবে ; অন্যথা দক্ষিণা অসিদ্ধ হইবে।

অহংনাশ

অহংবুদ্ধি মায়ারই রূপান্তর ; ইহার প্রভুতায় মানব কতই না নির্যাতন ভোগ করে। লোহখড়্গ পরশমণি-পরশে কাঞ্চন হইলে, তাহা দ্বারা হিংসা কার্য (ছেদন) যেমন সম্ভব হয় না ; সেই মতো আপনাকে ক্ষুদ্রেরও ক্ষুদ্র বলিয়া ধারণা হইলে অহমিকার সন্তাপ ভোগ করিতে হয় না ; এবং অতি ক্ষুদ্রতার জন্য মায়াও তাহাকে বন্ধ করিতে পারে না।

আকিঞ্চনতা

বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল বা ঐশ্বর্যবল কিছুতেই বিভুকে পাওয়া যায় না। আমি অজ্ঞ ও অপদার্থ, আমাদ্বারা তাঁহার পূজা বা তাঁহার জীবের সেবা অসম্ভব—মনেপ্রাণে এই ধারণাটিই আকিঞ্চনতা। ইহাই ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বালকের মতো সরল প্রার্থনায় ইহার উদয় হয় এবং প্রকৃত আকিঞ্চন হইলে অভীষ্টলাভে বিলম্ব থাকে না। বোধ হয় এই কারণে ন্যাংটাজী প্রার্থনা করান—জগৎকারণ হে পরাৎপর পরব্রহ্ম ! বিশ্বমধ্যে অতি ক্ষুদ্র আমি, কোন্ সাহসে বলিতে পারি যে, তোমাকে লাভ করিব ? নিজ মহিমায় তুমি আমাকে গ্রহণ কর এবং আমার জীবন মধুময় কর।

ধ্যান-বিধি

এখন জীব-শিব-বাচক মহাকাব্য প্রদান করিয়া ন্যাংটা, ঠাকুরকে কহেন—এইরূপ ধ্যান কর—নাম, রূপ, ভাবসমষ্টি এই জগৎ, এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়সমুদয়ই মনেতে লয় কর, মন বুদ্ধিতে লয় কর ; সর্বাধিষ্ঠাত্রী বুদ্ধিকে আত্মাতে লয় কর ; আবার এই আত্মাকে বিরাট আত্মাতে লীন করিয়া চিন্তা কর, যেন তুমিই সেই সৃষ্টির অতিরিক্ত অথচ সর্বব্যাপী পরমাত্মা।

সমাধি

ঠাকুর বলেন—'ন্যাংটার উপদেশে দৃশ্যমান যা কিছু সবই বুদ্ধিতে লয় করে দেখি—যার কৃপায় তাঁর চিন্ময়ী রূপ ও অপরূপ দর্শন, সেই মেঘবরণা শ্যামাই বুদ্ধিতে বিরাজ করছেন ; তাঁকে তো উপেক্ষা করতে পারছি না। ন্যাংটা তাঁর সর্বস্ব আমাকে দিতে ব্যগ্র, আমি কিন্তু মহামায়ার মুখকমল দর্শনে প্রফুল্ল (ফিক্ ফিক্ করে হাসছি) দেখে, ওরে ! পশ্চিমে কাঠখোট্টা কিনা, ক্রোধে অধীর হয়ে, 'কেঁউ হোগা নহি' বলে এক টুকরা কাঁচ দিয়ে (কুটিরে পড়ে ছিল) যেমন আমার কপালে মারল, অমনই মন নিশ্চল হল। তখন বুদ্ধিস্থিত মহামায়ার প্রেরণায় তাঁর হাতের জ্ঞানখড়্গ নিয়ে, তাঁর অবিদ্যা মূর্তিকে যেই দুখণ্ড করলাম, অমনই চিত্ত নিরালম্ব হয়ে তাঁর তুরীয় পরব্রহ্ম সত্তায় লীন হয়ে গেল।

অদ্বৈতভাব

'বাক্য মনের অগোচর, কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য, সে ভাব যে কি বলতে পারা যায় না, ঠিক যেন বোবার স্বপ্ন দেখা। তবে তোদের এইমাত্র বলতে পারি—পিঞ্জরমুক্ত পাখির যেমন আনন্দ হয় বা হাতের মাছকে জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন স্বস্তি হয়, আমার মনের অবস্থা ঠিক সেইমতো হয়েছিল। সেথায় তুমি আমি নাই, কঃ কং পশ্যতি, কঃ কং বদতি (কে কাকে দেখে বা বলে) একাকার ! অব্যক্ত ! আনন্দ, আনন্দ !!' বলিতে বলিতে সেই অবস্থা স্মরণে ঠাকুর সমাধিস্থ।

ধ্যান ও সমাধি-বিচার

পরব্রহ্মবাচক প্রণব জপ ও তাহার অর্থ-চিন্তায়, বিষান্তর পরিহারে তদ্গতচিত্তে অবস্থানের

নাম ধ্যান। ঈদৃশ ধ্যানযোগে ধ্যেয় বিষয়ে মনের সম্যক অধিগমনই সমাধি। এই সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প—সবীজ বা সালম্ব; এবং নির্বিকল্প বা নির্বীজ বা নিরালম্ব; নাম-রূপ ভাব আশ্রয়ে যে সমাধি হয়, তাহা সবিকল্প বা সালম্ব; আর নামরূপ ভাব পরিহারে সর্বপ্রকাশক পরমাত্মায় মনের যে লয় হয়, তাহাকে নির্বিকল্প বা নিরালম্ব সমাধি কহে।

ন্যাংটার আনন্দ ও ঠাকুরের প্রশংসা

ঠাকুর বলেন—এই সমাধি হতে ব্যুত্থানের পর ন্যাংটা উৎফুল্ল হয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং কহেন—তুমি আমার শিষ্য নও; আমার সখা, তুমি দৈবী মায়া !! যে নির্বিকল্প অবস্থার জন্য আমি তেতাল্লিশ বৎসর নর্মদাতীরে প্রাণপাত করেছি, তুমি কি না ক্ষণমাত্রে উহাতে সিদ্ধ হইলে ! তুমি মানব নহ, (মায়াবাদী কি না, তাই ভগবান না বলিয়া) তুমি দৈবী মায়া ! তোমায় উপদেশ দিয়ে আমি ধন্য আবার লুপ্তপ্রভ বেদান্তশাস্ত্রও সমুজ্জ্বল হল। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যখন বুঝলাম—প্রাণস্পন্দন বা প্রাণের কার্য কিছুই নাই, তথাপি পাছে কেহ তোমার আনন্দের ব্যাঘাত করে, তাই কুটির বন্ধ করে তিন দিন প্রহরীর কার্য করেছি।

কোটি কোটি মানবমধ্যে কদাচিৎ কাহারও এই সমাধি হয়; ভাগ্যক্রমে ঘটিলে মাত্র একুশ দিন তাহার শরীর থাকে, পরে শুষ্ক পত্রের মতো পড়িয়া যায়। যখন বুঝলাম দৈবী-মায়া ! তোমা দ্বারা বহু লোকের কল্যাণ হবে, তখন লোক দিয়া রুল পিটাইয়া তোমার সুখের সমাধি ভাঙিয়াছি, তাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এখন বিদায় দাও, যথেচ্ছ গমন করি।

ঠাকুর কহেন—তুমি যাও বা থাক বলতে পারি না; তবে যত দিন আমার সব ঠিক ঠিক না হবে অর্থাৎ নির্বিকল্পভাবে অধিষ্ঠান ইচ্ছামতো ও সুখসাধ্য না হবে, জগদম্বাই তোমাকে রাখিয়া দিবেন।

বিচার

শাস্ত্র বলেন, পিতা মাতা ও পত্নী বিদ্যমানে সন্ন্যাসে প্রত্যবায় হয়, লোককল্যাণ জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার পক্ষে বিধি-নিষেধ কল্পনায়ও অসম্ভব। তথাপি গর্ভধারিণী জানিতে পারিয়া পাছে অশ্রুপাত করেন, তাই ঠাকুর সঙ্গোপনে সন্ন্যাস লন। যেহেতু সন্ন্যস্ত না হইলে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মহাকাব্যে হয়তো দৃঢ়তা আইসে না বা উহার সাধনও সুগম হয় না। সহজে যাঁর অঙ্গে বসন থাকিত না, তিনি যে যতিবেশ ধরিবেন, ইহাও অনুমান হয় না। জাত্যাভিমান পরিহারে দ্বিজাতিলিঙ্গ যজ্ঞ-সূত্র—যাহা ইতঃপূর্বেই অদর্শন হয়, এবং যাহার জন্য লোকে জল্পনাও করে; তিনি যে আবার উপবীত ধারণ করিয়া শিখাসহ অগ্নিতে অর্পণ করিবেন, ইহা প্রশ্নের বহির্গত। আর সন্ন্যাসদাতা ন্যাংটা, যাঁর মাথায় জটা ও আবরণ কৌপীন, তিনি যে ঠাকুরের মাথা মুড়াইয়া গৈরিক-বাস পরাবেন, ইহা মনেও আনা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু ছিল এবং তিনি শুভ্র-বাস পরিতেন। পুনরপি আপনার জানিয়া তিনি তাঁর সাধন ও দর্শন বিষয়ে আমাদের কত কথাই না কহিতেন, বলিতেন, তোদের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখব না; তখন সাধারণের ন্যায় সন্ন্যাস হইলে নিশ্চয়ই বলিতেন। এক্ষেত্রে ব্রহ্মবিৎ ন্যাংটা সন্ন্যাসদাতা, আর সাক্ষাৎ হরিহরমূর্তি ঠাকুর গ্রহীতা, তখন বাহ্য অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও সঙ্গত হয় না।

তবে গদাধরের রামকৃষ্ণ নাম একটা রহস্য। যাঁর নাম তোতা, সেই নামবিরোধী

মায়াবাদী, যিনি ঠাকুরকে দৈবী মায়া বলিতেন, তিনি যে আনন্দযুক্ত কোনো নাম রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। তবে হয়তো শ্রুতিমধুর বা রুচিকর নয় বলিয়া এবং অগ্রজদিগের নামের প্রথমে রাম শব্দটি থাকায় বোধ হয় পরম ভক্ত মথুরনাথ 'রামকৃষ্ণ' নাম রাখেন। দর্শনেই কৃতার্থ, আমাদের পক্ষে নাম-তথ্য উত্থাপনে কৌতূহল হয় নাই।

সমাধি-বিচার

বুদ্ধিমান আমরা, কিছুতেই পরাভব মানি না। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবশতঃ নামরূপ ভাবাশ্রয়ে মনকে ধ্যেয় বিষয়ে লয় করিতে পারিয়াছেন; কিংবা যাঁহারা প্রাণপাত করিয়াও পূর্ণকাম হইতে পারেন নাই তাঁহারাই বলিতে পারেন,—সবিকল্প সমাধি কত দুরূহ; তখন নির্বিকল্প সমাধিতে অব্যক্তে লীন হওয়া সাধারণের কল্পনারও অতীত। তথাপি যদি কেহ বলেন, গভীর নিদ্রায় কি না সুষুপ্তিতে মন তো অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয় সত্য, কিন্তু সে লয় জ্ঞানে না অজ্ঞানে? যদি জ্ঞানে (স্ব-স্বরূপে) লীন হইত, তাহা হইলে জাগ্রত হইয়া মন কি পুনরায় বিষয়-ভোগেতে মোহিত হইত? শাস্ত্র বলেন, নির্বিকল্প অবস্থার পর দৃশ্যমান জগৎ দগ্ধবস্ত্রের মতো দেখায় বলিয়া তাহাতে আসক্তি আসে না।

আমার নির্বিকল্প অবস্থা হয় নাই, সুতরাং উহা বর্ণনে অক্ষম। প্রভুর কৃপায় নরেন্দ্রনাথের (পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের) ভাগ্যে উহা ঘটিয়াছিল, তাই তিনি যাহা গাহিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে
উঠে-ভাসে ডুবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল
অবাঙ্‌মনসগোচর বুঝ প্রাণ বুঝে যার।'

তুলনা

সঙ্কট-মোচন শঙ্করের ন্যায় ঠাকুরও অনাদি গৃহস্থ। শিবের দুর্গার ন্যায় রামকৃষ্ণ-সন্তান-জননী ভগবতী সারদেশ্বরী ঠাকুরের পূজনীয়া ছিলেন। সৃষ্টিরক্ষা জন্য দেবদেবের যেমন বনিতা গ্রহণ, লোকশিক্ষা ও আশ্রম-মর্যাদা রক্ষণে ঠাকুরের দারপরিগ্রহ। অমঙ্গল ভূত-প্রেত যেমন ভূতনাথের অনুচর, সমাজের অনাদৃত কতিপয় সরলপ্রাণ ঠাকুরের সহচর। মহেশ্বর যেমন আপন অংশ জীবকে সংহরণে (স্বীয় সকাশে সংগ্রহণে) ব্যস্ত, ঠাকুরও তাঁহার আশ্রিতের কল্যাণ-কামনায় ব্যগ্র। এই হেতু কহিতেন—আমাকে তিরস্কার বা প্রহার কর ক্ষতি নাই, তবু এখানকে (তাঁহার নিকট) আসিবে। আবার মহাদেব যেমন নিত্য সন্ন্যাসী, সম্পদত্যাগে শ্মশানবাসী, ঠাকুরও নিত্য সন্ন্যাসী, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ ও দেবালয়ে অবস্থান। জগন্মাতা ভবানীকে অঙ্কে ধরিয়াও যোগীশ্বর যেমন নির্বিকার, ঠাকুরের চিত্ত এতই দেহ-ভাবশূন্য যে, ভাবাবেশে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া অঙ্গ দহনকালেও সমাধিবিচ্যুত হন নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ন্যাংটার আচরণ

এখন গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ন্যাংটা পঞ্চবটীতলে ধুনি জ্বালিয়া বিরাজ করিতেন ; ভস্মমাখা জটাধারী সাধু রোগমুক্তি বা সৌভাগ্য কামনায় পাছে লোকে বিরক্ত করে, তাই দিনমানের অনেক সময় শয়ন করিয়া ধ্যান করিতেন ; কখনও বা লোটা চিম্‌টা মার্জন করিতেন ; কিন্তু ঠাকুর আসিলে তাঁহার সহিত বেদান্ত বিচার করিতেন। 'তুমি এখনও যে ধ্যান কর ?' প্রশ্ন করিলে লোটাটি দেখাইয়া ঠাকুরকে বলেন, 'যদি মার্জনা না করি, বায়ুচালিত ধুলিতে অপরিষ্কার হবে। সেইরূপ ধ্যান দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ না রাখিলে জগৎ ব্যাপারে মলিন হওয়া সম্ভব। সুতরাং ধ্যান ধারণার সতত প্রয়োজন।'

সন্ধ্যাসমাগমে বিশ্বরূপের আরাত্রিক উদ্দেশ্যে যখন গৃহে গৃহে দীপদান ও শঙ্খধ্বনি হইত ঠাকুর স্বভাবজাত ভঙ্গিতে করতালি দিয়া হরিনাম করিলে মায়াবাদী ন্যাংটা উপহাস করিয়া কহিতেন—বাচ্ছা! কাহে রোটি ঠোক্‌তা হ্যায়? (পশ্চিমের লোকেরা হাতে চাপড়াইয়া রুটি গড়ে) আবার আমাদের শিক্ষার জন্য বালকের মতো যখন জগদম্বাকে মা, মা, মা আনন্দময়ী, মা ব্রহ্মময়ী, নাহং নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু তুঁহু বলিয়া বারংবার প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেন, ন্যাংটা যেন আক্ষেপ করিয়া কহিতেন, শিরকা টোপি হোকে কাহে পায়ের কি জোড়া (জুতা) হোতা হ্যায়? কিন্তু তাঁর ধৈর্য-পরীক্ষায় ঠাকুর 'দুঃ শালা' বলিলে ন্যাংটা মৃদু মৃদু হাসিতেন।

পরিচয়

এই ঘনিষ্ঠতার জন্য ঠাকুর জানিতে পারেন যে, ন্যাংটাজীর নাম তোতাপুরী (শংকর-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এক শাখার নাম পুরী) এবং পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা নামক স্থানের কোনো এক মঠের মোহান্ত। তীর্থদর্শন ও নানাস্থানে অবস্থিত শিষ্য ও সাধু-সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে যথেচ্ছ বিচরণ এবং উপযুক্ত অধিকারী পাইলে তাহাকে সন্ন্যাসমার্গে দীক্ষা দান করিতেন।

পুরীজী মোহিত

ঠাকুরের দর্শনাবধি পুরীজী আকৃষ্ট। ভুবনমোহিনী মহামায়া, যিনি বিশ্বভুবনকে ভুলাইয়াছেন, যত বড়ো সাধু মহাত্মা হউন না কেন, তাঁকে যে মোহিত করিবেন না, কে বলিতে পারে? কিংবা ব্রহ্মময়ী, যিনি ঠাকুরকে কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপে অধিষ্ঠান করাইবার বাসনায় পুরীজীকে আনিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় ন্যাংটাজীর স্থানান্তরগমন-সংকল্প বৎসর কালের জন্য তিরোহিত হয়।

প্রাণত্যাগ

স্বাস্থ্যকর পঞ্চনদ দেশজাত শরীর, তাহে বহতা নদীর মতো রমতে রাম সাধু, বাঙলার লবণাম্বু জলবায়ুতে অবস্থান করায় স্বাস্থ্যভঙ্গে পুরীজী (যোগিজনসুলভ) গ্রহণিরোগে আক্রান্ত হন। আজীবন সুস্থ দেহে রোগযন্ত্রণা ক্লেশকর হইলে ভাবেন, একবার যখন নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করিয়াছি, তখন স্থূল শরীরটা নিপাতিত হইলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, বরং অনায়াসে ব্রহ্ম নির্বাণ হইবে। সুতরাং ইহাকে

জাহ্নবীজীবনে বিসর্জন দিতে সিদ্ধান্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝম্প দান করেন। কিন্তু মহামায়ার খেলা কে বুঝিবে ? পূর্ব হইতে পশ্চিম কূল গমন করিয়াও সমগ্র ভাগীরথীতে মগ্ন হইবার মতো গভীর জল না পাইয়া নিরাশচিত্তে নিজাসনে ফিরিয়া আসেন।

জাহ্নবীতে জলাভাব

পরদিন প্রাতে ঠাকুরকে রাত্রের ব্যাপার বর্ণন করেন এবং কহেন—বাচ্ছা ! কি দৈবী মায়া ! সমগ্র জাহ্নবীতে মগ্ন হইবার মতো জল পাইলাম না ; যতই যাই জঙ্ঘা পরিমাণ জল ! দুঃখের কথা আরও বলি, যে-আমি কোনো স্থানে তীর্থই হউক বা শ্মশানই হউক,—এক রাত্রির অধিক থাকি নাই, সেই আমি কি জানি কার মায়াতে অথবা তোরই মায়াতে এখানে বৎসর কাল রহিয়াছি।

ন্যাংটাকে জ্ঞানদান

ঠাকুর তখন মধুর বাক্যে বলেন—ন্যাংটাজী ! তুমি আমার সর্বেশ্বরী মাকে মায়াবলে অগৌরব কর কি না ? তাই তোমারই কল্যাণে মহামায়ার এই বিধান। বুঝ না—আমার সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তি, ফুলের সৌরভের ন্যায়, জলের শৈত্যের ন্যায়, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মসহ অভেদ। অবস্থাভেদে অর্থাৎ নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্ম ; আবার সেই তিনিই সগুণ অর্থাৎ সৃষ্টাদি কালে অনির্বচনীয় শক্তি ; একই পদার্থ চিন্ময়ী ও তুরীয়। যেমন একই সাপ চলছে বা স্থির আছে। যখন স্থির, তখন ব্রহ্ম ; যখন গতিশীল, তখন শক্তি ; সুতরাং ব্রহ্মশক্তি অভেদ। আরও শুন, যদি আমার মা ব্রহ্মময়ী না থাকতেন, তোমার নির্গুণ ব্রহ্মকে চিনত কে ? এখন সেই এক অদ্বিতীয় অভেদ ব্রহ্মশক্তির প্রতীক শ্রীকালীমাতার শরণ লও, তাঁর চরণামৃত পান কর, রোগ তো তুচ্ছ, সকল দুঃখের মূল যে ভ্রম, তাও ঘুচে যাবে ; এবং তাঁর কৃপায় পূর্ণত্ব লাভে কৃতার্থ হবে।

ঠাকুর জগৎগুরু

এত দিন যিনি গুরুভাবে উপদেশ দিয়াছেন, আজ তিনি ভুবনমোহিনীর ভেল্কিতে, তাঁর শিষ্যের নিকট 'ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ' এই পরাজ্ঞান—গুরু-দক্ষিণায় পূর্ণতা পাইলেন ; এবং ঠাকুরের উপদেশমতো আচরণে নিরাময় হইয়া তাঁহাকে বিশ্বগুরু বলিয়া ধারণা করতঃ যথেচ্ছ গমন করিলেন।

ভৈরবীর পরিচয়

তন্ত্রমত আশ্রয়ে ঈশ্বরের মাতৃভাব অভিজ্ঞানে যে ভৈরবী দেবী সহায়তা করেন, তাঁহার নাম, যোগেশ্বরী দেবী, পূর্ববঙ্গনিবাসী কোনো ব্রাহ্মণ-দুহিতা। গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ ঠাকুর ইঁহাকে অদ্বৈত-জ্ঞানে অধিরূঢ়া করেন। জানা যায়, বারাণসী ধামে অবস্থান করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধিতে তিনি নির্বাণ মুক্তি পাইয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

দিব্যদর্শন

ঠাকুর বলেন, ন্যাংটার সঙ্গে বৎসরকাল বেদান্ত-চর্চায় তাঁহার অদ্বৈত ভাব পরিপুষ্ট এবং নির্বিকল্প সমাধিও সুখসাধ্য হয়। তখন ধ্যানকালে দেখিতেন, ষষ্ঠ ভূমি বা আজ্ঞাচক্র ও

সপ্তম ভূমি বা সহস্রারের মধ্যভাগে এমন এক স্বচ্ছ ঝিল্লি আছে যে, উহার ভিতর দিয়া দেখা যায়—পরমশিব পরমাত্মা নিজ মহিমায় বিরাজমান। সে অতীন্দ্রিয় রূপজ্যোতিঃতে মহাভাগ্যবান জীব এতই মুগ্ধ হয় যে, তথা হইতে আর ফিরিতে চায় না, বা পারেও না; ঠিক যেন চুম্বক-অঙ্গে লোহ আকৃষ্ট। বলিতে বলিতে সমাধিস্থ। ব্যুত্থানের পর কহেন—সাধন-সময় আমার যা যা দর্শন হয়, ইচ্ছা—তোদের বলি, কিন্তু পারি কৈ? বলতে গেলে মন সেই অবস্থায় চলে যায়, তখন 'কঃ কং পশ্যতি, কঃ কং বদতি' বলিয়া আক্ষেপ করেন।

রক্ত নিঃসরণ

পুরীজীর গমনের পর সহসা একদিন তাঁহার মুখ ও নাসা হইতে কালিমাবর্ণ রুজ্জুর মতো জমাট রক্ত নিগত হয়; ঠাকুর তাহাতে বিস্মিত হন, ভাবেন বুঝি হলধারীর শাপে বা এমন হল? (হলধারী তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও পণ্ডিত এবং ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু একটিপ নস্য নিয়ে যখন ভাগবত খুলে বসতেন, তখন বলতেন, তোর ভাবটাব সব মিছে; ঠাকুর তাহাতে হাস্য করায় অভিসম্পাত করেন, তুই যখন আমাকে অবজ্ঞা করলি, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে)। এমত সময় এক যোগী পুরুষ, যিনি ইতিপূর্বে দেবালয়ে আসিয়াছেন, দেখিয়া বলেন, এ মসীবৎ রক্ত নির্গমে ভয় নাই; বরং যদি স্বভাবতঃ এরূপ না হইত, তাহা হইলে এ মহাপুরুষের জীবনে আশংকা আসিত; ইহা রোগজ নহে, যোগজ। বহুদিন যাবৎ সমাধিতে অবস্থানে, রক্তপ্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে সঞ্চিত ছিল। ইহার দ্বারা বহুলোকের কল্যাণ হইবে, তাই ভগবান এই বিধান করিয়াছেন।

মহাপুরুষের আগমন

এই সময় একদিন এক অদ্ভুত মহাপুরুষের আগমন হয়; বিরক্ত ভাব, রুক্ষ কেশ ও কৌপীন আবরণ, কমণ্ডলুর পরিবর্তে হাতে একটি কালো ছুতা হাঁড়ি, দেখিয়া ভক্তির পরিবর্তে ভয়েরই উদ্রেক হয়। মন্দির-প্রবেশে বাধা পাইয়া, নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি যখন মহামায়ার স্তব করেন, সকলেরই বোধ হয় যেন মন্দির পর্যন্ত কাঁপিতেছে। স্তোত্র-পরে প্রণাম করিয়া বলেন, দেখছি বেটি! এখানে তোর পূর্ণ প্রকাশ। তৎপর যেখানে কুকুরগুলো কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট খাইতেছিল, তথায় আসিয়া 'কেঁও হামকো খানে দেওগে নহি' বলিয়া, একটা কুকুরের কান ধরিয়া তাহার সঙ্গে আহার করিতে থাকেন। এই ব্যাপারটি বলিবার সময় ঠাকুর কহেন—ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হলে কোনো মহাত্মা বিভু-মহিমায় আত্মহারা হন, কেহ বা বালকের মতো হন, আবার কেহ বা নির্বিকার হয়ে শরীর ধারণ জন্য বাহ্যে পিশাচবৎ আচরণ করেন।

আর এক মহাত্মা সকাল-সন্ধ্যায় জঙ্ঘা তাড়ন করিয়া বলিতেন—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ বেশ! কাহারও সঙ্গে কথা নাই; আপন ভাবেই বিভোর। তৃতীয়টি—অতি সৌম্য মূর্তি, মুখে কথাটি নাই; কেবল ঠাকুরকে বলিতেন-তোম, ভালো আছ, হাম্ ভালো আছি। ইঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী—একজন ঈশ-মহিমায় উন্মত্ত, অপর দুইটি শান্ত ও বালস্বভাব।

ইসলাম ধর্মসাধন

ঠাকুরের মনে হইল—সনাতন ধর্মের নানামতে সাধন তো করিলাম, কিন্তু একেশ্বরবাদ অথচ হিন্দুধর্মের বাহিরে ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান না করিলে, ধর্মরাজ্যের একটা দিক যেন

বর্জন করা হয়, সুতরাং উহার সাধনও কর্তব্য। আপ্ত পুরুষের বাসনা অপূর্ণ থাকে না—তাই ভগবৎবিধানে ইসলামের প্রচ্ছন্ন উপাসক গোবিন্দদাস নামে এক ব্যক্তি আগমন করেন, এবং তাঁহাকে ঐ মতে দীক্ষিত করেন। ঠাকুর বলেন—ঐ সময় তিন দিন তিনি মন্দির-সীমায় যাইতে পারেন নাই, ফটকের নিকট যেখানে এক পীরের কবর আছে, তথায় বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন, পাঁচওক্ত নমাজ পড়িতেন, সানকিতে খাইতেন ও সকল বিষয়ে মুসলমানের মতো আচরণ করিতেন। এইরূপ করায় দীর্ঘ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট সৌম্যমূর্তি মহম্মদের দর্শন হয়। অন্যান্য অবতারের মতো তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লীন না হওয়ায় বলেন—মহম্মদ অবতার নন, পয়গম্বর—ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। মহম্মদের অন্তর্ধান পর আল্লার পুণ্য দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া কখনো দণ্ডায়মান, কখনো নতজানু, আবার কখনো বা আত্ম-সমর্পণচ্ছলে ভূপতিত হইয়া বার বার বন্দনা ও প্রণাম করতঃ অপার আনন্দ ভোগ করেন।

খ্রীষ্টধর্ম

স্নেহাস্পদ সন্তান শরৎচন্দ্র (সারদানন্দ) শশিভূষণ (রামকৃষ্ণানন্দ) কে পূর্বজীবনে তাঁহাদের যীশু খ্রীষ্টের পার্শ্বদ জানিয়া কোনোদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন—ঋষিকৃষ্ট সুন্দর হইলেও তাঁর নাকটি একটু টিপা ছিল। ভূষণ প্রতিবাদ করায়, সখি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি বলিয়া ঠাকুর কহেন—যদু মল্লিকের বাগানে বৈঠকখানায় যীশুর একখানি ছবি দেখতে দেখতে বেশ বোধ হল, যীশু যেন জীবন্ত হয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে বুঝেন—যীশু অবতার। কালক্রমে ভক্ত-সমাগমে উইলিয়ম নামে একজন খ্রীষ্ট সন্ন্যাসী এই আমার যীশু বলিয়া ঠাকুরকে বন্দনা করেন।

বৌদ্ধধর্ম

ঈশ্বর-প্রতীক প্রতিমা হইতে আরম্ভ করিয়া, আর্যধর্মের নানা মতানুসারে সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদন এবং সনাতন ধর্মবহির্ভূত ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম অনুষ্ঠানাদি সমস্তই আমাদিগকে কহিয়াছেন। সাঙ্গ সকল ধর্মকেই উদ্ভাসিত করিতে যাঁহার আশ্চর্যময় জীবন ও অপূর্ব সাধন, সেই লোকহিতকারী প্রভু বৌদ্ধ ও জৈন মত আচরণ বিষয়ে আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই। অনুশীলনে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম আর্যধর্মের শাখাস্বরূপ। কারণ, সনাতন মতের অনুরূপ উপাসনাপদ্ধতি এবং পৌরাণিক বিষয়েও অল্প-বিস্তর ভাব বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে সন্নিবিষ্ট। মহাভারতোক্ত পশুপতি মত বা তন্ত্র শাস্ত্র কালবশে বিকৃত হইয়াও বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং মূল পরিত্যাগে শাখাশ্রয় অযৌক্তিক বোধে, অনুমান হয়, ঠাকুর বৌদ্ধ বা জৈন মত অনুশীলন করেন নাই। অপর দিকে দেখা যায়—বৌদ্ধ ও জৈন মত নাস্তিক্যবাদ, বিশেষতঃ বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী; অপৌরুষেয় বেদেরও বিদ্রোহ করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্রোহাত্মক-যে ধর্ম, তাহার অনুষ্ঠানে ঠাকুর আস্থা করেন নাই।

মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক কপিলদেবও প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে ঈশ্বরেরই নামান্তর প্রকৃতি এবং পুরুষ নিঃশ্বসিত বেদপ্রতি সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বর স্বীকার কর বা নাই কর, সনাতন বেদের মর্যাদা করিলেই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

তীর্থ-যাত্রা

দেশভ্রমণ দ্বারা বহুতর ব্যক্তির সংমিশ্রণে ও তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরীক্ষণে অন্তদৃষ্টির প্রসার হইবে এবং তীর্থ গমন করিয়া নানা ধর্মের সাধুসহ আলোচনে, ভাবের আদান-প্রদানে নিজ ধর্মভাবও পুষ্ট হইবে ; অথবা বহুদিন যাবৎ যাত্রীগণের মালিন্য গ্রহণে তীর্থ সকলের যে মলিন ভাব হইয়াছে, তাহাদেরও সংস্কার-উদ্দেশে জগন্মাতার ইচ্ছা হয় যে, ঠাকুরকে তীর্থদর্শন ও দেশভ্রমণ করাইবেন। এই কারণে বোধ হয় তাঁহারই প্রেরণায় মথুরানাথ তীর্থ যাইতে সংকল্প করেন এবং ঠাকুরকেও অনুরোধ করেন যে, তাঁহাকেও যাইতে হইবে। কারণ, তাঁহাতে ইষ্টরূপ দর্শনাবধি এতই আকৃষ্ট হন যে, অধিক সময় তাঁহা হইতে পৃথক থাকিতেন না ; এমন কি নিশাকালেও তাঁহাকে লইয়া এক শয্যায় শয়ন করিতেন। এখন কে.ন প্রাণে সেই প্রাণারামকে উপেক্ষা করিয়া একাকী তীর্থগমন করিবেন।

ভক্তবাঞ্ছা পূরণ

শ্রীভগবানকে নানা ভাবে দর্শন এবং তাঁহাতে অবিরাম অবস্থানে যিনি আত্মতৃপ্ত, তাঁহার কি আর তীর্থদর্শন বা দেশভ্রমণে অভিলাষ হইতে পারে ? কেবল ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণ জন্য সম্মত হন।

রেলপথ

দূর দেশে ত্বরিত গমন ও বাণিজ্য-প্রসার কারণ এখন যেমন ভারতের সকল স্থানেই রেলপথের বিস্তার হইয়াছে, তখন এরূপ ছিল না। সুতরাং দেশভ্রমণ বা তীর্থগমন যে ক্লেশকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তখন ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ ছিল ; তথা হইতে পাল্কীতে কাশী গমন ব্যবস্থা হয়।

সমবেদনা

রাণীগঞ্জে রেলগাড়ি ছাড়িয়া কিছুদূর গমনের পর তথাকার সাঁওতালদের দারিদ্র্য-নিদর্শন কৌপীন ও রুক্ষকেশ-দর্শনে ব্যথিত হইয়া ঠাকুর মথুরকে কহেন—যদি তুমি এদের ভর-পেট খাবার, একমাথা তেল ও একখানি করে কাপড় দিতে পারো, তবে তোমার সঙ্গে যেতে পারি, না হলে এদের সঙ্গে এইখানেই থেকে যাব ; এদের কষ্ট দেখে আর তীর্থে যাবার ইচ্ছা নাই। ইষ্টদেবকে প্রসন্ন করাই যাঁর ব্রত, সেই মথুরানাথ কলিকাতা হইতে প্রচুর অন্নবস্ত্র ও তৈল আনাইয়া দরিদ্র সাঁওতালদের সেবা করিয়া ঠাকুরকে পরিতুষ্ট করেন।

কাশীদর্শনে বিলাপ

ক্রমে নানা স্থান ও জনপদ এবং তত্রত্য অধিবাসীদের বিভিন্ন আচার ব্যবহার দেখিতে দেখিতে অবশেষে অভিলষিত অতি প্রাচীন ও পবিত্র এবং বিদ্যা ও ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ বিশ্বনাথ-রাজধানী বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ অট্টালিকা এবং গঙ্গাগর্ভ হইতে সমুত্থিত প্রশস্ত সোপানবিশিষ্ট ঘাট অবলোকনে, ঠাকুর মনোদুঃখে জগদম্বাকে বলেন—মা ! কেন তুমি আমাকে এখানে আনিলে ? তোমার অবাধ দর্শনসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেমন আমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখতাম, এখানেও তাই দেখছি, উপরন্তু পাথর-বাঁধা বড় বড় ঘাট ও বাড়ি ; কিন্তু তোমাকে তো দেখছি না ?

দিব্যদর্শন

রাজঘাট হইতে উত্তরবাহিনী জাহ্নবীর প্রতিকূল বাহিয়া নৌকা যখন মণিকর্ণিকা-তীর্থ-সন্নিকট হয়, তখন ঠাকুর ভাবাবেশে সহসা প্রান্তরভাগে দাঁড়াইয়া দেখেন যে, বারাণসী বাস্তবিকই কাঞ্চনময়। আরও দেখেন—বিশ্বগুরু বিশ্বনাথ জীবের দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র দান করিতেছেন এবং মুক্তিদায়িনী মহাকালী চিতার উপর জীবকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার তুরীয় ধামে পাঠাইয়া দিতেছেন। ভাবাবসানে মথুরকে বলেন, এবং পরে আমাদিগকেও কহিয়াছেন।

শাস্ত্রবাক্য সপ্রমাণ

কাশীধামে অবস্থানকালে মথুরবাবু প্রসিদ্ধ সাধু ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই বিষয় বর্ণন করিলে, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া কহেন—শাস্ত্রে কথিত কাশীক্ষেত্র স্বর্ণময়, এবং বিশ্বনাথ মুক্তিদান-অভিলাষে জীবের দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্রদান করেন; কিন্তু ভাগ্যাভাবে তাঁহারা এ পর্যন্ত তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নাই। (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এই অলৌকিক পুরুষের দিব্যদর্শনে শাস্ত্রবাক্য সার্থক হইল। আর কৈবল্য-দায়িনী মহাকালী জীবকে যে নির্বাণমার্গে প্রেরণ করিতেছেন—ইহা শাস্ত্রের পারের কথা। ইনি যখন শাস্ত্রের পারে গিয়াছেন, তখন ইঁহার দর্শন ধ্রুব সত্য; এবং ভাগ্যবশতঃ আমরাও এই আশ্চর্য বিষয় শ্রবণে ধন্য হইলাম।

বিশ্বনাথ দর্শন

বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গমধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ—ভবানীর চিন্ময়রূপ দর্শনে ঠাকুর বাহ্যহারা হন, তাহাতে দর্শকবৃন্দের ধারণা হয়—যেন শ্রীমন্দিরে যুগপৎ শিবের আবির্ভাব; এক শিব পার্থিবলিঙ্গ আশ্রয়ে, দ্বিতীয় শিব নরকলেবরে। তপস্যা-প্রভাবে শিবত্বলাভ করিতে না পারিলে, পরমশিবের সাক্ষাৎকার অসম্ভব, ইহাই শিখাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণশিব—শ্রীবিশ্বনাথ শিব-সন্নিধানে মিলিত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষামোহিত আমাদের চৈতন্য-বাসনায় ঠাকুর কহেন কত কাল ধরিয়া কোটি কোটি ভক্ত ঈশ্বরোদ্দেশে যে ভক্তি অর্পণ করিয়াছে, তাহাই জমাট বাঁধিয়া ভগবান 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' রূপে বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গে বিদ্যমান। জ্ঞান বিনা এ ভাব ধারণা হয় না ভাবিয়াই জ্ঞানদায়িনী ভবানী পরমশিবের অঙ্ক শোভা করেছেন।

অন্নপূর্ণা

আবার অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণেশ্বরী-সমীপে গমন করিলে বোধ হয় যেন মাহেশ্বরীর নরদেব সন্তান মাতার নিকট প্রেমভক্তিরূপ অন্ন প্রার্থনা করেছেন, যদ্বারা ভাবী ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

কেদারনাথ

তৈলঙ্গদেশীয় এক পঙ্গু ভক্ত হিমাচলে কেদারনাথ দর্শন মানসে কোনোমতে কাশী পর্যন্ত আগমন করেন। পথক্লেশে প্রাণসংশয় হইলে আর চলিতে না পারিয়া, কঠিন কেদারের উদ্দেশে খেচরান্ন নিবেদন করিয়া দেখেন যে, প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ সেই অন্নোপরি আশুতোষ আপনাকে প্রকট করিয়াছেন। তখন আনন্দের আবেশে তাঁহার কণ্ঠাগত প্রাণ —দেবদেবের বায়ুমূর্তিতে বিলীন হয়। তদবধি অন্নপ্রসারবৎ এই লিঙ্গের নাম কেদারনাথ

হইয়াছে। একনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি স্মরণে ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হন যে, তাঁহারই মন্দির-নিকটে আবাস গ্রহণ হয়।

দুর্গামাতা

জনপীড়ক দুর্গমাসুরকে নিধন করিয়া ভগবতী দুর্গা যে তটিনীতে অসি প্রক্ষালন করেন, সেই পবিত্র অসি-নদীর নিকট শ্রীদুর্গামাতার মন্দির। করুণাময়ীর পুণ্যদর্শনে ও মহিমা স্মরণে ঠাকুর এতই আনন্দ-বিভোর হন যে, তখন তাঁহার দেহ বা জগৎবোধ কিছুই ছিল না।

মণিকর্ণিকা

প্রাচীন যুগে মুনিগণ-প্রার্থনায় তপঃক্ষেত্র-নির্দ্ধারণে নারায়ণ-চক্র যথায় নিপতিত হয়, তাহা চক্রতীর্থ বলিয়া পূজিত। এই পুণ্যস্থানে ধ্যাননিরত মুনিগণকে কৃতার্থ করিবার মানসে বিমানগামী শংকর-ভবানীর কৃপাদৃষ্টি কালে শংকরীর কর্ণমণি গঙ্গাস্রোতে খসিয়া পড়ায়—উহা মণিকর্ণিকা তীর্থ বলিয়া অর্চিত। তদবধি করুণাময় মহাদেব পার্বতীসহ এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

বারাণসী-মাহাত্ম্য

উত্তরে বরুণা, দক্ষিণে অসি-নদীর মধ্যস্থিত, অর্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী সুরধুনীসেবিতা, পরম পবিত্র-বারাণসী ভুবনে অবিমুক্তক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোনো জীব সুকৃতি বা দুষ্কৃতিবান হউক না কেন, এই মহাক্ষেত্রে পঞ্চত্ব পাইলে বিশ্বনাথ-ভবানী তাহাকে নির্বাণ প্রদান করেন। ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

বেণীমাধব

দুষ্কৃতিগ্রহণে মলিন মণিকর্ণিকার উৎকর্ষসাধনেচ্ছায় ঠাকুর এই পূততীর্থে অবগাহন করেন। ভক্তকে অদেয় কিছুই নাই, ইহাই জানাইবার অভিপ্রায়ে আশুতোষ পরমভক্ত রাজা দিবদাসকে তাঁহার কাশীরাজ্য প্রদান করিলে চক্রধারী নারায়ণ মায়াপ্রভাবে রাজাকে বিমোহিত করিয়া ভক্তি-অর্ঘস্বরূপ এই কাশীরাজ্য বিশ্বনাথকে অর্পণ করেন। কাশী প্রবেশ-কালে তাঁহার দর্শনে সমাগত দেবতা ও ঋষিগণকে বিশ্বনাথ কহেন—ভূমন্ডলে বারাণসী তুল্য ক্ষেত্র নাই মণিকর্ণিকাতুল্য তীর্থ নাই, আর বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ তুল্য দ্বিতীয় লিঙ্গ নাই, যেহেতু ভবানীসহ আমি এই লিঙ্গে পূর্ণ বিরাজ করি; এবং নারায়ণ-তুল্য কেহ আমার প্রিয়তম নাই। অতএব নারায়ণকে উপেক্ষা করিয়া আমার পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইব না—এই শিববাক্য স্মরণ করিয়া ঠাকুর বেণীমাধব দর্শনে গমন করেন।

ঠাকুরের আনন্দ

প্রবাসী ব্যক্তি বহুদিন পরে আপন আলয়ে আসিয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করে, ঠাকুরেরও এই আনন্দ-কাননে তাঁহার চিন্ময়রূপের প্রতিরূপ দেবদেবী দর্শনে তদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

গঙ্গাতটে মার্তন্ডতপ্ত বালুকাশায়ী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিয়া ঠাকুর বড়ই উল্লসিত হন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলেন, তন্ত্রমতে সাধনে শিবত্ব পাইয়া, এই মহাত্মা দ্বিতীয়

বিশ্বনাথরূপে কাশীতে বিরাজ করিতেছেন। এরূপ মহাপুরুষের দর্শন দুর্লভ। আবার এক বীণাবাদকের বীণাঝঙ্কার শ্রবণে নাদব্রহ্ম জ্ঞানে ঠাকুর আত্মস্থ হন।

অসিপারে

শ্বাসপ্রশ্বাসমেত ভাবসমাধি স্বভাবজ হইলেও, শরীর ধারণকল্পে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন ; কাশীধামে আহারে বিরাগ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসায় কহেন—সোনার কাশীতে কি করে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করব ? বালকের মতো কথা শুনিয়া মথুরানাথ মুগ্ধ হন এবং পাল্কীর ব্যবস্থা করেন, যাহাতে ঠাকুর অসিপারে যাইয়া শৌচাদি করিতে পারেন।

প্রয়াগ

ভক্তগণের হরহর ব্যোম্ ব্যোম্ রবে বিভোর হইয়া কাশীধামে অবস্থানের পর, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাববিকাশস্থান শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে ঠাকুরের অভিলাষ হয়। পথিমধ্যে প্রয়াগতীর্থ—যথা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ত্রিবেণীসঙ্গমে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে প্রয়াগকে তীর্থরাজ করিয়াছেন. বিশ্রামকল্পে তথায় অবস্থানে তাহাকেই সংস্কার করিয়া ব্রজধাম উদ্দেশে যাত্রা করেন।

মমতানাশে মথুরা গমন

প্রকৃত আমি যে ঈশ্বরাংশ (আত্মা), ইহা বিস্মৃত হইয়া মন প্রাণযুক্ত ভোগায়তন দেহেতে যে আমি-বোধ, ঠাকুর যাহাকে কাঁচা-আমি বলিতেন, এই আমির তৃপ্তিকর ব্যক্তি বা বস্তুকে আমার বলিয়া যে ধারণা, তাহাই মমতা, ইহাই ঈশ্বরলাভের মহা বৈরী ; সুতরাং ইহাকে নাশ করিতে না পারিলে শ্রেয়লাভ অসম্ভব। ইহাই বুঝাইবার জন্য যিনি প্রেমাস্পদ গোপিকা, সহচর রাখাল এবং ব্রজের মধুর লীলা হয়—কর্তব্যজ্ঞানহীন রাখালের মতো নয়—আত্মনিষ্ঠ যোগীর মতো সমুদয়ই উপেক্ষা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং লোক-পীড়ক কংশ-নিধনে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেন—সেই রাখালরাজ বা যোগিরাজের মথুরা-পুরীতে কালিন্দীর আরাত্রিক দর্শনে ঠাকুরের অন্তরে ভাবান্তর হইল।

বৃন্দাবন

প্রেমময় বা প্রেমঘনমূর্তি মাধব গোপ-গোপী সনে প্রেমভাবে লীলা করেন বলিয়াই ইহার নাম প্রেমের বৃন্দাবন। যাহার অন্তরে প্রেমসঞ্চার হয় নাই, বানরের উৎপাত আধিক্যে সে ইহাকে বাঁদরবন বলে। পূর্বভাবস্মরণে বিভোর হইয়া ঠাকুর নানা কুঞ্জ এবং বৃন্দাবন-চন্দ্রের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ও বাঁকেবিহারী বিগ্রহ অপার আনন্দে দর্শন করেন। তার পর যাঁর আরাধনায় ব্রজবাসীরা তাঁদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণধন পান, বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মাতাপিতা সেই কাত্যায়নী-গোপেশ্বরকে বন্দনা করিয়া, ময়ূর-ময়ূরী, মৃগবুল-সেবিত, এবং বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত, ভাবোদ্দীপক শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড ও গোবর্ধন-গিরির দিকে অগ্রসর হন।

বর্ষাণা—গঙ্গামাতা

বর্ষাণা শ্রীমতীর জন্মস্থান ; এই গ্রামে গঙ্গামাতা নামে এক বর্ষীয়সী প্রেমিকার অবস্থান। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার পরাভক্তি দেখিয়া ঠাকুর এতই প্রীত হন যে, সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই কুটিরে অধিষ্ঠান করেন এবং তাঁহার সহিত রাধাশ্যামের মধুর

লীলা আলোচনায় দিন যাপন করেন। ঠাকুরের দিব্যদেহে রাধাগোবিন্দের যুগল-প্রকাশ দেখিয়া, গঙ্গামাতা আদর করিয়া তাঁহাকে দুলারি (শ্রীরাধা) বলিয়া ডাকিতেন। পূর্বের ভাব স্মরণ হওয়ায় ঠাকুরের গঙ্গামাতার সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠতা হয় যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেশে যাইতেও অস্বীকার করেন। কিন্তু ভাগিনেয় হৃদয় যখন বুঝান যে, যদি তিনি এখানে থাকিয়া যান, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কাঁদিলে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন? তাই কেবল মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় পূর্বেকার লীলাস্থান ও পরমভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কাশীধামে ফিরিয়া আসেন।

মথুর কল্পতরু

ঠাকুরের করুণায় বা তীর্থমাহাত্ম্যে মথুরানাথের হৃদয়ে এমত এক উদার ভাবের উদয় হয়, যাহাতে একাকী ঐশ্বর্য ভোগ যেন এখন তাঁহার পক্ষে দুঃখদায়ক হইল। তাই কহেন, সঙ্গী ও সেবকগণ যে যাহা চাহিবে কল্পতরুর ন্যায় তাহাকে তাহাই দিবেন।

সঞ্চয়ী হইলেও তীর্থসেবায় আনীত উদ্বৃত্ত অর্থ আত্মসাৎ না করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রফুল্ল হন। মথুরের সাধ, যদি তাঁর প্রত্যক্ষ দেবতা কোনো মূল্যবান দ্রব্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি চরিতার্থ হন। কিন্তু যিনি আত্মতৃপ্ত তাঁহার কি আর অসার পদার্থে বাসনা হয়? তবে মথুরের আগ্রহে কহেন—না হয় একটা কমণ্ডলু আনিয়া দিও। মথুর তাহাতে বালকের মতো রোদন করিয়া বলেন—বাবা! আজ কোথায় তোমাকে সর্বস্ব অর্পণে কৃতার্থ হব, না তুমি কি না একটি সামান্য দ্রব্য ইচ্ছা করিলে? এই কমণ্ডলুটি আজও 'বেলুড় মঠে' রক্ষিত আছে। বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া নানা জনপদ দেখিতে দেখিতে অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে আগমন হইল।

গয়াধাম

যে ক্ষেত্রে গদাধর দলিত গয়-শিরে শ্রীপদ রাখিয়া বলেন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমার মস্তকে পিণ্ডদান করিলে সকল জীবের মুক্তিলাভ হইবে; সেই পুণ্যস্থানের নাম গয়াধাম। তীর্থগমন ও প্রত্যাগমন কালে যদিও গয়াধামের পার্শ্ব দিয়াই যাতায়াত হইয়াছিল, তথাপি কি জানি, ঠাকুর কেন এ স্থান দর্শন করেন নাই! কারণ (১) যাঁহার আবির্ভাবে ঊর্ধ্বতন পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং অধস্তন বংশধরেরাও নিত্যধামে গমন করিবে, তখন অনাবশ্যকবোধে গয়াধামে গমন করেন নাই। (২) অথবা সনাতন পুরুষ হইয়াও লোক-শিক্ষাকল্পে সন্ন্যাস লইয়া ব্রহ্মৈকত্ববোধে যিনি কর্মকাণ্ডের অতীত, তিনি কি জন্য কর্মক্ষেত্র গয়াক্ষেত্রে গমন করিবেন? (৩) আমাদের উদ্বোধন-বাসনায় ঠাকুর কৃপা-পুরঃসর কহিয়াছেন—নারায়ণ এবার গয়াক্ষেত্র হইতে নবকলেবরে আবির্ভূত। সুতরাং উদ্ভব-স্থান দর্শনে ভাবাধিক্যে পাছে তাঁহার ভাগবতী তনুর অবসান হয়, তাহা হইলে আর তো লোককল্যাণ হইবে না? (৪) বরং তাঁহার নারায়ণী দেহ বিদ্যমান থাকিলে, ভক্তকুল ভুক্তি-মুক্তি লাভে কৃতার্থ হইবে। এমন কি তদ্গতচিত্তে শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি বা শিরঃ-সংযোগে প্রণাম করিলেও ভক্তগণের পিতৃকুলও পরমধামে গমন করিবে। ইহা ভাবিয়াই বা জীবন্ত গদাধর গয়াধামে গমন করেন নাই।

নবদ্বীপ

পশ্চিমাঞ্চলের কষ্টসাধ্য তীর্থ তো দেখিলাম, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরমতীর্থ নবদ্বীপ,

যথায় শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়ে হরিনাম প্রচারে জীব উদ্ধার করেছেন, তথায় না যাইলে তীর্থদর্শন পূর্ণ হইবে না, ভাবিয়া ঠাকুর নবদ্বীপ যাইতে অভিলাষ করেন। জানিবা মাত্রই মথুরবাবু একাধিক কক্ষে বিভক্ত বাসগৃহ-সদৃশ-পরিসর জলযান··বজরা (অধুনা লুপ্তপ্রায়) আনাইয়া উহাতে ঠাকুরকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করেন। ঠাকুর বলেন, নবদ্বীপ গিয়ে দেখি, কাঠের মুরদ মহাপ্রভু চিরদিনের মতো খাড়া হইয়া আছেন। মাকে মনোবেদনা জানায়ে বজরায় বসে আছি, এমন সময় দেখি, ভক্তবেষ্টিত সোনার বরণ গৌর আকাশপথে কীর্তন করতে করতে আমার দিকে আসছেন। তখন ঐ এল রে ঐ এল রে বলতে না বলতে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন। এতে বুঝলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অবতার। আবার নিজ দেহ দেখাইয়া কহেন—এবার গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত একাধারে বিরাজ করছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিয়োগপর্ব—অক্ষয়

জন্মগত কর্মফলে সমজাতীয় আশয়সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের মিলনক্ষেত্র সংসার। ইহাই শ্রীভগবানের আশ্চর্য বিধান। আবার কালসমাগমে, স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় ক্রমবিচ্ছেদই মর্মভেদী বিয়োগ। সুতরাং লীলা-কল্পনায় দেহধারণ করিলেও, ঠাকুরকে যে বিয়োগ-বেদনা ভোগ করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু হয় ; আসন্ন কালে তাহার শিয়রে বসিয়া দেখেন—মানুষ কিভাবে মরে ও কিরূপে তার জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া যায়। ঠাকুর বলেন—তখন বেশ দেখলাম, দেখে আনন্দও হল। কিন্তু দিন কতক পরে অক্ষয়ের জন্য কে যেন হঠাৎ তাঁর অন্তরে ঠিক যেন গামছা মোড়া দিচ্ছে, অর্থাৎ মায়িক সম্বন্ধে আচম্বিতে শোকের উদয় হচ্ছে। ভাবলাম, জগদম্বার কৃপায় আমিত্বনাশ হলেও আমার যখন এরূপ হচ্ছে, তখন সাধারণ লোকের না জানি কত বেশি শোক হয়? মহামায়া দেখালেন, তাঁর প্রদত্ত স্নেহবৃত্তি কখনো নাশ হয় না ; তবে তাঁর আরাধনা জন্য সংযত রাখতে হবে। যার অন্তরে স্নেহভার নাই, সে তো পশু অপেক্ষা অধম।

মথুরানাথ

ইহার পর পরমভক্ত মথুরানাথ, যিনি প্রত্যক্ষ ভগবান-জ্ঞানে ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন, কালপূর্ণ হওয়ায় তিনিও প্রয়াণ করেন। তাঁহার দেহপাতে ঠাকুর কিরূপ সন্তাপ পান, তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। তবে তাঁর কোন্ গতি হইয়াছে জানিতে চাহিলে বলেন—মথুর মুক্তি ইচ্ছা করে নাই ; বলতো বাবা! তোমার কৃপায় মুক্তি যখন করতলগত, তখন কেন লালায়িত হব? তবে আশীর্বাদ কর—যেন প্রাণভরে ভগবানকে ও ভক্তের সেবা করতে পারি। মহামায়া তাকে তাই দিয়েছেন, হয়তো কোনোখানে রাজচক্রবর্তী হয়ে বাঞ্ছামতো আচরণ করছে।

মধ্যম ভ্রাতা

মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া ঠাকুরের আশঙ্কা হয়, বৃদ্ধা মাতা এই নিদারুণ সংবাদে না জানি কতই না অস্থির হইবেন? তাই জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করেন, যাহাতে

দুঃসহ পুত্রশোকে মাতা ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন। ঠাকুর বলেন, মহামায়ার কৃপায় মার মন এমন এক গ্রামে (অবস্থায়) উঠিয়া যায় যে, মধ্যম দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনালে মা বলেন, ওসব কথা আর মুখে এনো না ; কেবল রাম রাম বল।

মাতা

শেষ দশায় কনিষ্ঠ সন্তানের সেবা গ্রহণ ও জাহ্নবীস্নানে তৃপ্তা হইবেন ভাবিয়া ঠাকুরের গর্ভধারিণী দেবালয়ে আগমন করেন, এবং ঠাকুরের বাসগৃহের উত্তরে নহবৎখানায় বিরাজ করেন। কলের 'ভোঁ' শুনিয়া বলিতেন, এইবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা হল, আমিও দুটো খেয়ে নিই! রবিবারে কল বন্ধ থাকায় 'ভোঁ' না বাজিলে, সেদিন তাঁহাকে আহার করানো দুষ্কর হত ; তবে দৌহিত্র হৃদয় কৌশলক্রমে খাওয়াইয়া আসিতেন। আবার এতই নিস্পৃহ ছিলেন যে, এক সময়ে মথুরানাথ বিষয়-সম্পত্তি দান করিতে চাহিলে বলেন—ওসব কিছুই চাহি নে, যদি দেবার সাধ হয়, দু' পয়সার দোক্তাপাতা এনে দিও। (পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা দোক্তা গুঁড়াইয়া গুল লইতে অভ্যস্ত)।

পুরাণপুরুষ পুরাকাল হইতে মায়া-সহায়ে যাঁর পবিত্র জঠরে বার বার আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিরূপে সেই পুণ্যময়ী জননীসহ নিত্য সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ তাঁহাকে অব্যয় পদ দান করিয়া আবার কোন্ প্রকৃতিকে জননীরূপে বরণ করিবেন ? তাই মাতার অন্তিমকালে তাঁর শিয়রে বসিয়া, স্নেহসূচক কথায় বলেন—মা! তুমি কেমন মাছ চাটুই রেঁধে কত আদরে আমাকে খাওয়াতে ইত্যাদি। অথবা ভুক্তি-মুক্তি যাঁর ইচ্ছাধীন, তিনিই জানেন, কাহাকে অবকাশ দিতে হইবে ; এবং কাহাকেই বা অবসর হতেও পুনরানয়ন করিতে হইবে। কিংবা বাক্য-প্রীতি ও স্পর্শ দ্বারা যিনি মাতার অন্তরে প্রবিষ্ট, তিনিই জানেন, তাঁর জননীকে কোন্ দিব্যধামে প্রেরণ করিবেন।

মাতার প্রয়াণে পুষ্প-চন্দনে অর্চন করিয়া তাঁর চরণ দুটি ধরিয়া বলিতে থাকেন, মা! তোমার পুণ্যদেহ হইতে এই দেহের উদ্ভব, মহীয়সি! তুমি আমার জন্য কত ক্লেশ সয়েছ, তোমার স্নেহের কণাও শোধ করবার সামর্থ আমার নাই ; তবে তোমার অক্ষম সন্তানের বিলাপ রোদন তোমার পূজা বলে—লও। এতই অধীর হন যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেও অক্ষম হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদাকে কহেন, তুমি আমার হয়ে মার সৎকার কর। আবার সৎকারান্তে অঞ্জলিপূর্ণ জলে মার তর্পণে অপারগ হইয়া সাশ্রুনয়নে কহেন—মহামায়া আমাকে এমন অকর্মণ্য করেছেন যে, অঞ্জলিপূর্ণ জল নিতে গেলে আঙুল ফাঁক হয়ে এমন বেঁকে যায় যে, বহু চেষ্টায়ও অঞ্জলিপুরে তর্পণ করতে পারলাম না। প্রার্থনা করি, নয়নজলেই তোমার তর্পণ হোক। যিনি পূর্ণভাবে জীবন্মুক্ত, তিনি কর্মকাণ্ডের পারে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহা দ্বারা অঞ্জলিবন্ধ অসম্ভব বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে গলিতাঞ্জলি কহেন। ঈদৃশ মহাপুরুষ ধরাধামে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হন।

পরমপ্রীতি ও স্নেহভাজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোভাব শ্রবণে ঠাকুর বলেন, বোধ হল আমার একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল, এমন কম্প এল যে, লেপ চাপা দিয়ে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে থাকি। ইহাতে প্রতীত হয় যে, লীলাকল্পে মায়িকবিচ্ছেদ অপেক্ষা প্রাণসম বা প্রাণাধিক ভক্তবিয়োগই অধিকতর দুঃসহ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমার মনঃকষ্ট

এদিকে ঠাকুর যখন শিবত্বলাভে আত্মারাম, পাগলের ঘরণী বলিয়া সমবয়স্কাগণ তখন শ্রীমাতৃদেবীকে মনঃকষ্ট প্রদান করিত। সহ্যগুণে যিনি ধরাকেও পরাভব করিয়াছেন, সেই উমা আমার ভাবিতেন—সুসময়ে মহেশ্বর সঙ্গে মিলন হইবে। এই সময় এক ভিখারী বেহালা বাজাইয়া গান করে ঃ—

কি আনন্দের কথা উমে !
লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানি,
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে ?
অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারি।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভংকরী,
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে ॥
খ্যাপা খ্যাপা সবাই বলত দিগম্বরে
যন্ত্রণা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন দ্বারী না কি আছে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে ॥

আপন অবস্থার সমতুল ভাবিয়া শ্রীমা এই গীত শ্রবণে বড়ই মুগ্ধা হন, এবং মাতার নিকট পয়সা লইয়া গায়ককে পুরস্কার করেন। বলা বাহুল্য, এই গীত শ্রবণে সঙ্গিনীদের শ্লেষ-কথায় আর বেদনা আসিত না।

ঠাকুর দর্শনে শ্রীমার দক্ষিণেশ্বর যাত্রা

যখন শ্রীমা জানিলেন যে, তীর্থ হইতে প্রত্যাগত ঠাকুর শিবরূপে লোকের অশিব নাশ করিতেছেন, তখন শিবা হইয়া তিনিই বা কেন অশিব ভোগ করেন ? সুতরাং মাতার আদেশে খুল্লতাত সঙ্গে জাহ্নবী-স্নানচ্ছলে, কিন্তু অন্তরে প্রভু-মিলন-আকাঙ্খায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান-জননী সারদা দেবী সঙ্গিনীসহ জয়রামবাটি হইতে শুভযাত্রা করিলেন।

শ্যামাদর্শন

পতি-নিন্দা শ্রবণে পরিতপ্তা, ক্ষীণদেহা শ্রীমাতৃদেবী সঙ্গিনীদের মতো দ্রুতগমনে অসমর্থা। মাত্র একদিন ভ্রমণে শ্রমজ্বরে এক বৃক্ষমূলে সংজ্ঞাহীনা হইয়া দেখেন—এক এলোকেশী শ্যামা শিয়রে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার করকমল-পরশে ও করুণা দরশে সুস্থা হইলে সেই অপরূপা দেবী তাঁহাকে বলেন—তুমি বুঝি ভাই, তোমার পাগল স্বামীকে দেখতে যাচ্ছ ? যারা জানে না, তারাই পাগল বলে ; আমি তাঁকে নিত্যই দেবালয়ে দেখি, তিনি পাগল নন। আমার স্বামীকেও লোকে পাগল বলে, কিন্তু তিনি আমাকে বড়ই যত্ন করেন ; আমার খ্যাপা বরের মতো তোমার বরও তোমাকে আদরে রাখবেন ; তুমি ধীরে ধীরে এস, তোমার বরকে খবর দেবার জন্যে আমি আগেই চললাম। —বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। সন্তাপনাশিনীর অন্তর্ধান পরে শ্রীমা বিস্মিতা হইয়া ভাবেন—সত্য না স্বপ্ন দেখলাম ? স্বপ্ন তো নয়, সত্যই দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথাও

করেছি ; পদ্মহস্ত বুলায়ে তিনি আমায় ভালো করেছেন, মিষ্ট কথায় প্রাণে শান্তিও দিয়েছেন।

ডাকাতের আগমন

এমত সময়, 'কে যায় রে' বলিয়া এক কর্কশ স্বর শুনিতে পাইলেন, এবং অনতিবিলম্বেই এক ঘোরদর্শন পুরুষ সস্ত্রীক তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া, ভবভয়বারিণী অভয়া নির্ভয়া হইয়া কহেন—'কে গো, ডাকাত বাবা নাকি ? এসেছ ভালোই হয়েছে ! পথকষ্টে কাতর, ধীরে ধীরে চলছি, শীঘ্রই আসবে ভেবে সঙ্গীরা একটু আগেই গেছে। আমার স্বামী কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে তাঁর কাছে রেখে এস, তোমার জামাই তোমাকে খুব খুশি করবেন। আমি বড়োই দুর্বল, কিছু খাইয়ে সবল কর।'

মহামায়ার খেলা

মহামায়া—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলায়ে রেখেছেন, বাৎসল্যভাবে তিনি যে ডাকাতকে ভুলাবেন, ইহা কি আর বড় কথা ? দস্যুর সন্তান-সন্ততি ছিল না, পিতৃসম্বোধন শুনিয়া, দুর্দান্ত হইলেও, স্নেহরসে তাহার অন্তর আর্দ্র হইল। তখন সে কহিল, মা ! একটু বস, সব জোগাড় করছি—বলিয়া পত্নীকে কহিল, ঘরে গিয়ে মেয়ের জন্যে দুধ মুড়ি আর জামাইয়ের কাছে যাবার জন্যে পাল্কী নিয়ে এস। খাবার ও পাল্কী আসিলে, স্বামী স্ত্রী দুজনে দুধ মুড়ি খাওয়াইলে, মাতৃদেবী সুস্থ বোধ করেন। দস্যু পত্নীকে কহিল—আমি মেয়েকে জামাইয়ের কাছে রেখে আসব, তুমি তারকনাথ দেখে ঘরে ফিরবে। তখন মাতৃদেবীকে পাল্কীতে বসাইয়া, দুইজনে দুই পার্শ্বে চলিতে লাগিল, এবং খুল্লতাত যথায় উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া পাল্কী বিদায় দিল। শ্রীমাকে পাইয়া ও ব্যাপার শুনিয়া সকলেই উল্লসিত হইল।

শিবদুর্গার মিলন

দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গা, মর্ত্য সন্তানদের পূজা গ্রহণান্তে শ্রীকৈলাসে শিব-সনে মিলিতা হইয়া যেমন আনন্দবোধ করেন, তদ্রূপ আমাদের দুষ্কৃতিনাশিনী শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সহ মিলিতা হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

নিত্য সম্বন্ধ

এবার মাধুর্যলীলা পরিপুষ্টির জন্য যাঁহার শুভ আবির্ভাব, ঠাকুর তাঁহাকে সাদরে কহিলেন—দেখ অষ্টাকষ্টি খেলায় একবার যুগ বাঁধিলে ঘুঁটি আর কাটে না। তেমনই তোমার সঙ্গে আমার নিত্য সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছেদ হবার নয় ! তুমি এখন এলে, আর তো সেজবাবু (মথুর) বেঁচে নাই যে, প্রাণ-ভরে তোমার সেবা করবে।

দস্যু পরিচয়

দস্যুর দিকে কৃপাদৃষ্টি করিলে, মাতৃদেবী বালিকার মতো বলেন—ইনি আমার ডাকাত বাবা, দুধ মুড়ি খাইয়ে আমাকে পাল্কী করে এনেছেন। তৎপরে পথিমধ্যে অবসন্ন অবস্থায় শ্যামাদর্শন, ভগ্নীসম্ভাষণ, পদ্মহস্ত প্রসারে আরোগ্য করণ প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণন করিলে, ঠাকুর বড়োই আনন্দিত হন ; পরে শ্বশুর-সম্ভাষণে দস্যুকে সমাদর করিয়া অর্থ,

বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দানে পরিতোষ করেন, এবং মাতৃদেবীর খুল্লতাতকে সম্মান করিয়া দেবালয়ে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন।

মাতৃদেবীর সাধনা

ঠাকুরের গর্ভধারিণী ইতিপূর্বে যেখানে বিরাজ করিতেন, সেই নহবৎখানায় মাতৃদেবীর আবাস হইল। উত্তরকালে যাহাতে ভক্তগণের প্রকৃত জননী হইতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে ঠাকুর শ্রীমাকে বিশেষভাবে উপদেশ করিতে লাগিলেন। সংযম ব্যতিরেকে তপশ্চরণ হয় না, এবং তপস্যা বিনা মনের উৎকর্ষ হয় না, ইহাই শিখাইবার জন্য মাতৃদেবী নহবৎখানার নিম্নতলে পর্বত-গুহার ন্যায় অতি সংকীর্ণ স্থানে থাকিতেন। পরমহংসের পত্নী আছে, জল্পনায় পাছে কেহ ঠাকুরের অগৌরব করে, এই আশংকায় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে শৌচাদি সমাপন পূর্বক পরমগুরু পতিদেবের ধ্যানে নিমগ্না হইতেন ; এবং ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত ঐ গুহার এক অংশে রন্ধনাদি করিতেন। স্বাভাবিক আহার করিলে শৌচাদির জন্য যদি দিবাভাগে বহিরাগমন করিতে হয়, এই হেতু স্বল্প পান-ভোজন করিতেন।

আত্মসম্বিৎ

দু'-পাঁচ দিন নয়, বহু বৎসর ব্যাপিয়া এইরূপ কঠোর সাধনায় শ্রীমাতৃদেবী আপন অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করেন। ফলতঃ স্বামী দেবতার নিমিত্ত এমত আত্ম-বলিদান করিতে মাতৃদেবীর ন্যায় অপর কোনো নারীকে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। অলৌকিক সংযম, কঠোর তপস্যা এবং ঠাকুরের উপদেশপ্রভাবে অল্পকালমধ্যেই শ্রীমাতৃদেবীর আত্মসম্বিৎ হয় ; অর্থাৎ আপনি কে ?—হৃদয়ঙ্গম করেন।

ষোড়শীপূজা

সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ হউন না কেন, মহামায়ার রাজত্বে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। কি জানি তিনি কোন্ অলক্ষ্যে বুদ্ধিকে বিমোহিত করিয়া দেন। সুতরাং তাঁহার প্রসন্নতা বিনা পরিত্রাণ অসম্ভব। তাই বোধ হয় ঠাকুর লোকশিক্ষার্থে মহাবিদ্যা ষোড়শীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। এই হেতু মহা সরস্বতীর অংশসম্ভূতা শ্রীমাতৃদেবীকে এক শুভ দিনে আপন গৃহে আনয়নপূর্বক বস্ত্রাভরণে ভূষিত করিয়া ও দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধি অর্চনা করেন ; এবং তাঁহার পাদপদ্মে সাধনকালের সিদ্ধিপ্রদ জপমালা সমর্পণ করিয়া এই ষোড়শী পূজা দ্বারা সকল সাধন সাঙ্গ করিয়া ঠাকুর দিব্যভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায়—ধর্ম সম্মিলন

ঠাকুর জগদ্গুরু

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় সর্বভূতে চিন্ময়ীর বিকাশ দর্শনে আত্মবিসর্জন করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় ঠাকুর এখন শিবভাবে ভাবিত হইয়া অথবা ব্রহ্মময়ীই তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া চৈতন্যবাণীতে চমকিত করিলেন, (যেমন তোমাকে দেখিতেছি ঠিক সেই মতো) সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎকার করেছি—তিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনি সাকার, তিনিই নিরাকার এবং তাহারও পার। নাম রূপ তাঁহারই পরিচায়ক। এক

হলেও আত্মরতিতে বা বালকের ন্যায় ক্রীড়ায় নামরূপ ধারণে লোক-কল্যাণ জন্য সনাতন ধর্মকে বিবিধ ভাবে উপদেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ

(১) সাঙ্গ অর্থাৎ অনুষ্ঠান সহ সকল ধর্মই সত্য ; সুতরাং যত মত তত পথ। (২) যেমন একই জলকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বারি, পানি, ওয়াটার (water) বলিয়া স্নানে পানে পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ নানা ধর্মমতের মানব সেই সচ্চিদানন্দকে ভগবান, আল্লা, গড (God) প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। (৩) যেমন, মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠা যায়, সেইরূপ বিভিন্ন মত (উপায়) দ্বারা সেই একেশ্বরের নিকট পেঁছানো যায়। (৪) দূরে অবস্থান জন্য পূর্ণরূপ দেখিতে না পারিয়া কেহ কর্ণ, কেহ পদ, কেহ বা শুণ্ড দেখিয়া হস্তী এইরূপ বলিয়া বিবাদ করে, কিন্তু যে নিকটে গিয়াছে, সে দেখিয়াছে যে, কর্ণ, পদ, শুণ্ড সেই একই হস্তীর। সেইরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে যিনি যে পরিমাণ উপলব্ধি করেছেন, সেইটুকুকেই তিনি পূর্ণ বলে প্রচার করেছেন। (৫) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একটি গিরগিটির সাদা, লাল, হলদে, রং দেখে বিভিন্ন লোকে সিদ্ধান্ত করে—গিরগিটির এই বর্ণ ; কিন্তু উদ্যানপাল বহুদিন ধরে দেখে এসেছে যে, গিরগিটি বহুরূপী, স্বেচ্ছায় নানাবর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ একই ঈশ্বর মানব-মঙ্গল জন্য যুগে যুগে বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। (৬) ঈশ্বর-বুদ্ধিতে যারা কাঠ, মাটি, পাথর পূজা করে, আর যারা ধ্যান ধারণাদি করে, উভয়েরই সমান ফল হয় ; কারণ, উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। মূর্তি—প্রতীক-পূজা, যোগ, ধ্যান, উপায় মাত্র। অতএব মত—(উপায়)—লইয়া বিবাদ করিও না, যার যে মতে বিশ্বাস, তাকে সেই মতে তাঁহার উপাসনা করিতে দাও।

উপাসনা-পদ্ধতি

যেমন সার্বভৌম ধর্মপ্রচার করিলেন, তেমনি সাধনেরও সুগম ব্যবস্থা করিলেন। ভগবৎ-আরাধনায় প্রাণায়ামাদি কতকগুলি ক্রিয়া অন্নচিন্তা-পীড়িত ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া দয়াময় ঠাকুর কৃপাপুরঃসর কহিলেন—ধ্যান করবার আগে এখানকে অর্থাৎ তাঁহার সর্বদেবময় তনুকে ভাবনা করলে মনটা সহজেই গুটিয়ে আসবে। আর এক ধ্যানেতেই প্রাণায়ামাদির ব্যাপার সম্পন্ন হবে। আবার বলিলেন—উচ্চ শব্দে যেমন বৃক্ষস্থ পক্ষিগণ ভয়ে পালিয়ে যায়, তেমনই ধ্যান করবার আগে কিছুক্ষণ করতালি দিয়ে হরিবোল বললে অন্য চিন্তা গিয়ে মন সহজেই ইষ্টপদে মগ্ন হবে।

বক্তৃতা

পাশ্চাত্য ভাবে সভা-সমিতি করিয়া, যে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করি নাই, কেবল পুঁথিতে পড়িয়াছি মাত্র, তাহাই বক্তৃতা করি, তাহাতে শ্রোতার কল্যাণ হোক বা না হোক, বক্তার নাম প্রচার হয়। ঠাকুর কিন্তু এইরূপ আধুনিকভাবে ধর্মপ্রচার করিতেন না ; পরন্তু কৃপাদৃষ্টি, শক্তিপূর্ণ মহাবাক্য এবং করুণা-পরশে মানব অন্তরে ভগব ভাব উদ্দীপন করিয়া দিতেন। তবে কোনো এক সময়ে জগন্মাতাকে বলেন, মা ! কেশবকে (ব্রাহ্মধর্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়) একটু শক্তি দাও, যাতে তোমার মহিমা প্রচার করতে পারে। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমরকে ডাকিতে হয় না, বরং ভ্রমরই সৌরভে আকুল হইয়া উপস্থিত হয় ; অথবা অন্ধকারে দীপ প্রজ্বলিত হইলে পতঙ্গকুল আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ঠাকুরের

অন্তরে সহস্রদল কমল বিকশিত এবং ঐশী আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াই, ভ্রমর ও পতঙ্গের ন্যায় শত শত নরনারী পুণ্যদর্শন ও কথামৃত পানে কৃতার্থ হইবার বাসনায় দলে দলে তাঁহার চরণপ্রান্তে আগমন করিত। প্রথমে সাধু মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ, সাধক ও পণ্ডিতমণ্ডলী, তাহার পর পার্শ্বস্থ বারুদখানার সৈনিক, মাড়োয়ারিরা, তৎপরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ এবং সর্বশেষে নব্যসম্প্রদায় আমরা আসিয়াছিলাম।

ভক্ত-মর্যাদা

মহিমাময় সচ্চিদানন্দ জীব-কল্যাণে তিনটি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানীর জন্য ব্রহ্ম, যোগীর জন্য পরমাত্মা, আর সাধারণ হিতার্থে ভগবান। এই ভগবান একাকী সুখভোগ করেন না বলিয়াই ভক্তের প্রয়োজন। কারণ, ভক্ত ভিন্ন কে তাঁহার রসাস্বাদ করিবে এবং জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিবে? সুতরাং ভক্তই তাঁহার হৃদয় এবং তিনিও ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। এই নিত্য সম্বন্ধ হেতু ভক্তচিত্র তাঁহার অন্তরে অঙ্কিত। আবার লীলাবাসনায় আবির্ভূত হইলে, পূর্ব-সহচর ভক্তগণ মুক্তি অর্থাৎ অবকাশ লাভ করিলেও, আবশ্যক মতো তাহাদের আকর্ষণ করিয়া আনেন; এবং সময় মতো উপস্থিত হইলে, নিজ চিত্তস্থ চিত্র দেখিয়াই তাহাদের আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন; এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপণ ও আচরণে আনন্দ বোধ করেন।

গৌরী পণ্ডিত

রাঢ় দেশের ইন্দাস (চলিত কথায় ইঁদেশ) গ্রামের গৌরী পণ্ডিত মন্ত্রচৈতন্য পুরুষ। শুনা যায়, দুর্গাপূজার সময় ইনি বনিতাকে ভগবতী-জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং বাম করতলে কাষ্ঠরাশি জ্বালাইয়া হোম করিতেন। মহামায়ার কৃপায় বা যে কারণেই হোক, তাঁহার করতল দগ্ধ হইত না। আবার পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্রবিচারের পূর্বে 'জ্ঞান-গণেশ, হারে, রেরে' বলিয়া এমন রব তুলিতেন যে, পণ্ডিতগণ তাহাতে সম্মোহিত হইতেন; সুতরাং সর্বত্রই তাঁহার জয় সূচিত হইত।

সর্বজন-আকাঙ্ক্ষিত অষ্টসিদ্ধি যাঁহা হইতে উদ্ভব, সেই জগন্মাতার বিরাট সত্তায় স্বীয় সত্তাকে লয় করিয়া ঠাকুর খণ্ড মনের ভাবসমূহ সহজেই উপলব্ধি করিতেন। তাই পণ্ডিতজী গৃহ প্রবেশকালে, 'হারে, রেরে রব' তুলিলে ঠাকুর দ্বিগুণ রব করিয়া আবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন। প্রভুর কৃপা-পরশে কৃতার্থ হইয়া পণ্ডিতজী এক দিব্য স্তুতিতে প্রকাশ করেন—যখন পরম পুরুষ, তখন ত্রিপুটী (জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাত) পার, যখন প্রকৃতি, তখন সৃষ্টিপর্যায় আপন-ভোলা; সুতরাং আপনাকে আপনি জানেন না। যখন ঈশ্বর, তখন কর্মফলদানে চঞ্চল; আবার যখন ভগবান, তখন দেখি ভক্ত-ভাবনায় বিভোর। কাজেই আত্মচিন্তার অবসর কোথায়?

পদ্মলোচন

আর একজন সিদ্ধ পুরুষ, বর্ধমান-রাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য, অতি শান্ত স্বভাব। তিনি ইষ্টদেবতার নিকট বর পান যে, শাস্ত্র-বিচার করিবার আগে মুখ প্রক্ষালন করিলে সভায় সর্বজয়ী হইবেন। মহামায়ার প্রেরণায় ইঁহার আগমন আভাষে জানিতে পারিয়া ঠাকুর গৃহস্থিত জলপাত্র সমুদয় স্থানান্তরিত করেন। জলপাত্রবিহীন গৃহ দেখিয়া ভট্টাচার্য বিস্মিত চিত্তে ভাবেন—ইষ্টদেবের বরদান যখন তাঁহার পত্নীরও অজ্ঞাত, তখন ইনি

ইহা কিরূপে জানিলেন? বুঝিলাম—ইনিই আমার ইষ্টদেব। তখন ভক্তিভরে স্তব করিয়া পদ্মলোচন ঠাকুরকে কহিলেন—'আপনিই অন্তর্যামী ভগবান, জীব-কল্যাণে আপানার দেহধারণ, আপনার পুণ্যদর্শনে আমি চরিতার্থ।'

বেদান্তবাগীশ ও তর্করত্ন

শুনিয়া আশ্চর্য হই—প্রাচীন বেদান্তবাগীশ শাস্ত্র-প্রসঙ্গের পর বলেন—ভাগ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছিলাম, তাই তাঁহারই সরল ভাষায় জটিল ধর্মতত্ত্ব সমাধান করিতে পারিলাম। প্রাচীন তর্করত্ন বলেন,—'যদি ধর্মলাভে বাসনা থাকে, দক্ষিণেশ্বর-ভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লও। বহু তীর্থ ও সাধু দর্শনে আমার ধারণা ভারতে তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই, তাঁহার পাদপদ্মে আমি অনেকদিন আশ্রয় লইয়াছি।'

এরূপ কত যে সিদ্ধ পুরুষ ও পণ্ডিতগণ ঠাকুরের কৃপা পাইয়াছেন—তাহা বর্ণন অসম্ভব।

অবাধ দর্শন

প্রাচীনকালে ঋষির আশ্রমে ধর্মকথা শুনিতে কাহারও নিষেধ ছিল না, ইদানীং তীর্থপীঠে দেবতা-দর্শনেও বাধা নাই। এই হেতু পুরাণ নারায়ণ ঋষি রামকৃষ্ণ-দর্শন ও তাঁহার কথামৃত-শ্রবণে কাহারও বারণ ছিল না। কোন্ আচরণে ধর্মলাভে জীবন সার্থক হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকেই দয়াময় ঠাকুর উপদেশ করিতেন এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য জাগরূক থাকিতেন।

যন্ত্রস্বরূপ

বরেণ্য হইলেও, বালকভাবে অবস্থান করায় ঠাকুর কহিতেন—আমি জগন্মাতার যন্ত্রস্বরূপ—তিনি যাহা বলান তাহাই বলি। মহাজনের গদিতে একজন 'রামে রাম দুয়ে দুই' বলে চাল মাপিতে থাকে; পাছে তাহার রাশি ফুরাইয়া যায়, তাই পিছন হইতে আর একজন জোগান দেয়। মহামায়াও তাঁর ধর্মরাজ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার অন্তরে জোগাইয়া দেন—আমি তাই বলিয়া যাই।'

আমাদের ধৃষ্টতা

ক্ষুদ্র আমরা, ঠাকুরের ন্যায় আমাদের ঐশী সম্পদ নাই যে, উপদেশদানে মানবের কল্যাণ করিব। এ কল্পনাও স্পর্দ্ধাসূচক, সুতরাং অমার্জনীয়। বরং যদি শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাবে জীব-শিবকে তাঁহার মহিমা শুনাইতে প্রয়াস পাই ও সেই উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করি, তাহা হইলে বাক্‌জাল বিস্তার অপেক্ষা বিশেষ ফল হইতে পারে। কারণ, ভগবৎ-গুণগানে আপন হৃদয় পবিত্র হয়, এবং আত্মবৎ বা শিবজ্ঞানে যাদের শুনানও যায়, তাদের চিত্তেও ভগবৎভাব আসিতে পারে।

একবিংশ অধ্যায়

গুণীর গুণ-মর্যাদা

যিনি প্রকৃত গুণবান, তিনিই গুণের আদর করিতে জানেন। তাই গুণনিধি ঠাকুর যাঁহার মধ্যে গুণ-বিকাশ শুনিতেন, অযাচিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিতেন এবং তাঁহার

প্রশংসা করিতেন। বলিতেন—'যেখানে গুণের বিকাশ সেখানে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ জানবি।' অথবা যে নিখিল গুণাকর হইতে গুণগ্রামের উদ্ভব, তিনি যদি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর মর্যাদা না করেন, আমাদের মতো অপদার্থ লোক কি গুণের আদর করিবে? এই হেতু ঠাকুর বলিতেন—'তোদের একটাং অর্থাৎ এক আনা গুণ দেখলে, আমি ষোল টাং বলে আদর করি। কারণ, উৎসাহ ব্যতীত গুণনিচয় পরিপুষ্ট হয় না।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রেরণায় ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং তিনিও ঠাকুরকে সমধিক সংবর্ধনা করেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি দর্শনে উল্লাস করিয়া ঠাকুর কহেন—'মহর্ষি ভগবৎ-রস আস্বাদ করেছেন।' কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব দেখিবার ইচ্ছা জানাইলে মহর্ষি বলেন, 'সাধারণ লোক আপনার সামান্য বেশ দেখিয়া পাছে অবজ্ঞা করে, এই আশংকায় প্রার্থনা করি—আপনি যেন উৎসব দেখিতে না আগমন করেন।'

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সসাঙ্গোপাঙ্গে উৎসব করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করেন। ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে রহস্য করিয়া ঠাকুর বলেন—'দেখছি তোমার ল্যাজ খসেছে! তাই তুমি ভজনানন্দ ও বিষয়ানন্দ দুই-ই উপভোগ করছ, কিন্তু এ সব বাবুদের (কেশবচন্দ্রের সহচরগণের) সেরূপ হয় নি।' তাঁহারা চঞ্চল হওয়ায় কেশবচন্দ্র কহেন—'মহাপুরুষের কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া কেন অধীর হইতেছ?' ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তগণকে বুঝাইয়া দেন—'অর্থাৎ যতদিন ল্যাজ (আসক্তি) না খসে, ব্যাঙাচিরা ততদিন জলেই ভেসে বেড়ায়, ল্যাজ খসলে ব্যাঙ হয়ে জলে ও স্থলে বেড়ায়। বিষয়াসক্তি গেছে বলেই তোমার (কেশবচন্দ্রের) সেই অবস্থা হয়েছে।'

বিদ্যাসাগর

ইহার পর ঠাকুর বদান্য ও বিদ্যাদাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাকে বলেন—'এতদিন গেড়ে ডোবায় (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।' 'যখন সাগরে এসেছেন, তখন নোনা জল খেয়ে যান,'—এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলে, ঠাকুর কহেন—'না গো, তুমি অবিদ্যাসাগর নও যে, তোমাতে নোনা জল থাকবে। দেখছি তুমি বিদ্যার সাগর। লোক দেখাবার জন্য হাতীর বাহিরে এক রকম দাঁত, আবার খাবার জন্য অন্য রকম দাঁত। লোকহিতকর কাজে বাহিরে তোমার উৎসাহ কিন্তু অন্তরে তুমি বেদান্ত-জ্ঞানী! তুমি তো সিদ্ধপুরুষ।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, 'কি করে?' ঠাকুর সহাস্যে কহেন, 'আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম দেখছি।' আমাকে বলেন—'বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ; (আপনাকে দেখাইয়া) কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে, পাছে তার বিদ্যাদান কর্মের উচ্ছেদ হয়—তাই আপন কল্যাণ মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করল।'

ভগবানদাস বাবাজী

নৌকাযোগে নবদ্বীপ যাইবার মধ্যপথে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অম্বিকা কালনা নামে যে সমৃদ্ধ জনপদ আছে, তাহা বর্ধমানরাজের দেবালয় ও সমাজ-ভবনের জন্য বিখ্যাত। এই স্থানে প্রাচীন সিদ্ধ ভক্ত ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম, হরিনামকে ইনি নাম-ব্রহ্ম বলিতেন এবং এই নাম-ব্রহ্ম জপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। একে প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ, তায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। সুতরাং বৈষ্ণব-সমাজে ভালো মন্দ যাহা ঘটিত, তৎসমুদয়ই ইঁহাকে জানানো হইত। তিনি যাহা ভালো বলিতেন—সেটি প্রশংসনীয়, এবং যাহা মন্দ বলিতেন, সেটি নিন্দনীয় হইত।

ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিতে যান এবং বাহিরে অপেক্ষা করিয়া হৃদয়কে দিয়া সংবাদ দেন যে, তিনি বাবাজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণে ঠাকুর যখন বাবাজীর নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব সাধুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনায়—কাহাকেও সমাজ হইতে বিতাড়িত কর, কাহারও কণ্ঠী কাড়িয়া লও ইত্যাদি যেন বিচারকের ন্যায় আদেশ দিতেছিলেন।

কলিকাতার কলুটোলা পল্লীতে কোনো এক সুবর্ণবণিক-ভবনে একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সভায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অধিষ্ঠান উদ্দেশে যে আসন কল্পিত হইত, তাহা চৈতন্য-আসন বলিয়া পূজিত; সে কারণ বৈষ্ণবমণ্ডলী উহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কতিপয় ভক্ত—যাঁহারা ঠাকুরকে মূর্ত শ্রীচৈতন্যজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, তাঁহাকে ওই সভায় লইয়া যান। ভক্তমুখে হরিনাম শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর চৈতন্যাসনে উপবেশন করিলে, ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য বলিয়া পূজা করেন, কিন্তু অপর সাধারণে ভাগ্যাভাবে ঠাকুরের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে।

চরমুখে এই ব্যাপার শুনিয়া বৃদ্ধ বাবাজী রোষ করিয়া কহেন—আমি যদি উপস্থিত থাকিতাম, তবে যে ব্যক্তি এই ধৃষ্টতা করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতাম। ভক্তকল্যাণ জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তাই প্রাচীন ভক্তকে মোহমুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর বাবাজীকে কহেন—'আমি জানি, একমাত্র ভগবানই কর্তা, আর সকলে অকর্তা—তোমার এতই অহঙ্কার, তুমি যেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছ?' বাবাজী তখন ঠাকুরের মৃদু ভর্ৎসনায় চৈতন্য পাইয়া প্রণামপূর্বক কহেন—আপনার কৃপায় দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আপনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সুতরাং আপনিই যে চৈতন্যাসনে বসিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? আপনার পদার্পণে দিব্যসৌরভ পাইয়া ভক্তদের বলিয়াছি—আমাকে কৃপা করিতে দেবোপম কোনো মহাভাগের আগমন হইয়াছে।*

শশধর তর্কচূড়ামণি

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তখন বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম-প্রচার করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে আসেন ও কথাপ্রসঙ্গে কহেন, 'যদি চাপরাশ (জগদম্বার নিকট হইতে শক্তি) পেয়ে থাক, তবে তোমার বক্তৃতায় লোকের উপকার হবে, অন্যথা নয়। আজ যেমন তোমার কথায় বাহবা দিচ্ছে, কাল অপরের বক্তৃতায় তেমনি দিবে।'

* ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের নিকট শ্রুত

গৃহস্থের কল্যাণ

আদর বা অনাদর হউক না কেন, গৃহস্থের ভবনে যৎসামান্য দ্রব্য যদি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে পাছে তাহার অকল্যাণ হয়—এই আশংকায় সর্বশুভাকাঙ্ক্ষী ঠাকুর তাহার কাছে জল বা তাম্বুল ইচ্ছা করিতেন। আবার অন্তর্যামী ঠাকুর দাতার নির্মল বা মলিন ভাব জানিতে পারিয়া তাহার দেওয়া দ্রব্য স্বীকার বা কৌশলে অস্বীকার করিতেন। এই রীতি অনুসারে পণ্ডিতের (শশধর) নিকট পানীয় চাহিলে তাঁহার আশ্রয়দাতা যে জল আনেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার ভ্রাতার আনীত জল পান করেন। কৌতূহলবশতঃ নরেন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, গৃহস্বামী বাহ্যতঃ সদাচারী হইলেও অন্তরে সেরূপ ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

ঠাকুরের রূপ-মাধুরী

রূপ কি ? মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুবিন্যাসই রূপ। আবার অন্তরে যে দিব্যভাব বিদ্যমান, বাহিরে তাহার পূর্ণ বিকাশই প্রকৃত রূপ। চিত্ত-প্রসাদনকারিণী শ্রী যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং জগৎকে যিনি সুন্দর করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীমান ও রূপবান হইবেন না—ইহা কল্পনার অগোচর। বিশ্বকর্তা লীলাঅভিলাষে যখন নরকলেবর ধারণ করেন, রূপ ও শ্রী তাঁহাকে এমন ভাবে সুশোভন করে যে, তাহা দর্শনেই মন মোহিত হইয়া যায়। এই হেতু অবতার পুরুষগণ রূপেতেই সকলকে আকৃষ্ট করেন। তাই বোধ হয় পশ্চিম দেশবাসীরা বলিয়া থাকে, 'আগাড়ি দর্শনধারী পিছারি গুণ বিচারী'। আবার ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—'বাঁকা শ্যামরূপে নয়ন ভুলিল, মন ভুলালে বাঁশী।' সুতরাং ঠাকুর যে অসামান্য রূপবান ছিলেন, ইহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। মহিমায় যিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তিনি যে রূপে মোহিত করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

ভাগ্যক্রমে বাবুরাম ভাইয়ের (স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে প্রথম দিন যাইয়া দেখি, নরদেবের আকৃতি অতি দীর্ঘ বা খর্ব নহে, মধ্যাবিৎ, তবে বাহুযুগল যেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। করতল দুটি পরস্পর সংলগ্ন, যেন কোনো অদৃশ্য দেবতার আরাধন-রত। বক্ষঃস্থল বিশাল ও আরক্তিম, বর্ণ গৌর, হরিদ্রা ও অলক্তক-মিশ্রিত, তবে রৌদ্রতাপে তাপিতের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ। ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে, কপালে যে সিন্দুর-টিপটি আছে, উহারই সঙ্গে সমবর্ণ। চক্ষু দুটি টানা হইলেও হরিকথা শুনিতে শুনিতে যেন শিবনেত্র। আবার চমক ভাঙিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া নেত্র মার্জন করিতেছেন। মধ্যাবিৎ ভাবে কেশশ্মশ্রুবিশিষ্ট হইলেও পারিপাট্যবিহীন। পরিধানে লালপাড় ধুতি, কোঁচা না করিয়া এলোথেলো ভাবে স্কন্ধদেশে নিক্ষিপ্ত। উদরে প্লীহা-চিকিৎসার দাগটি যেন কবচের মতো অঙ্গশোভার উৎকর্ষ করিয়াছে। গঠন এককালে দৃঢ় হইলেও, এখন যেন শিথিল ও কোমল। চন্দ্রালোকে গৃহাভ্যন্তর যেমন মৃদু উজ্জ্বল হয়, রূপজ্যোতিতে ঘরটি সেই রকমই হইয়াছে। মুখকমল প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। ভক্ত-সঙ্গে অমানিভাবে একাসনে বসিয়া ভগবৎকথা প্রসঙ্গে যেন সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কথাগুলি মিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। ফুলের তোড়া বা ধূপ জ্বালানো না থাকিলেও, অনুভব করিলাম, অঙ্গসৌরভে ঘরটি সুবাসিত, অনেকটা যেন পদ্মগন্ধের মতো। শ্রীদুর্গানাম-বিশ্বাসী ও দানবীর শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, 'কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে যেরূপ দিব্য গন্ধের ঘ্রাণ পাই, এখানেও ঠিক সেইরূপ সৌরভ পাইতেছি।' ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই যেন কত কালের আপনার বলিয়া প্রেরণা আসিল ; মন এতই মোহিত হইয়াছিল যে, প্রাণমনে সচেষ্ট না হইলেও, কি জানি কি আকর্ষণে মস্তকটি যেন আপনা হইতেই শ্রীপদে লুটিয়া পড়িল। ঠাকুরও আমাকে তাঁহার আপনার জানিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 'এসেছ—বস।' ধ্যানমঙ্গল সেই রূপ-মাধুরী, চিত্রপটে ফুটে নাই, তবে আশ্রিত-হৃদয়ে পরিস্ফুট !

শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, কিশোর অবস্থায় রূপদায়ে কোনো এক রূপাভিখারিণীর আক্রমণ হইতে দ্রুত পলায়নে পরিত্রাণ পান। আবার নিজালয় হইতে শ্বশুরালয় গমন-কালে বহু নরনারী তাঁহার রূপদর্শন মানসে পথরোধ করিলে লজ্জিত হইয়া বলেন, 'মা, লুক্ লুক্' অর্থাৎ জগন্মাতা! আমার বাহিরের রূপ লুকাইয়া রাখো। শ্রীমাতৃদেবীও বলিয়াছেন—এক সময়ে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি তাঁহার বাহুস্থিত কাঞ্চন কবচের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, পরন্তু আরও দেখিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ পর্ব দিনে এবং কীর্তনানন্দে রূপের এতই বিকাশ হইত যে, তাহা ভাষায় বলিতে পারা যায় না।

ঠাকুর বলেন, তপস্যার প্রথম অবস্থায় তাঁহার শরীর এতই সহিষ্ণু ও বলিষ্ঠ ছিল যে, একখানি মোটা কম্বল আবরণে শীত, বাত, তাপ সহন এবং দ্রুতগতিতে আট দশ ক্রোশ পথ অক্লেশেই চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় এবং অবিরাম ভাবরাজ্যে বিচরণ করায়, ভাব-সমাধিতে দেহগ্রন্থি এমত বিচূর্ণ হইয়াছে যে, অতি অল্পমাত্র চলিতেও ক্লেশ বোধ করিতেন।

গঙ্গার পরপারে বালিগ্রামে জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব দর্শনে উল্লসিত হইয়া পদব্রজে কোনো ভক্ত-ভবনে গমনকালে সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি যে, অল্প পথ চলিয়াই এত ক্লান্তি বোধ করেন যে, মহামায়া-প্রদত্ত প্রিয় সন্তান, শ্রীমান রাখালরাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হইয়া গান করিতে থাকেন—

'আর চলিতে নারি চরণ বেদন যে হল, সখি! সে মথুরা কত দূর!' তখন পথিমধ্যে দু'চারজন অপরিচিত লোকদর্শনে গানে ক্ষান্ত দিয়া কহেন যে, 'রামপ্রসাদ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া বলিয়াছিল, 'মা আবার যদি আসতে হয়, যেন হাড়ি-শুঁড়ির ঘরে জন্মে, বেপরোয়া হয়ে তোর গুণগান করে পথে চলে যেতে পারি'।

পুনরপি কোমলেরও কোমল সচ্চিদানন্দ-অনুধ্যানে শ্রীঅঙ্গ এতই কোমল হইয়াছিল যে, ঠাকুরবাড়ির শক্ত লুচি ছিঁড়িতে গিয়া আঙুল কাটিয়া যায়। বস্তুতঃ ঠাকুরের অঙ্গ নবনীতের ন্যায় এতই সুকোমল ছিল যে, তাঁহার অনুকম্পায় পদসেবার অধিকার পাইলেও আশঙ্কা হইত, পাছে আমাদের কঠিন করপরশে শ্রীঅঙ্গে ব্যথা প্রদান করি।

আবার যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, তখন দেখিয়া বোধ হইত যেন গলিত কাঞ্চনসম উজ্জ্বল, অথচ নবনীত সদৃশ কমনীয় কান্তি প্রভু যেন স্বর্গ হইতে আনীত সুধা ভক্তকুলকে বিতরণ মানসে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় বামভুজ ঈষৎ উত্তোলনসহ প্রসার এবং দক্ষিণ হস্ত কুঞ্চিত করতঃ বামপদ অগ্রসর ও দক্ষিণপদ পিছাইয়া মৃদু মন্থর নৃত্য করিতে করিতে যখন অগ্র বা পশ্চাৎ গমন করিতেন, দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইত যে, কুসুমের ন্যায় কোমল তনু কিরূপে এমন উদ্দাম মধুর নৃত্য করিতে পারে? তখন বোধ হইত, ঢল ঢল রূপরাশি যেন তরল হইয়া ভক্তমধ্যে ঠিকুরিয়া পড়িতেছে। সে অপরূপ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতে ভাষা ভাসিয়া যায়; কেবল ধ্যানযোগেই উপলব্ধি হয় মাত্র।

যে সকল ভাগ্যবান ব্রাহ্মভক্ত মণিমোহন মল্লিকের বাড়িতে সে রূপ-মাধুরী দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কবির ভাষায় বলিবেন, 'ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভালো।'

বালকভাব

বালকের মতো স্বভাব না হইলে চিত্তে ভগবৎভাবের স্ফুরণ হয় না, ইহাই আমাদিগকে

শিখাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের চলন, বলন, আচরণাদি বালকবৎ হইয়াছিল। এমন কি, কোনো কথাপ্রসঙ্গে আমাদের প্রত্যয় আনিবার চেষ্টায়, 'মাইরি! কোন্ শালা ভাঁড়ায়' বলিয়া বালকের ন্যায় কখনও-কখনও শপথও করিতেন। তাহা শুনিতে কতই না মধুর! তিনি বলিতেন, 'তখন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে কষ্টবোধ হত বলে হৃদুকে দিয়ে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের এনে খাবার, খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করতুম। বেশ খেলছে, আমোদ করছে, যাই বললে 'মা যাব' আর শালার ছেলেকে কিছুতেই ভুলানো যায় না, তখন হৃদুকে দিয়ে আবার তার মার কাছে পাঠিয়ে দিই। মানুষের যদি ভগবানের উপর এমনি টান হয়, কেউ তাকে আটকাতে পারে না। আবার একটা ছেলে 'ফুল নেব' বলে বায়না ধরলে, বাপে বুঝাল—নিতে নেই, ঠাকুর পুজো হবে, কে শোনে, বার বার 'ফুল নেব' বলে কান্না; ফুলটি দিলাম, পেয়ে খানিকক্ষণ খুব আনন্দ, তারপর 'দূর যাঃ!' বলে ফেলে দিল। আসক্তি নেই কি না তাই। এইরূপ অনাসক্ত না হতে পারলে ভগবান লাভ হয় না।'

বালকের ন্যায় সরলস্বভাব ঠাকুরের অণুমাত্র কুটিলতা ছিল না বলিয়াই পেটে কথা হজম হইত না। কেহ কোনো গোপনীয় কথা বলিয়া গেলে কতক্ষণে অপর কাহাকে বলিয়া পেট খালি করিবেন, তার জন্য ব্যস্ত। ভবনাথ কোনো একদিন মনোবেদনায় তাহার সাংসারিক গুপ্ত কথা ঠাকুরকে জানাইলে তাহার দুঃখে সমবেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আসিলে তাহাকে সমস্ত বলিয়া তবে স্বস্তিবোধ করেন। কিন্তু যদি স্বীকার করিতেন যে, কাহাকেও বলিব না, অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা হেতু শত অনুরোধেও সে গুহ্য কথা আর শ্রীমুখ হইতে বাহির হইত না।

ঠাকুরের এই বালস্বভাব এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে বালকের মতো শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রখানি পর্যন্ত থাকিত না। আবার ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে বিভোর হইয়া অনেক সময় কটিস্থিত বসনখানি কক্ষদেশে রাখিয়া বলিতেন—'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) আসা অবধি আমি এত সভ্য হয়েছি যে, সদাই কাপড় পরে থাকি।' যখন বলা গেল, তিনি উলঙ্গ, তখনও বালকের মতো কহিলেন, 'মাইরি, আমি সভ্য হয়েছি।' পরে যখন অঙ্গস্পর্শ করিয়া দেখানো হইল—তিনি নগ্ন, তখন করুণভাবে কহিলেন, 'মনে তো করি সভ্য হব, কিন্তু মহামায়া যে অঙ্গে বসন রাখতে দেন না, সে কি আমার দোষ?'

কোনো একদিন যাইয়া দেখি যে, এই বালকভাবের উৎকর্ষতায় প্রলয়পয়োধিতে বটপত্র-শায়ী শিশু নারায়ণের ন্যায় ঠাকুর শয্যাতে শয়ন করিয়া পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিব্যভাবে কত না আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। দৃশ্যটি অতি মনোহর! দেবী ভাগবতে পড়িয়াছিলাম মাত্র, ভাগ্যক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম।

আহার

যে কোনো উপায়ে হোক না কেন, রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি না। ঠাকুর বলিতেন, 'আহার শরীর ধারণ জন্য', সুতরাং আমিষ বা নিরামিষ ভোজের উপর ততো লক্ষ্য ছিল না। তবে পাছে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তির উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় খাবার সম্বন্ধে তিনটি বিচার ছিল; আধারদোষ, স্পর্শদোষ ও দৃষ্টিদোষ। এই কারণে যাহার তাহার অর্থাৎ ভগবানে অবিশ্বাসী ব্যক্তির আনীত, স্পৃষ্ট বা লোভপ্রযুক্ত দৃষ্টিদোষ-

যুক্ত, এবং অগ্রভাগ-গৃহীত খাদ্যদ্রব্য ঠাকুর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। দেখিয়াছি, বড়বাজারের মাড়োয়ারীরা নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন আনিলে উহা স্পর্শও করিতে পারিতেন না। বলিতেন, উহার সহিত সহস্র কামনা মিশ্রিত এবং অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ হইতে উহা সংগৃহীত। আরও বলিতেন যে, রাজান্ন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে প্রেতোদ্দেশে আয়োজিত অন্ন ভক্ষণেও ভক্তির উচ্ছেদ হয়। কিন্তু একদা ব্রাহ্মভক্ত অমৃতলাল বসু (নব বিধান) উৎকৃষ্ট বলিয়া মুসলমানের দোকানের মিষ্টান্ন ঠাকুরের নিকট আনিলে তিনি বলেন—'সন্তানবাৎসল্যে গোরস যেমন দেবভোগ্য দুগ্ধে পরিণত হয়, তোমার অকপট ভক্তিতে ইহাও সেইরূপ পবিত্র হইয়াছে।'

জগজ্জননীর শ্রীমন্দির হইতে প্রসাদ আসিলে তাহাতে পাঁচ রকম ব্যঞ্জন থাকিত; ভোজনকালে ঠাকুর একে-একে সকলগুলির আস্বাদ লইয়া মাত্র মাছের ঝোল দিয়া দুটি ভাত খাইতেন। বলিতেন জগন্মাতা মনটাকে সতত একাগ্র করিয়া রাখিলেও, কেবল তোদের কল্যাণের জন্য পাঁচটা তরকারী চাকি। যেদিন এক তরকারী ভাত খাব, সেদিন আর তোদের সঙ্গে আলাপ করতে পারব না। অর্থাৎ একরস হইয়া নির্বিকল্প-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আচরণ—সত্যসঙ্কল্প

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো এমন সত্যসংকল্প কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। তিনি বলিতেন, 'ভগবান সত্যস্বরূপ, সত্যের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সত্যনিষ্ঠ হলে সত্যস্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায়। যে দ্বাদশ বর্ষ সত্য কথা বলতে পারে, তার বাক্‌সিদ্ধি হয়। ঋষিরা আজীবন সত্যবাদী ছিলেন বলে, যা বলতেন তাই ফলতো। এই হেতু মনে যখন যে সংকল্পটি উঠিবে, তখনই তা কাজে পরিণত করতে হবে।' এই সত্যপালন ব্যাপারে শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপর আদৌ দৃষ্টি রাখিতেন না। সন্দেহ উঠিতে পারে, ইহাও তো একরূপ যথেচ্ছাচার? অহমিকা-নাশে জগদম্বার যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া যিনি তাঁহার প্রেরণায় কার্যকলাপ করিতেছেন, তিনি কি আর স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন! ঠাকুর বলতেন, 'যার সব ঠিক ঠিক হয়, জগন্মাতা তার পা বেচালে ফেলেন না।'

যদি মনে উঠিল, 'শ্রীমন্দিরে যাইব', তবে যতই ঝড় বৃষ্টি হউক না কেন, ভ্রূক্ষেপ নাই। গোঁভরে যেন অবশ হইয়া চলিলেন। ইচ্ছা হইল এঁড়েদহের দাস গদাধরের পাটবাড়ি যাইব বা অন্য কোনো ভক্ত-ভবনে যাইব, তাহা হইলে সঙ্গী বা যান উপস্থিত থাকুক বা না-ই থাকুক, একাকীই গমনোদ্যত; তবে দেখিয়াছি—জগদম্বা সঙ্গী ও যান মিলাইয়া দিয়াছেন। কাঞ্চন-ত্যাগ জন্য তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিলেই অঙ্গ-বৈকল্য হইত। এই হেতু শৌচ-চেষ্টা আসিলে যাহাকে গাড়ু লইয়া যাইতে বলিতেন, সে-ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ যদি সেবার আগ্রহে জলপাত্র লইতে উদ্যত হইত, অমনি শৌচ-চেষ্টা নিবৃত্তি পাইত। 'বিজয় আমার হরিনামামৃত পানে সারাদিনটা কাটায়' সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রু এই কথা বলিলে, ঠাকুর বলেন, 'কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ, তাই আমি দুটি অন্নগ্রহণ না করে থাকতে পারি না। শক্তি সামর্থ্য বল আর ভগবৎ অর্চনাই বল, সবই অন্নের উপর নির্ভর।' কিন্তু কাছে

বসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দু-চার গ্রাস খাইতে না খাইতে, বালকের খেয়ালে যদি বলিলেন, 'আর খাব না,' আশ্চর্যের বিষয়, তখনই হাত এমনি অসাড় হইয়া গেল যে, ভাতের থালের দিকে আর হাত গেল না। এই সত্যসংকল্প হেতু মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন ঠাকুরের পূর্ণ ভোজন হইত না। এই জন্য জগদম্বার নিকট এক একদিন অনুযোগ করিতেন—'কেন খাব না বলালি ? এখন খিদের জ্বালায় খুন হচ্ছি, কে রোজ রোজ আমায় খাবার এনে খাওয়াবে ?'

আর একদিন পঞ্চবটী-তলে বসিয়া অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় মা কালীর কাছে আবদার করিলেন, 'যদি তুমি এখনই সেজবাবুর অমুক মেয়েকে এনে দেখাতে পারো, তা হলে বুঝব যে, তুমি আমায় ভালোবাসো।' বলামাত্রই তো কন্যা আনা সম্ভব নয়, কিন্তু কি করেন, ভক্ত-আগ্রহ পূরণ জন্য ইচ্ছাময়ী কন্যার রূপ ধারণ করিলেন। কেহ বলিতে পারেন, ইহা অসম্ভব ! কিন্তু পুরাণ ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাণাধিক ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য ভগবানকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। অমাবস্যা রাত্রে জগজ্জননীর চিন্ময়-রূপ-ধ্যানে হৃদয় আলোকময় হওয়ায় বাঙ্গালাদেশে কালীমূর্তি-প্রকাশক সিদ্ধপুরুষ আগমবাগীশ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, আজ পূর্ণিমা ; তাই ভক্তবাক্য সার্থক করিতে আদ্যাশক্তি অকস্মাৎ তাঁহার হাতের কংকণজ্যোতিতে সমগ্র নবদ্বীপ 'পূর্ণিমার' মতো আলোকময় করেন। ঠাকুর বলেন, 'বেহুঁশ হয়ে ভাবছি ; ওরে বলতে কাঁটা দেয় রে ! বেশ বুবলাম, মহামায়াই সেজবাবুর মেয়ে সেজে আমাকে 'ছোট ভটচাজ্ মশাই' বলে ডেকে কত কথাই বললেন, আর আমিও তাঁর এলোচুলে বেণী বেঁধে দিতে দিতে আনন্দে আত্মহারা। হুঁশ এলে দেখি, কেউ কোথাও নেই ! জানবাজারে লোক পাঠিয়ে খবর নিই যে, সেজবাবুর মেয়ে তার শ্বশুর-বাড়ি আছে। হীনের হীন, দীনের দীন আমার সকল সংকল্পকে ব্রহ্মময়ী পূরণ করেন দেখে বলেছিলুম, মা, এই নেও তোমার ধর্ম, এই নেও তোমার অধর্ম, এই নেও তোমার জ্ঞান, এই নেও তোমার অজ্ঞান, এই নেও তোমার পাপ, এই নেও তোমার পুণ্য, আজ হতে সবই তোমাকে অর্পণ করলাম। কিন্তু—সত্যটি তোমায় দিতে পারলাম না। সত্যটি দিলে কি নিয়ে থাকব ? সত্যটি গেলে সত্যস্বরূপিণী তুমিও যে মিথ্যা হবে, আর তোমার জন্য আমার সাধন-ভজন সবই মিথ্যা হবে।'

নরেন্দ্রনাথকে সাধন-পথে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর বলিয়াছেন, 'খানদানী চাষা বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ আবাদ ছাড়ে না। আবার চাতক পাখি তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও নদীর জল বা অন্য জল খাবে না, কেবল আকাশের পানে চেয়ে 'ফটিকজল ফটিকজল' বলে ডাকছে।' কলিকাতাবাসী নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে চাতক দেখেন নাই। তবে দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে সন্ধ্যাকালে অজস্র বাদুড়কে উড়িবার সময় ছোঁ মারিয়া গঙ্গার জল পান করিতে দেখিয়া মনে করেন, ইহারাই চাতক। তাই ঠাকুরকে তিনি বলেন, 'আমি দেখেছি এবং আপনাকেও সন্ধ্যাবেলা দেখাব—চাতক পাখি ছোঁ মেরে জল পান করে।' ঠাকুর তখন সহাস্যে বলেন, তুই ছোঁড়া চামচিকেকে চাতক বলে দেখেছিস। ব্রহ্মময়ী মা আমায় বলেছেন, আমার দর্শনাদি সব সত্য ; এর একটা মিছে হলে আমার যে সব মিছে হয়ে যাবে।

আচার-পালন

শুচি এবং অশুচির পরপারে যাঁহার অবস্থান—কেবল আশ্রিত-কল্যাণ-কামনায় তাঁহার

শৌচাচারের অবতারণা ; আবার যে ব্যক্তি আচার-রূপ ব্যাধি-প্রপীড়িত, তাঁহার শুভেচ্ছায় অশুচিভাবের প্রশ্রয় দান করিতেও দেখা যাইত। কোনো এক যুবককে শৌচের পর পদধৌত করিয়া দিতে কহিলে, কেন করিব বলায়—স্মিতমুখে কহেন, 'আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি, তো শালারা পাক দিয়ে মুতবি। তাই তোদের ভালোর জন্যই আমার আচারের প্রয়োজন।' বলরামবাবু মহা আচারী, শৌচের পর আপনাকে অশুচি ভাবিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকায় অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহাকে কৌশল ক্রমে স্পর্শ করিয়া কহেন—

'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
ওরে দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।'

ভক্তকে কৃতার্থ করণ

ভক্তকে কৃতার্থ করিবার অভিলাষে তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু এমন ভাবে, যাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, এবং আপনার আবশ্যকের অধিকও না লওয়া হয়। তেল মাখিবার ধুতিখানি জীর্ণ দেখিয়া মাস্টার মহাশয় (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক) দুইখানি কাপড় আনিলে, মাত্র একখানি গ্রহণ করেন এবং অনাবশ্যক বোধে অপরখানি ফিরাইয়া দেন। কাঞ্চন পরিহারে ঠাকুরের এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, জলপান করিবার জন্য ধাতুপাত্র স্পর্শ করিবামাত্রই হস্ত বিকল হইয়া যাইত, এই হেতু তিনি মাটির গেলাস ব্যবহার করিতেন। ইহা দেখিয়া ভক্ত শ্রীচুণীলাল বসু কাঁচের গেলাস আনিয়া দিলে, প্রফুল্লচিত্তে বলেন, 'বড়লোকের লক্ষ টাকার চেয়ে তোমার এ গেলাস আমার কাছে মূল্যবান।'

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কৃপণ ভক্ত শ্রীমণিলাল মল্লিকের হিতকমানায় কখনো কখনো কোনো দ্রব্য যেন জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতেন। ভুলক্রমে কোনো দিন জগজ্জননীর বাল্যভোগের প্রসাদ না আসিলে, দেবালয়ের খাজাঞ্চীকে কহিতেন, 'আজ কেন এমন হল'—অর্থাৎ তাঁহার জন্য বরাদ্দ প্রসাদ আসিল না কেন? ইহাতে বালকভক্ত যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ) কুণ্ঠাবোধ করিলে, ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, রাসমণীর যাবতীয় দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় নিবেদিত, সুতরাং আমি উহা গ্রহণ না করিলে তার উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হবে। তাই মন্দিরের সকল প্রসাদের দাবী করিয়া থাকি।

সঞ্চয়ে যাতনা

অমানুষিক ত্যাগ জন্য কাঞ্চন বা ধাতুপাত্র পরশে যেমন বেদনা পাইতেন, সঞ্চয়েও ততোধিক যাতনা বোধ করিতেন। একদিন ভক্ত শ্রীশম্ভূনাথ মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে যাইলে, পেটের পীড়া শুনিয়া শম্ভূবাবু ঔষধের জন্য ঠাকুরের বস্ত্রাঞ্চলে একটু আফিং বাঁধিয়া দেন। ঠাকুর বলেন, 'ওরে! খানিক দূর এসে দেখি দিক ভুল হয়ে গেছে। কেবল পাক দিয়ে ঘুরছি, আর নিশ্বাসও বন্ধ হয়ে আসছে। কেন এমন হল? ভাবতে ভাবতে মনে এলো শম্ভু যে কাপড়ে আফিং বেঁধে দিয়েছে, তাইতে এই রকম হচ্ছে। তখন আফিংটুকু ফেলে দিয়ে নিস্তার পাই ও স্বচ্ছন্দে ঘরে আসি।'

গৃহস্থের অর্থে মমতা

বায়ুপ্রধান ধাতুর জন্য পাছে অজীর্ণ রোগ হয়, তাই ঠাকুর লেবুর রস মাখিয়া অন্নাহার করিতেন। উহা কোনো না কোনো ভক্ত আনিত। কিন্তু উহাতেও এত মিতব্যয়ী যে,

যোগীন্দ্রনাথ লেবুর বুকাটি অধিক কাটিয়া ফেলায় কহেন, 'ওরে! গৃহস্থের রক্তওঠা কড়ি কোনো মতে অপব্যয় করতে নেই।'

তৃতীয় অধ্যায়

শরীরের যত্ন

ভাবভরে যাঁহার অঙ্গে বসন থাকিত না, অসাবধানতায় পাছে ভক্তকুলের কল্যাণাস্পদ তাঁহার দিব্যদেহে অসুখের সঞ্চার হয়, সেজন্য সদাই সতর্ক থাকিতেন। বলিতেন, 'যে বাক্সতে মাল (টাকাকড়ি) থাকে, তাকে যত্নে রাখা উচিত, নইলে চোরে চুরি করতে পারে।' বিলাসিতার অনাচারে নব্য বাবু আমরা যদি অসুস্থ হইয়া পড়ি, তাই আমাদিগকে তিনি বলিতেন, 'যত দিন ভগবান লাভ না হয় তত দিন শরীরের যত্ন নেওয়া আবশ্যক; দেখিসনে, পাড়াগাঁয়ে কাঁসারিরা গড়ন গড়বার জন্যে মাটির ছাঁচকে সাবধানে রাখে, কিন্তু গড়ন হয়ে গেলে তার ওপর আর লক্ষ্য রাখে না!'

জগজ্জননীর সন্তান

ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা—তিনি জগজ্জননীর গর্ভজাত সন্তান। বলিতেন, তমোমুখ-চৈতন্য গিরিশচন্দ্র তমোগুণী ভক্তির উচ্ছ্বাসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াও মাতৃ-উৎসন্ন করিয়া গালি দেওয়ায় তাঁহার ভয় হইয়াছিল পাছে জগন্মাতা কুপিতা হন, এবং তাহাতে গিরিশের অকল্যাণ হয়! দেখিয়াছি, এই জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করেন, 'মা! নেটো নোচা গিরিশ কি কবে তোমার মহিমা বুঝবে, নিজগুণে তাকে ক্ষমা কর।' জগদম্বার বালক বলিয়া—তাঁহার অনুজ্ঞা বিনা কোনো কার্য, এমন কি পান ভোজন বা পদবিক্ষেপও ঠাকুর করিতে পারিতেন না।

নিরভিমান

অহমিকাপূর্ণ মানব আমরা গুণবান হই বা না হই, জনসমাজে সমাদর ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের স্বভাবজাত। সর্বেশ্বর হইয়াও ঠাকুর এতই নিরভিমান ছিলেন যে, অধিক সময় ভক্তসঙ্গে একাসনে বসিয়া আনন্দ করিতেন। আবার ভক্ত-ভবনে গমন করিলে সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসন উপেক্ষা করিয়া, সাধারণের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে উপবেশন করিতেন। বাহিরে সাধুর মতো স্বাতন্ত্র্য-প্রকাশক বেশ না থাকায়, বরং পাগলের পারা দেখিয়া, এক সময় কলিকাতার কোনো সৌখীন বাবু তাঁহাকে বাগানের মালী ভাবিয়া ফুল তুলিয়া দিতে বলিলে—ঠাকুর হাসিমুখে তাহাই করেন। যাঁহাকে ফুল আনিয়া দিয়াছিলেন, বহুকালের পর পরিতৃপ্ত হৃদয়ে তিনি আমাদিগকে এই ব্যাপারটি বলেন। আবার কোনো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া তামাক সাজিতে বলিলে, সানন্দে তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন, এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

ভাবে মাতোয়ারা

সুরাপানে মাতাল হয় জানি, সুরা-মহিমায় গোস্বামী-তনয়কে 'কালী' 'তারা' বলিয়া আনন্দ করিতেও দেখিয়াছি। কিন্তু সুরা (কারণ) সেবন না করিয়া, কারণের কারণ আদ্যাশক্তি শ্রীকালীমাতার স্মরণে, নাম-গানে ও দর্শনে, মাতালের ন্যায় বেঁহুশ হওয়া জীবনে এই

প্রথম দেখিলাম। বুঝিলাম, আশ্চর্যময়ের সকলই আশ্চর্যময়! দিব্য সহজ মানুষ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মা কালীর মন্দিরে যাইতেছেন—বিষ্ণুঘরের নিকট যাইয়া এমন এক ভাবের উদয় যে আমাদিগকে ছাড়িয়া গোঁ-ভরে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। যতই মন্দিরের নিকটস্থ, প্রভুর গতি যেন ততই স্থির হইতে স্থিরতর। যেন আমাদের অদৃশ্য কোনো পদার্থরাশি ঠেলিয়া অতি আয়াসে অগ্রসর হইতেছেন; পুষ্করিণী বা নদীতে জলক্রীড়াকালে গভীর জলে দণ্ডায়মান হইয়া সন্তরণচেষ্টা, অর্থাৎ দাঁড়া-সাঁতার কাটিতে আমাদের গতি যেরূপ মন্থর হয়, ঠাকুরের গতি তখন ঠিক ঐরূপ। ক্রমে হেলিতে দুলিতে বা মাতালের মতো টলিতে টলিতে কোনোমতে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর পাগলের মতো বা বালকের মতো কখনো নৃত্য, কখনো বা মা কালীর সহিত অস্পষ্ট ভাবে বাক্যালাপ, আবার কখনো বা মহামায়ার হস্ত বা চরণ ধরিয়া টানাটানি; শঙ্কা হইত পাছে প্রতিমা বা ভাঙিয়া যায়! অর্ধঘণ্টা প্রায় এই ভাবে কাটিল, আমরা সকলে অবাক! ফিরিবার সময় একেবার বাহ্যজ্ঞানহারা, কিন্তু আনন্দে আনন অতিমাত্রায় উৎফুল্ল। পণ্যপূর্ণ বৃহৎ তরণীকে ক্ষুদ্র তরী (ডিঙ্গি) যেমন ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যায়, আমরা তদ্রূপ ভাব-ভরে উলঙ্গপ্রায় বিশ্বম্ভরকে অতি সন্তর্পণে তাঁহার আসনে আনয়ন করিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

সান্ধ্য-প্রণাম

সদাসর্বক্ষণ নিজ মহিমায় নিমগ্ন থাকিলেও ভক্তকল্যাণ-কামনায় ঠাকুর যেন জোর করিয়া অনেক সময় সহজ ভাবে বিরাজ করিতেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, সন্ধ্যা-সমাগমে কি জানি কি আকর্ষণে তাঁহার চিত্ত এমন এক ভূমিতে সমুত্থিত হইত যে, তখন তাঁহার 'আমি' 'তুমি' বা বাহ্য জগৎ কিছুই বোধ থাকিত না। ভাবাধিক্যে মন যখন পরম অবস্থায় বিলীন হইতে যাইত, পাছে জীব-কল্যাণ-সাধন ক্ষুণ্ণ হয়, বোধ হয় এই নিমিত্তই আসক্তি-শূন্য হইয়াও, প্রত্যাবর্তন কল্পনায় বালকের মতো মা শুক্ত খাব' 'তামাক খাব' বলিয়া একটা বাসনা প্রকাশ করিতেন। এই সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে এরূপ জ্যোতিঃ ও আনন্দের বিকাশ হইত যে, তাহা দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধচিত্তে ভাবিতাম, ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান; যেহেতু মানবে এরূপ মহাভাব কখনো সম্ভবে না। বহুক্ষণ দিব্যভাব সম্ভোগ করিয়া দ্বৈতভূমিতে ফিরিবার কালে, সর্বভূতে চিন্ময়ীকে দেখিয়া উল্লাসভরে বলিতেন—'ওঁ কালী ব্রহ্মময়ী, আনন্দময়ী, মা, তুমি, তুমি, তুহুঁ তুহুঁ, তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, জগৎ তোমাতে, তুমি জগতে, তুমি জীবাত্মা, তুমিই পরমাত্মা, তুমি স্বরাট, তুমিই বিরাট, তুমি নিত্য, তুমিই লীলা, তুমিই ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, তোমাকে প্রণাম, তুমিই গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, তোমাকে প্রণাম; তুমি ধর্ম, তুমি অধর্ম, তোমাকে প্রণাম; তোমার নানা ধর্মমতকে প্রণাম; সাধু, অসাধু, সকলকে প্রণাম। আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও প্রণাম।

শবরীর উপাখ্যান

ভগবান ভক্তের জাতিকুলের বিচার রাখেন না, কেবল তাহার ভক্তিরই মর্যাদা করিয়া থাকেন। এই হেতু কবি গাহিয়াছেন—'কৃষ্ণপদে যার মতি, কি করবে তার কুলজাতি।' যযাতি-সম্ভবা যে জন, কৃষ্ণ হন তার স্বজাতি।' নীচ জাতি হইলেও শবরীর পরা ভক্তিতে প্রীত

হইয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহার দত্ত ফল ভোজন করিলে শবরী আনন্দে এতই বিভোর হন যে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্রীচরণে নিজের প্রাণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। সুতরাং এরূপ ভক্তের চরিত আলোচনা করিলে আমাদের নীরস হৃদয়ে যাহাতে ভক্তি-রসের সঞ্চার হয়, তাই প্রভু আমাকে অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে শবরীর উপাখ্যানটি পড়িতে বলিলেন।

বইখানি খুলিয়া মূল পড়িব কিংবা অনুবাদ পড়িব জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, 'মূলটাই পড়—।' বিদ্যা বিনয় আনয়ন করে, আমার তো আর তাহা হয় নাই, স্কুলে দু'পাতা পড়িয়াছি মাত্র। তাই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মনে করিলাম—প্রভুর বিদ্যা তো আমারই মতো ; বলছেন—মূলটা পড়। অন্তর্যামী ঠাকুর আশ্রিতের মনোভাব জানিয়া মৃদুহাস্যে কহিলেন, 'আজ তোর কাছে আমাকে একজামিন দিতে হল।' তারপর বলিলেন, 'অমুক পাতার প্রথম শ্লোকটা এই, পঞ্চম শ্লোকটা এই ; আবার দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম ও শেষ শ্লোক এই না ?' শুনিয়া তো আমি অবাক—ঠিক যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল। তিনি আবার বলিলেন, 'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল আসবার আগে এখানে অনেক সাধু পণ্ডিত আসত, তাদের মুখে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত-পুরাণ, যা একবার শুনেছি, মার কৃপায় সে সব মনে গেঁথে গেছে।' পুনরায় বলিলেন, 'বেদ পুরাণ কানে শুনতে হয়, আর তন্ত্রের সাধন করতে হয়। কলিতে সকল দেবতাই নিদ্রিত—কেবল কালী ও গোপাল জাগ্রত।' আবার কহিলেন, 'পথে চলবার সময় ছেলে বাপের হাত ধরে, এটা-ওটা দেখতে আনমনা হলে হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায় ; কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, ইচ্ছা করে লাফালেও তার পড়বার ভয় থাকে না।' ঠাকুর আপন বোধে অভয় দান করিয়াছেন বলিয়াই অহমিকার জন্য তাহার পতন হইল না। বরং দিব্যজ্ঞান পাইল যে, ঠাকুরই অন্তর্যামী ভগবান এবং অদ্বিতীয় শ্রুতিধর।

তস্মিন তৃপ্তে জগৎ তৃপ্ত

অচিন্ত্য চরিতের অদ্ভুত আচরণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং তিনি কাহাকে কি ভাবে কৃতার্থ করিবেন, তাহা কল্পনারও অতীত। জগজ্জননীর আরতির সময় ঘড়ি ঘণ্টা বাজিলে, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়, বলে কত কেঁদেছি, তবে তো তোরা এসেছিস' বলিয়া একদিন যাহাকে আদর করিয়াছেন, সেই চির-দাস প্রণাম করিলে আজ তাহাকে যেন চিনিতে পারিলেন না, এবং অন্য দিনের স্নেহালাপ ও প্রসাদদানে পরিতৃপ্ত করিলেন না। আশায় বুক বাঁধিয়া সে অপেক্ষা করিতে থাকিল ; বেলা অবসানপ্রায়, মনোবেদনার সঙ্গে ক্ষুধার তাড়নায় চঞ্চল হইয়াও পড়িল। এমন সময় 'ক্ষিদে পেয়েছে' বলে ঘরের তাক হইতে ঠোঙামোড়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া খাইতে বসিলেন। পেটের জ্বালায় সে ভাবিল, ঠাকুর কি আর সমস্তই খাইবেন, অবশ্য প্রসাদ দিবেন। কিন্তু বঞ্চিত হওয়ায় তাহার মনে উষ্মা হইল, কিন্তু কি করিবে ? মিষ্টান্নগুলি সমস্ত খাইয়া ঠোঙাটি চুরমার করিয়া, বালকের মতো 'দূর যা' বলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 'ওরে ছোঁড়া ! একটু জল দে তো খাই !' জলপান করিয়া যেমন বলিলেন, 'আঃ, পরিতোষ হলাম,' আশ্চর্যের বিষয়, ঐদণ্ডে তাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল, এবং পরিতৃপ্তি লাভ করিল। যদি প্রভুর এই দিব্য আচরণ না দেখিতাম, তাহা হইলে দ্রৌপদীর শাক-কণাতে পরিতৃপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সশিষ্য দুর্বাসা ঋষির পরিতোষবিধান যেন রূপক বলিয়া বোধ হইত।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাব বুঝিতে অক্ষম

ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান যদি আত্মপ্রকাশ না করেন, মানবের সাধ্য কি যে, তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে? বিশেষতঃ এবার মাধুর্যপূর্ণ লীলায় দিব্য এবং মানব-ভাবের এমত অপূর্ব সমাবেশ, যাহা শতবার দর্শন করিয়াও অল্পবুদ্ধি আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই—ইনি কে? ভগবান না মানব? সুতরাং আমাদের অবস্থা ঠিক 'বাঁশবনে ডোম কাণার' মতো। কিন্তু কি জানি প্রভু এমত এক অনির্বচনীয় স্নেহডোরে বাঁধিয়াছেন, যাহাতে দৃঢ় ধারণা, ইঁহার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা উপভোগ করিয়া যদি লক্ষ জন্মও হীনগতি হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়।

অহেতুক দয়াসিন্ধু

অনুচর হৃদয় বুঝিতে না পারিয়া একদিন ঠাকুরকে কহেন, 'মামা! তুমি তো সাধু হইয়াছ, তবে আর রাণীর দেবালয়ে কেন? চল কোনো নিভৃত স্থান বা পাহাড় পর্বতে চলিয়া যাই।' জীবদায়ে দায়ী দয়ানিধি বলেন, 'ওরে! জগদম্বা দেখাচ্ছেন (কলকাতার দিকে হাত বাড়াইয়া) যে, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার আবর্তে পড়ে, ভগবানকে ভুলে লোকগুলো হাবুডুবু খাচ্চে, এদের উদ্ধার না করে আমি কি করে অন্যত্র যেতে পারি? বরং এদের কল্যাণকল্পে আমাকে যদি বার বার এই ক্লেশকর মানবদেহ ধারণ করতে হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।'

আত্মারাম

যিনি আত্মারাম, তাঁহার কি আর বিষয়ভোগে ইচ্ছা হইতে পারে? কেবল ভক্তকে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিবেদিত দ্রব্যনিচয় গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেন। সখীভাবে সাধনসময়ে ভক্ত মথুরানাথ তাঁহাকে মূল্যবান বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়াছেন, অভিলাষ করেন যে, বাবার শ্রীঅঙ্গে উৎকৃষ্ট শাল আবৃত করিয়া অর্থের সার্থকতা করিবেন। তাই কাশ্মীর-দেশীয় মূল্যবান শাল আনিয়া প্রার্থনা পূর্বক দিব্যদেহ আবরণ করিয়া দেন এবং ঠাকুরও উহাতে প্রীতি প্রদর্শন করেন। পরে উহাকে পদদলিত করিয়া কহিতে থাকেন—'ইহার নাম শাল, গায়ে দিলে অহংকার হয়। সুতরাং এমন জিনিসকে পোড়াইয়া ফেলা উচিত' বলিয়া উহাকে তখনই দগ্ধ করিলেন। ইহাতে দেখাইলেন যে, ভগবান কি বসন-ভূষণে তৃপ্ত ঃ কেবলমাত্র ভক্তিতেই পরিতৃপ্ত।

প্রলোভন-বিজয়

ভগবৎ উদ্দেশ্যে বহ্নিপূজাকালে যাঁহারা যজ্ঞাগ্নির সন্নিকটস্থ তাঁহারা যেরূপ তাপ বোধ করেন, পশ্চাৎস্থিতগণ তাদৃশ উত্তাপ প্রাপ্ত হন না। বোধ হয় ইহাই আলোচনা করিয়া মথুরানাথ একদিন ঠাকুরকে নিবেদন করেন, 'বাবা! তোমার কৃপায় সাধ্যমতো তোমার সেবা করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, কিন্তু আক্ষেপ, পুত্রগণ ভাগ্যদোষে তোমার ভক্ত হইতে পারিল না, সেজন্য তাহারা যে তোমার সেবায় মনোযোগী হইবে, তাহা তো মনে হয় না। অতৃপ্ত কামনাই জীবিতাশা ও পরজন্মের নিদান, তোমার অনুকম্পায় দাসের সকল সাধই মিটিয়াছে। অনুমান আর অধিক দিন বাঁচিব না। প্রার্থনা যে, বিষয় বৈভবসহ এই দেবালয় শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত হই।' কঠোর সাধনায়

মহামায়ার ইচ্ছায় যিনি বিশ্বমোহিনী মায়ার অধিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এমন কি নিদ্রাকালে কাঞ্চন স্পর্শ করাইলে যাঁহার অঙ্গবৈকল্য ঘটিত, সেই ত্যাগ-ঘনমূর্তি ঠাকুর কি আর প্রলোভনে মোহিত হইবেন ? সুতরাং প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই তালপত্রযোগে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় অতি তপ্ত হইয়া মথুরকে কহেন, 'জগন্মাতা কৃপা করিয়া আমাকে বিষয়-বৈরাগ্য দিয়াছেন, আর তুই শ্‌লা কি না আবার তাই দিয়ে আকৃষ্ট করতে এসেছিস ?' এই বলিয়া গৃহস্থিত, মার্জনি (ঝাঁটা) লইয়া প্রহারোদ্যত হইলে ভীত মথুর দ্রুত পলায়নে পরিত্রাণ পান এবং ভয়ে তিন দিন যাবৎ ঠাকুরের নিকট আসিতে সাহস করেন নাই।

সকলই রাম

আমাদের সকলেরই আক্ষেপ যে আমরা কেহ কখনো ঠাকুরকে সর্বপ্রথমে প্রণাম করিতে পারি নাই ; বরং তিনিই আমাদিগকে দেখিবামাত্রই নমস্কার সারিয়া রাখিয়াছেন। অনুযোগ করায় বলেন, 'ওতে তোদের অপরাধ হবে না। তোদের সকলকে আমি রাম বলে দেখি, তাই প্রণাম করি। দেখি, কেহ সাধু রাম ; কেহ বা লোচ্চা রাম বা খানকি-রাম ; সকলেরই অন্তরে রাম বিরাজ করছেন। যেদিন তোদের হরে রামা প্যালা বলে দেখব, সেদিন আর তোদের সঙ্গে আলাপ করতে বা তোদের মুখ দেখতে পারব না।'

গঙ্গাভক্তি

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমরা অনেকেই পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকে সাধারণ নদী বলিয়া দেখি ; তজ্জন্য উহার অপরিষ্কার জলে স্নানে অরুচি। ঠাকুর কিন্তু গঙ্গা-বারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বারি বলিয়া দেখিতেন। বলিতেন, জীব উদ্ধারকল্পে পরমাত্মা দ্রব হইয়া গঙ্গাবারিরূপে মর্ত্যধামে প্রবাহিত হইয়াছেন। ইহার পবিত্র নীরে বা তীরে মরণে মোক্ষ, আর স্নান পানে শান্তি ও পবিত্রতা। ব্রহ্মবারি-সন্নিধানে ভগবৎকথা ভিন্ন অন্য কথা কহিতে নাই—। দেখিতে কোনো এক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আগমন করিলে কহেন, 'মহামায়া দেখাচ্ছেন যেন তোমার কি একটি বিষম দোষ আছে। লজ্জাবোধে যদি আমাকে বলতে না পারো, ব্রহ্মবারির নিকট যাইয়া বল এবং তাঁর পবিত্রবারি এক ঘোট (গণ্ডুষ) পান করে এস সকল দোষ ঘুচে যাবে।' কিন্তু ভাগ্যদোষে প্রভুর আজ্ঞা অবহেলায় ঠাকুর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং আমাদিগকেও তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেও অনুমতি করেন নাই। অনুসন্ধানে জানা যায়, মাতৃদোষে সন্তান দোষী। আবার ভক্তগণমধ্যে দৈবাৎ কেহ কখনো কোনো অপকর্ম করিলে বা অশুদ্ধান্ন আহার করিলে শুনিয়া বলিতেন, 'যা এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পান করে আয় এখনি পবিত্র হবি।' জীবোদ্ধার বাসনায় নারায়ণী-তনু দ্রব করিয়া যিনি গঙ্গারূপে উদ্ভূত এবং শিবরূপে যিনি সেই স্বর্ণনদীকে সাদরে শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারই কেবল ঈদৃশ গঙ্গাভক্তি সম্ভবে।

ভক্তের সন্তাপহরণ

বাহিরে আড়ম্বর সত্ত্বেও অমৃতত্ব লাভ বিনা আমরা অন্তরে মৃত ; সুতরাং মৃত ব্যক্তি শক্তিহীন এবং তাহার কথায় কাহারও কল্যাণ হয় না। অমৃতের উৎস ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ কথায় সকলেরই চৈতন্য ও শান্তিলাভ হইত। ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের পুত্র-বিয়োগ হইলে ঠাকুরকে অতি আপনার জানিয়া প্রবোধলাভের আশায় তাঁহার সকাশে

উপস্থিত হন। মণিবাবু যতক্ষণ তাঁহার শোক-কাহিনী কহিতে থাকেন, সৃষ্টিছাড়া ঠাকুর আমাদের মতো মৌখিক শিষ্টাচারে অন্ততঃ 'আহা মরি, চুঃ চুঃ' বলিয়া কোনো প্রকার সমবেদনা প্রকাশ না করায় মনে করি যে, ইঁহার কি এমন একটুও সৌজন্য নাই যে, অন্ততঃ দুটা মিষ্টি কথা বলেন। ঠাকুর তো আর আমাদের ন্যায় হৃদয়শূন্য বাক্যবাগীশ নহেন। যখন দেখিলেন যে, মণিবাবুর শোক-কলস খালি হইয়াছে এবং উহাতে পূর্ণভাবে শান্তি-বারি গ্রহণ করিতে পারিবেন, তখন গাত্রোত্থান করিয়া তাল ঠুকিয়া গান ধরিলেন ঃ

'জীব সাজো সমরে, ওই দ্যাখ রণবেশে, কাল প্রবেশে ঘরে ;
ভক্তিরথে চড়ি ধরে জ্ঞান-তূণ, রসনা-ধনুতে জুড়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ী নাম—ব্রহ্ম অস্ত্র তার সংযোগ করে'—

কি আশ্চর্য ! শক্তিমানের ওই শক্তিপূর্ণ গীত শ্রবণে মণিলাল বলিল, আপনার করুণায় আমার পুত্রশোক দূর হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জন্মোৎসব

আজ রবিবার, ভগবানের জন্মোৎসব। সাধারণ বুদ্ধিতে বন্ধ্যার পুত্রসম্ভবের ন্যায় জন্ম-মরণবিহীন ভগবানের জন্মগ্রহণ যখন অসম্ভব, তখন তাঁহার জন্মোৎসব যেন কেমন কেমন বোধ হয়। মানবের চিন্তাধারা যতদূর প্রসারিত হউক না কেন, অঘটন-ঘটনকারিণী মহামায়ার গণ্ডিকে অতিক্রম করিতে পারে না ; সুতরাং মহামায়ার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়। কারণ, মহাপ্রলয়ে যিনি আপনারই রূপান্তর বহু বর্ণবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় আঁধার বরণে বিলীন করিয়া অব্যক্ত ভাব ধারণ করেন, আবার ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে পুনঃ প্রকট করা বা আপনিই জীবজগৎরূপে রচিত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ; তখন শিবচতুর্দশীর আঁধার অবসানে, জ্ঞানালোকের উন্মেষ-রূপ শুক্লা দ্বিতীয়াতে, আত্মরতি বা জীবকল্যাণ উদ্দেশে, অথবা নিজ সৃষ্টির পরিদর্শন-মানসে তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহরূপে আবির্ভাব কদাচ অসম্ভব নহে।

সুতরাং, অরূপের রূপধারণ উপলক্ষে শুভ উৎসব দিন অতি-পবিত্র ও অশেষ কল্যাণকর। যেহেতু ঐদিনে তিনি আত্ম-মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া কৃপা-দরশন ও পরশন দানে ভক্তগণকে আপনভাবে ভাবিত করেন। কাজেই এই শুভদিনে প্রভুর পুণ্যদর্শন ও অযাচিত অনুকম্পা লাভ ভক্তগণের নিকট তাহাদের জীবনের একটি বিশেষ সুযোগ। কিন্তু নবাগত এক যুবক, কি জানি যাহাকে প্রভু আপন করিয়া লইয়াছেন, পাছে এই পুণ্যদিনে সে শ্রেয়লাভে বঞ্চিত হয়, তাই অধিবাস-বাসরে নিমন্ত্রণছলে তাহাকে কহেন, 'হ্যাঁগা, এরা (ভক্তেরা) কাল আমার জন্মোৎসব করবে ; তুমি আসবে না ?'

প্রাতঃকাল হইতে নানাভাবের ও নানাবর্ণের ভক্তসমাগম, ছোট বড়ো সবাই সমান ; যেহেতু ভক্ত ভগবৎজাতীয়। আবার 'বহুজনবল্লভ সো বর কানু' আপন বোধে সকলকেই আপ্যায়ণ করিতেছেন, যেন আনন্দের হাটবাজার, সকলেই বিভোর। যদিও দর্শন স্পর্শন ও আলাপন দ্বারা ভক্ত-অন্তরে প্রবেশ-পূর্বক তাহাদের আত্মার উন্নতিবিধান করিতেছেন, তথাপি তাঁহার সত্তাস্বরূপ প্রসাদ বিতরণ না করিলে অন্নগতপ্রাণ তাহাদের দেহের কিরূপে পুষ্টিসাধন হইবে, এই ভাবিয়া ভক্তপালক (ঠাকুর বলিতেন) রামদাদা (ডাক্তার রামচন্দ্র

দত্ত—কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুবক গুরু, ইষ্ট বা বিশেষ বিশেষ দেবতার জন্ম বা পর্বদিনে উপবাসই ব্রতবোধে—প্রসাদ ধারণ করিতেছে না দেখিয়া, তাহাকে কৃতার্থ করিবার অভিলাষে ঠাকুর আপনি খাইতে খাইতে তাহার নিকট আসিয়া কহিলেন—'তোর ভিতর আমি রয়েছি, তুই না খেলে আমার যে কষ্ট হবে' বলিয়া তাহাকে ভুক্তাবশেষ দান করিলেন এবং সেও বিস্মিত হইয়া প্রভুর প্রসাদ গ্রহণে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিল।

প্রসাদ ধারণের পর মনের আনন্দে ভবনাথ গীত আরম্ভ করিলেন—

'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার!
তুমি হে অমৃত-লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ ও দীনশরণ দীনজনার।'

ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রসন্নবদনে বরাভয় দানে সকলকে মধুময় করিলেন। চন্দ্র-কিরণ যেমন স্নিগ্ধ আলোক দান করে, প্রভুর রূপ-জ্যোতিঃ ঘরটিকে ঠিক সেইমত আলোকিত করিয়াছিল এবং তাঁহার অঙ্গকান্তিও পরিহিত পট্টবসনের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

ক্রমে বহু ভক্তের আগমনে গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় উত্তর দিকের বারান্দাতে কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। তারা-বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভুও ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্তন শুনিতে বসিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-মিলন পালা আরম্ভ হইল। গীতটির মর্ম এই—

'বলাই মাতিল রে।'

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—

'কৃষ্ণ-মধু পানে বলাই মাতিল রে।'

তাই ত্বরান্বিত হইয়া যমুনা-পুলিন দিয়া যাইতে যাইতে যমুনার জলে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিতেছেন ঃ—

আরে কে কে, কে কে, তু তু, তু তু, দে দে, দে দে, প প, পরিচয়। ঠাকুর ভাবের ঘোরে আঁখর দিতেছেন—

একা আমি বলাই গিরিধারীর বড় দাদা ব্রজে আর কেবা বলাই আছে? শ্রীদামাদি রাখালগণ আগেই আসিয়াছেন, বলরামও মিলিলেন, কিন্তু শ্রীমতীর অভাবে শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে ব্যথা পাইতেছেন, বুঝিয়া প্রিয়সখা সুবল শ্রীমতীকে আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কীর্তন তো অনেক স্থানে শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর কীর্তন তো আর কোথাও শুনি নাই। মধুর হইবে না বা কেন? যে কানু ছাড়া কীর্তন হয় না, আজ ভাবাবিষ্ট সেই কানুই কীর্তন শুনিতেছেন এবং মধুরতর করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে আঁখরও দিতেছেন! গায়ক নরোত্তম ভাবে গদগদ হইয়া দীর্ঘশিখাসমন্বিত মস্তক সঞ্চালনে তৃপ্তিসূচক 'আ আ' করিতে লাগিলেন। ভক্তমুখে ভজন শ্রবণে ঠাকুরের বদনকমলে আনন্দ-বিকাশ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন সে আনন্দ-সুধা সকলকেই বিভোর করিয়াছে।

অনেক ভক্ত উপস্থিত, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিহনে এ আনন্দ যেন আলুনি বোধ হইতেছিল—তাই প্রভু এক একবার বলিতেছিলেন, 'এখনো নরেন্দ্র এলো না?'

আবার গান চলিতেছে—শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিল করিবার বাসনায়, সুবল

একটা বাছুর বুকে নিয়ে মা বলে জলপান করতে চাইলে জটিলা বলিল, 'সুবল রে, তোর সবই গুণ। (অমনি ঠাকুর আঁখর দিলেন—'তবে কালার সঙ্গে বেড়াস ওই যা দোষ।') পাকশালায় যাও, বধূর কাছে জল পান করবে।' ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—'সুবল তাই তো চায়।' সুবল যাইয়া দেখেন, শ্রীমতী পাকশালায় বসিয়া উনানের ধুঁয়ার ছলে কৃষ্ণবিরহে অশ্রুপাত করিতেছেন।

সুবলের আগমনে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া শ্রীমতী সমরূপী সুবলের সহিত বেশ পরিবর্তন করিয়া কহিলেন,—'সুবল সবই হল, আমি যে নারী কিরূপে বক্ষ ঢাকি বল?' প্রভু আঁখর দিতেছেন—'চিন্তা নাই, উপায় করে এসেছি—বাছুয়াকে বুকে এনেছি, ঐ দেখ দ্বারে বেঁধে রেখেছি, এরে বুকে করে তুমি চলে যাও।'

কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্তা শ্রীমতী কুল শীল লাজ পরিত্যাগ করিয়া পুরের বাহির হইলে ঠাকুর সোৎসাহে বলিতেছেন—'তোরা আর কিছু নিস্ বা না নিস্, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই টানটুকু নে—এই রকম টান না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।'

এমন সময় নরেন্দ্রনাথ আসিয়া প্রণাম করিলেন। উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুর তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিলেন। প্রেমময়ের পরশে বেদান্তবাদী নরেন্দ্রনাথের শুষ্ক হৃদয় বিগলিত হওয়ায় নেত্রপথে ধারা বহিতে লাগিল। ধূমায়িত বহ্নি বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইলে যেমন দিক আলো করে, প্রভুর রূপও তখন সেইমতো চারিদিক উজ্জল করিয়াছিল। নরনারায়ণের মধুর মিলনে মোহিত হইয়া সকলে হরিধ্বনি করায় কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল। ঠাকুর তখন নরেন্দ্রনাথকে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নানাবিধ আলপনান্তে প্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

ইত্যবসরে রামলালদাদা মা কালীর অন্নপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত। সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব বলিয়া কোনো ভক্ত গৃহ মার্জন করিল, কেহ বা আসন পাতিল, কেহ পানীয় জল, কেহ আচমনীয় জল, কেহ বা তাম্বুল লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিল। মধু-লোভে মক্ষিকাকুল যেমন কমলকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়, ভক্তগণ প্রসাদ-লোভে তেমনই ঠাকুরকে বেস্টন করিয়া বসিলেন। দু-চার গ্রাস খাইয়া আবদার ধরিলেন—নরেন্দ্রের গান শুনিতে শুনিতে আহার করিব। ঠাকুর বলিতেন, আমাকে তাঁর গুণগান শুনাবার জন্য মহামায়া নরেন্দ্রকে অখণ্ডের ঘর হইতে ধরাতলে এনেছেন। ওর গান শুনলে আমার ভিতর যিনি, তিনি ফোঁস করিয়া উঠেন, আর আমি অব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া যাই। এইরূপ ঘটনা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া—অনুরোধ করি—আহারান্তে গান শুনিবেন। কিন্তু যিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার সংকল্প কি বিফল হইতে পারে? তাই বালকের মতো বার বার আবদার করায় নরেন্দ্রনাথকে অগত্যা গান করিতে হইল।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহা-বাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে!
চিরশান্তি পরিমল অবিরত যায় ভাসি।
মহাকালী রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে মাগো; কে তুমি গো একা বসি/
অভয় চরণ-তলে, প্রেমের বিজলী খেলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

গান শুনিয়াই নিস্পন্দ দীপশিখার ন্যায় প্রভু সমাধিস্থ। অন্নরস উপেক্ষায় আনন্দরস আস্বাদনে পুলকে অঙ্গ রোমাঞ্চিত। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিল। প্রভু ইহাতে দেখাইলেন যে, কেবল অন্নরসে প্রাণ ধারণ হয় না, আনন্দই মূল। আনন্দই ব্রহ্ম, এই আনন্দরসে ভূতগণ জাত হইয়া আনন্দেই জীবন ধারণ করিতেছে। আবার অন্তকালে সেই পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। ঠাকুর বলিতেন, তাই আমরা অনেকেই জানি যে, যে-ভাব অবলম্বনে তাঁহার অন্তরাত্মা পরমাত্মাতে একীভূত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক মহাবাক্য বা গীত শুনাইলে তাঁহার চিত্ত ধীরে ধীরে বহির্জগতে ফিরিয়া আসিবে। সেই হেতু নরেন্দ্রনাথ গাহিলেন—

অন্তরে জাগিছ মা গো! অন্তরযামিনী।
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী।
অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহমতি।
প্রেমে আহা! একেবারে যেন পাগলিনী॥
বুঝেছি এবার সার, আমি মার মা আমার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী।
করি মাতৃ-স্তন্য পান, হব বীর বলীয়ান।
আনন্দে বলিব জয় ভক্ত-প্রসবিনী॥

শুনিতে শুনিতে ওঁ কালী, ব্রহ্মময়ী, আনন্দময়ী বলিয়া ঠাকুর ক্রমে সহজাবস্থায় আগমন করিলেন। তদনন্তর হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে শুভ্রবসন পরিধান-পূর্বক ভক্তসঙ্গে পুনরায় মধুর আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেলা প্রায় দুইটা, এইবার পঙক্তি-ভোজের উদ্যোগ। চিড়া, দহি ও চিনি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া, ঠাকুর বালকের মতো বলিলেন, রামের কি ছোট নজর, আমার জন্মোৎসবে কিনা চিড়ের ব্যবস্থা করল। ভদ্রসন্তান ভক্তগণের পক্ষে শীতের দিনে চিড়া-দহির ফলার সুখজনক নহে ভাবিয়া তাহাদিগকে আনন্দ-ভোজন করাইবার অভিলাষে সানন্দে গীত ধরিলেন—'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।' (দুঃখের বিষয় গানের অবশিষ্ট অংশ স্মরণ নাই)। রঙ্গরসে গীতটি জমাইবার জন্য যখন আরে আরে বলিয়া আঁখর দিতেছেন, এমন সময় কোনো এক ভক্ত হরি হরি বলায় রসভঙ্গ হইলে সহাস্যে কহেন—শালা এমন অরসিক যে, রসগোল্লা না বলে হরি হরি বললে। এমন সময় একজনকে দধি পরিবেশন করিতে দেখিয়া উল্লাসে হাত তুলিয়া গাহিতে লাগিলেন, 'দে দৈ দে দৈ আমার পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়িহাতে। ওরা কি তোর বাবা খুড়ো, (তাই) ওদের পাতে ঢালছিস হাঁড়ি হাঁড়ি॥' অরসিক ভক্ত রসজ্ঞান লাভে রসগোল্লা রসগোল্লা বলিয়া জয় দিলে, একটা হাস্যরোল সমুত্থিত হইল। ব্রাহ্মণসন্তান—অনেক স্থানে বিবিধ মিষ্টান্ন-সমন্বিত নিমন্ত্রণ খাইয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে এরূপ আনন্দ-ভোজন কোথাও ভাগ্যে ঘটে নাই। আহারান্তে বিশ্রামলাভের পর জনতা ভঙ্গ করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীচরণে প্রণতি-পূর্বক, রণমুখো ঘোড়ার মতো ঘরমুখো বাঙালী আমরা প্রভুর আচরণ স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

নূতনের সবই নূতন

পুরাতন হইয়াও যিনি নূতন, তাঁহার কার্যকলাপ সবই নূতন। কে কোথায় দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, ঐশ্বর্য (বিভূতি) কিংকরের ন্যায় অনুগমন করিলেও সযতনে উপেক্ষা ; মাধুর্যে আত্মবিস্মৃত বালক, নিরক্ষর হইয়াও সমগ্র অক্ষরের (শাস্ত্রের) সার্থকতা-প্রতিপাদন ; অভিমান-নাশ-বাসনায় সাধারণের শৌচস্থান মার্জন ; ঐকান্তিক অনুরাগে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন, বিশ্ববিমোহিনী মায়াবিজয়ে কামিনী-কাঞ্চন বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ ; ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রা স্পর্শনে অঙ্গবৈকল্য ; চতুরাশ্রমের মর্যাদা-রক্ষণে দারপরিগ্রহ করিয়াও পত্নীকে ও সমগ্র নারীজাতিকে ভগবতীর প্রতিমা বোধে ভক্তি-পূজা ; আবার শাস্ত্র-গৌরব-বৃদ্ধি বাসনায় গুরূপদিষ্ট সাধনপ্রণালীতে অল্পকাল মধ্যেই শিবত্ব লাভ ; সন্ন্যাস গ্রহণে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে এমত ভাবে বিলীন যে, জীবকল্যাণ জন্য যষ্টিপ্রহারে বাহ্যাবস্থায় আগমন ; সনাতন ধর্মের বিবিধ ভাব এবং তৎবহির্ভূত অন্যান্য ধর্মমতানুষ্ঠানে সচ্চিদানন্দের অশেষবিধ ভাব উপভোগপূর্বক সাঙ্গ সকল ধর্মকে সম্মিলিত করিয়া, 'যত মত তত পথ' এই অভিনব সত্য প্রচারে বিবিধ ধর্মভাব-সমন্বিত জগতে শান্তি আনয়ন ; সর্বেশ্বর হইয়াও জীবদায়ে ঋণী হইয়া, দীনভাবে যিনি নিত্য কত নব ভাব প্রকাশ করিতেন, সেই ভাবময় ঠাকুর আবার যে একটি কল্যাণকর নূতন ভাব প্রকট করিবেন, যদাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান মানব সর্বভূতে ভগবদ্দর্শনে কৃতার্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

রামকৃষ্ণ মিশন

তাই বুঝি ঠাকুর কোনো একদিন অপরাহ্নে দিব্যভাবে আপন মনে কহিতেছেন, (কাছে নরেন্দ্রনাথ ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না) জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-পূজন। দুঃশালা জীবে দয়া, এত অহঙ্কার ? সৃষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে তার ঠিক নাই, তুই আবার জীবে দয়া করবি ? নিস্তব্ধ, পরে—না না জীবের সেবা, ক্ষণ পরে আবার বললেন—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা ! তবে তো হবে ? একটা কথা আছে, যার যেমন মন, তার তেমন ধন। নূতন ভাব শুনে আমি হতভম্ব কিন্তু ধীমান নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া কহিলেন, ভাগ্যে ভাই ! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন, তাই আজ নূতন আলোক পেলাম। মনে রাখ, যদি বাঁচি, আর প্রভু কৃপা করেন, এই মহাবাক্যটি কার্যে পরিণত করতে পারলে ধন্য বোধ করব। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই মহাবাক্য অবলম্বনে, তাঁহার শ্রীপদে আত্মবলিদাতা শ্রীমান শরৎচন্দ্রের ভারসহ শিরে কল্যাণকর রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন ; এবং শরৎচন্দ্রও সানন্দে উহা আজীবন বহন করিয়াছেন। কিন্তু হায় ! একের অভাবে, বড় সাধের সেই রামকৃষ্ণ মিশনে যেন একটা মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আদর্শচ্যুত হইয়া সেবাস্থলে দয়াকে আসন দিয়াছি।

সমদৃষ্টি

আমাদের ন্যায় নিম্নস্তরস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সমদরশন একটা কথার কথা মাত্র। বরং যাঁহারা মনুমেণ্টে বা কাশীতে বেণীধ্বজায়, অথবা কোনো উচ্চ পর্বত-চূড়ায় উঠিয়াছেন, তাঁহারাই

নিম্নস্থিত ছোট বড় বৃক্ষ ও উচ্চাবচ প্রাসাদ বা কুটির সবই সমভাব দেখিয়া সমতার একটা আভাস পাইয়াছেন। প্রাণপাত তপস্যায় বা ঈশ্বরানুগ্রহে যাঁহারা উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বভূতে পরমাত্মার বিকাশ দেখিয়া প্রকৃত সমদর্শী হইয়াছেন। যোগ যাঁহার অঙ্গ, জ্ঞান যাঁহার হৃদয়, ভক্তি যাঁহার আবরণ, সিদ্ধি যাঁহার করতল, সম্পদ (বিভূতি) যাঁহার কিঙ্কর এবং যাঁহার প্রসন্নতাই মানবের চির অভীপ্সিত মোক্ষ, কেবল জীবন কল্যাণ জন্য যাঁহার অমানুষিক সাধনা, সেই করুণাময় প্রভু যে সদাসর্বক্ষণ পূর্ণমাত্রায় সমদর্শী হইবেন—ইহা আর আশ্চর্য কি ? এই হেতু ঠাকুর পুরুষ, নারী, সাধু ও অসাধু সকলকেই সমভাবে দেখিতেন ও স্নেহ করিতেন বলিয়াই সকলে তাঁহার পাদমূলে আশ্রয় লইয়া শান্তি লাভ করিত।

ভুবনমোহন

দেব বা দেবীসম পুরুষ বা নারী ভক্তের তো কথাই নাই, ভাগ্যদোষে যাহারা সমাজচ্যুতা, দেখিয়াছি—এমন রমণীরাও কোনো দিন তাঁহার করুণালাভে বঞ্চিত হয় নাই। একদিন প্রাতে কতিপয় অভিনেত্রী তাঁহার পুণ্যদর্শনে আসিয়া পূজাকল্পে তাঁহাকে বিবিধ অভিনয় দেখাইলে প্রীত হইয়া কহেন, কৃপা তো আছেই, উপরন্তু পুরস্কার-স্বরূপ আমারও একটু অ্যাক্‌টিং দেখিয়া যাও। ঠাকুর তখন হাব ভাব ও অঙ্গহেলন সহ এমন কীর্তন* অভিনয় করেন, যাহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া কহিল, ঠাসঠমকে পুরুষের মন মোহিত করি বলিয়া আমাদের নাম মোহিনী ; কিন্তু আপনি যেরূপ অভিনয় করিলেন, ইহাতে আমরা হার মেনেছি। আমাদের ধারণা হইয়াছে যে আপনিই ভুবন-মোহন।

চৈতন্য-শরীর

অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কেহ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না। অদৃষ্ট বশতঃ আশ্রয় পাইয়াছি বটে, কিন্তু তপস্যার অভাবে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছি না, জানিয়া ঠাকুর আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেছেন ; তাই শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন,—জগন্মাতা এই শরীরটা এমন উপাদানে গড়েছেন যে, উৎকট তপস্যায় আর ভাবসমাধিতে অস্থিগুলো চূর্ণ হলেও সাধারণের মতো বেঁচে আছি। যে মহাভাবের বন্যা ইহার উপর দিয়ে গেছে, মানুষ তার কণামাত্রও একদিন ধারণ করতে পারে না। ইহাতে যেন ঠারে ঠোরে বলিলেন—তাঁহার চৈতন্য-শরীর।

পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থ

বহুদিন ধরিয়া মানব-কল্যাণ জন্য অবিরামভাবে বেদমূর্তি প্রভু যে উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন, তাহার কিয়ৎপরিমাণও সংগ্রহ করিতে পারিলে পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থ সঙ্কলন হয় এবং উহার অনুশীলনে কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়।

আশ্রিত পালক

কেবলই যে ধর্মদানে সমুন্নত করিতেন, এমত নহে। কিরূপে আশ্রিত জনের পরিবার-বর্গেরও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন হয়, সে বিষয়েও জাগরূক থাকিতেন। তাই একজনকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি দুকুড়ি সাতের খেলা পারিব অর্থাৎ আমার আশীর্বাদে তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। কিন্তু তিনকুড়ি সাত পারিব

* গীতটি—তীরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে, লয়ে কমলিনীবে নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে।

না অর্থাৎ তোদের নবাবী করা চলবে না।

বিবাহ হয়েছে ক্ষতি কি ? অদৃষ্টে ছিল, হয়েছে। স্ত্রী যদি বিদ্যাশক্তি হয়, ঈশ্বর-আরাধনায় সাহায্য করে, অবিদ্যা শক্তি হলে ব্যাঘাত জন্মায় ; কিন্তু অনুরাগ থাকলে কেহ কিছুই করিতে পারে না।' স্ত্রীকে যত্ন করতে হয়, সৎ শিক্ষা দিয়ে তাকে আপনার মতো করে নিতে হয় ; তা বলে শ্রীযুত কি না স্ত্রীর গোলামী করা ভালো নয়। সতী স্ত্রীকে আজীবন ভরণ-পোষণ করতে হয়, সমর্থ হলে তার জন্যে কিছু সংস্থানও করতে হয়। লেখাপড়া শিখে যত দিন উপায় করতে না পারে, তত দিন ছেলেদের পালতে হয়। পাখিরা আপনারা না খেয়েও ছানাকে আধার দেয়, সঙ্গে নিয়ে চরা করতে শিখায়, যাই 'খুঁটে খেকো' হল, অমনই ঠুকরে তাকে বিদেয় করে। যত কিছু ছাড় না, পেট তো ছাড়তে পারবি নে ? এক ঘর ছেড়ে কত ঘর ঘুরতে হবে। রসদ মজুত থাকে বলে, কেল্লায় থেকে লড়াই করাতে জিত হয়। ঘরে থেকেও ভগবানের আরাধনা হয়, দেখ না ঋষিরাও তো অনেকে গৃহী ছিলেন। (রহস্য করিয়া) এত যদি গোর মনে ছিল তোর, তবে কেন বাড়ালি নদের পরিবার। আবার বলেছেন—মনে করিসনে তুই ফ্যালনা তুই যে বিশ্বরূপের অঙ্গ, যদি এখন শরীর ছাড়িস, বিশ্বরূপের অঙ্গহানি হবে যে! আবার বলিতেছেন—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-ফলে সরলতা লাভ হয়। সরল-স্বভাব হলে ভগবান-লাভ সহজ। তুই ছোঁড়া এমন হাউড়ে (সরল), জগৎ তোকে তিনদিনে পিষে ফেলবে।

শিখে রাখ—যখন যেমন তখন তেমন, যেমন অবস্থায় পড়বি সেইমতো চলবি। যাকে যেমন তাকে তেমন, সামনে মাতাল, তাকে ধর্ম কথা বলতে গেলে, হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে, কি খুড়ো বলে ডাকলে, সে তোকে আদর করতেও পারে। দেখবি, শুনবি, বলবি না—অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো, তুই তো আর কারো দন্ড-মুন্ডের কর্তা নোস্ যে শাসন বা শোধন করবি। আর তৈয়ারী অন্ন ছাড়বি না—ডাল ভাত জুটছে তাই খেয়ে নে, পোলাউয়ের আশা করবি না। কাঠের মালা আর ঘেঁটু ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে শিব পূজা সেরে নে ; কবে জবাফুল আর স্ফটিকের মালা পাবি, তার জন্যে কি এখন পূজা করবি নে ? শুনিয়াই অবাক ! সহজেই অঙ্গে যাঁর বসন থাকে না, আশ্রিতকে রক্ষার জন্যে কত মতোই না উপদেশ।

যত বড়ো বোদ্ধা (বুদ্ধিমান) হউক না কেন, প্রভুর শ্রীমূর্তি দর্শনে মোহিত হইয়া, সকলেই আপনাকে তাঁহার ক্রীড়া-পুত্তলীর মতো অনুভব করিত। একা আমি নহি, অনেকেই ইহা ঘোষণা করিবেন। আর একটি আশ্চর্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবেশে ঠাকুরের শ্রীমূর্তির অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিত, সাধারণে তাঁহার তিনখানি ফটো দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভেল্কি—যিনি নিখিল রূপের আকর, তাঁর পক্ষে বহুরূপ প্রকাশ কিছু আশ্চর্য নয়।

নাম-নামী অভেদ

ভক্ত ভগবানের জাতি হইলেও, কি জানি, কি কারণে, অথবা বৈদিক বর্ণাশ্রম-রক্ষণে বলিতেন, জন্মগত দ্বিজাতি নহে, এমন ভক্তমুখে পরব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ শুনিলেই কে যেন কানে ছুঁচ ফুটায়ে দেয়। তাই কোনো এক কায়স্থ ভক্তকে কহেন, নামী কি না ভগবান সঙ্গে অভেদ এমন যে, তাঁর নাম জপ করলে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়, তখন প্রণবটা না বললে আর তোমার ধর্ম হবে না ?

বকলমা

ক্ষুদ্রমতি আমাদের চিত্তাকর্ষণ-অভিপ্রায়ে বালকের মতো আচরণ করিলেও, আপনি যে সর্বেশ্বর, কখনো কখনো ইহার আভাস দিতেন। সকাল, সন্ধ্যায় বা খাবার, শোবার সময় ভগবানের স্মরণ মনন করিতে বলিলে, মুক্তপ্রাণ শ্রীগিরিশচন্দ্র কহেন—স্বভাব-দোষে যদি ইহাও না পারি, তাহা হইলে আপনার বাক্যলঙ্ঘনে অপরাধী হইতে হইবে। সুতরাং আমাদ্বারা ইহা সম্ভব হবে না। তাই তাঁহার সরল ভাবে প্রীত হইয়া প্রভু কহেন, যদি ইহাও না পারিস তো আমাকে বকলমা দে অর্থাৎ আমার উপর ভার দে। গিরিশবাবু তাহাই করিলেন, কিন্তু কি জানি পরক্ষণে কহিলেন, যদি পতন হয়। ঠাকুর তখন স্মিতমুখে বলেন—ঢ্যামনা সাপে কামড়ালে বিষ হয় না কিন্তু জাত সাপে (কেউটে গোখ্‌রো) কামড়ালে এক ডাক, দু ডাক, তারপর মরণ। তা আমি যখন তোকে ছুঁয়েছি (কৃপা করেছি), তখন বিষয়-বাসনা আর তোকে আকুল করতে পারবে না, আমাতেই তোর মন ডুবে যাবে। কিছুদিন পরে গিরিশবাবু কহেন, বকলমা দেওয়া এত যে দায়, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন দেখছি শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভ্রমণে প্রভুকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়-চিন্তা করিতে মন আর পূর্বের মতো আনন্দ পায় না। ইহা অপেক্ষা সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ মনন বরং সুখকর ছিল।

সর্বময়

সর্বময় বলিয়া আর একদিন ভাবাবেশে আত্মপরিচয়ছলে ঠাকুর কহেন—সাপ হয়ে কামড়াই আমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ি, চোর হয়ে চুরি করি, প্যায়দা হয়ে মারি (শাস্তি দিই)।

চৈতন্য-তত্ত্ব

ঠাকুরের গৃহে মহাপ্রভুর হরিনাম কীর্তনের একখানি চিত্র ছিল, তাহা একজনকে দেখাইয়া কহেন—দ্যাখ্ কি সুন্দর ভাব। সে বলে, আমার বাড়ি নবদ্বীপ, উহারা সব অভদ্র। তাহার কথায় ঠাকুর রহস্য করিয়া বলেন—তোর বাড়ি যখন নবদ্বীপ, তোকে আর একটা পেন্নাম। আচ্ছা, গৌরাঙ্গদেবকে তোর কি মনে হয় ? সে নিরুত্তর।

প্রভু তখন কহিতেছেন, চৈতন্য কি শুনবি ? (১) শ্রীচৈতন্য ঠিক যেন একটি পাকা কলা। কলার বাহিরে যেমন হলুদ বরণ, ভিতরে সাদা ; তেমনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা, একাধারে দুই। কৃষ্ণ অবতারের মতো এবার রাধার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই। (২) একদিন ঠাকুর (নারায়ণ) গোলক হতে মার (ভগবতীর) কাছে আসিলে মহামায়া তাঁকে আদর যত্নে খাইয়ে আপন শয্যায় শয়ন করায়ে রাখেন। মায়ের আদরে আপ্যায়িত হয়ে ঠাকুর অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন ; বেলা অবসান দেখে, তাঁর ঘুম ভাঙাবার জন্য ভগবতী ডাকছেন—বাছা চৈতন্য হও,—চৈতন্য হও, চৈতন্য হও। মার কথা শুনে আশ্চর্য হলে, জগদম্বা বলেন—কলিযুগে জীব যখন মোহে অভিভূত হয়ে ভগবানকে ভুলে যাবে, তখন তুমি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে তারকব্রহ্ম হরিনাম দানে তাদের চৈতন্য করবে।

যুগলতত্ত্ব

আবার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, দেহ ও দেহী যেমন অভেদ, রাধাকৃষ্ণ যুগল হলেও অভেদ, একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই শ্রীমতী পীতবাস হয়ে শ্যামঅঙ্গ

শোভা করেছেন। শ্যামও বসন হয়ে লজ্জা নিবারণ করছেন বলে, শ্রীমতীর অঙ্গে নীল বসন। শ্রীমতীর নাসায় যে মতিটি, ওটি গজমতি নয় কৃষ্ণমতি ; তাই কৃষ্ণরস-আস্বাদনে শ্রীমতী জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঐ মতিটি স্পর্শ করেন। দেখিসনে, আজও ছোটো মেয়েরা তাই নাকের নোলকটি চুষে থাকে।

করুণা বিতরণ

ঠাকুর কেবল যে দেবালয়ে থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরীয় কথায় পরিতৃপ্ত করিতেন, এমত নহে। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং ধর্মাত্মা শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায় (নেপাল-রাজের দূত) প্রমুখ ভক্তগণের আগ্রহে তাঁহাদের আলয়েও যাইতেন ; এবং যে সমস্ত নরনারী তাঁহার দর্শন জন্য দক্ষিণেশ্বর যাইবার সুযোগ পাইত না, তথায় তাহাদেরও হিতকামনায় নানাভাবে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন, আর যে যেমন উপযুক্ত, তাহাকে তদনুরূপ ভক্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানযোগ-সাধনে প্রগতি করিয়া দিতেন। ঠাকুর বলিতেন, নদীতে বন্যা আসিলে—যেমন মাঠ ঘাট পথ সব জলে ভাসিয়া যায়, এবার তেমনি করে (তাঁহার) সার্বভৌম যুগধর্মে সব একাকার হইয়া যাইবে। আরও বলিতেন, ঝড় উঠিলে যেমন আমগাছ তেঁতুল গাছের প্রভেদ করা যায় না, এবারকার সর্বগ্রাসী ধর্ম ঝটিকায় কোনো ধর্মেরই ভেদ-ভাব থাকিবে না।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা বিভ্রাট

প্রজ্ঞা লাভ না করিয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার পূর্ব-ধারণাকে ভ্রম বা কুসংস্কার বলিয়া আপন ভাব যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল করিবার প্রয়াস পাই ; কিন্তু বুঝি না যে, তাহার ধীশক্তি কিরূপ, বা আমার ভাব কি পরিমাণে তাহার কল্যাণকর হইবে। ফলে—থলির ভিতর হাত পুরিতে যাইলে থলির যে অবস্থা হয়, ছাত্র বা শিষ্যের দুরবস্থা সেইরূপ হইয়া থাকে। আবার উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি উপদেষ্টার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উপদেশের কোনো সার্থকতাই হয় না। এই শিক্ষাদান-বিভ্রাট যে কতোদূর অনিষ্টকর, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

ঠাকুরের শিক্ষাদান

কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষাদান-বিধি অভিনব ও সুখকর ছিল। কারণ, শিষ্যের সংস্কার ও মেধা অবধারণ করতঃ, তাহার ভাব নষ্ট না করিয়া স্বীয় দৃষ্টান্তে ও অপার স্নেহে তাহাকে আপন-প্রতি আকৃষ্ট করিতেন এবং কৌশলময় শিক্ষাদানে ধীরে ধীরে তাহাকে আপন ভাবে আনয়ন করিতেন। বলিতেন, সাঁশি (কাচের) দরজা দিয়ে যেমন ঘরের সকল জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের চোখ দুটি যেন সাঁশি দরজা। দেখিলেই বুঝিতে পারি, তার অন্তরের ভাব কি ; তাই তাকে সেইমতো উপদেশ করি।

উপমা—(১) রাসলীলা

কথাপ্রসঙ্গে রাসলীলা উত্থাপিত হইলে, সুরুচিপূর্ণ নরেন্দ্রনাথ বলেন—একে তো পৌত্তলিকতা, তাতে আবার নীতিবিরুদ্ধ আচরণকে ধর্ম বলিয়া প্রশ্রয় দেওয়ায় দেশটা

উৎসন্ন যাইতেছে। ঠাকুর সহাস্যে কহিলেন, ভালো—তোর কথাই মানলাম। কিন্তু উপাসনায় আনন্দ লাভ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের অভয় চরণ, করুণার হৃদয়, চিন্ময়রূপ কল্পনা করা কি পৌত্তলিকতা নয় ? নরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর। পুনরায় ঠাকুর কহিলেন—তুই যখন তখন স্বধীন চিন্তার কথা বলিস ; ঠিক ঠিক স্বাধীন চিন্তাতে ভাব দেখি, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বক্তা কে, আর শ্রোতাই বা কে ? মৃত্যু যাঁর আসন্ন, সেই রাজা পরীক্ষিত, সদ্গতি লাভের আশায় ভগবানের লীলাকথার শ্রোতা, আর মায়া যাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই, সেই বালসন্ন্যাসী শ্রীশুকদেব গোস্বামী বক্তা ; এমন ক্ষেত্রে তোর ও কথা কি সম্ভব ? নরেন্দ্রনাথ নির্বাক। তখন ঠাকুর বলিলেন, রাসলীলার ভাবটা হচ্ছে ত্যাগ আর ধ্যানের পরাকাষ্ঠা, সত্যি, এক কৃষ্ণ কি এককালে বহু হয়েছিলেন ? তা নয়। গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে এতই উন্মত্ত হয়েছিল যে, ঘর-সংসার ছেড়ে বনে এসে, প্রত্যেকেই তন্ময় হয়ে বোধ করেছিল, যেন তাহারই পাশে কৃষ্ণ বিদ্যমান। আবার অনুরাগ-পরীক্ষার জন্য ঠাকুর যখন তাদের ছেড়ে চলে যান, তখন কোনো কোনো গোপী ধ্যানে কৃষ্ণময় হয়ে বলেছিল—নাসৌ রমণঃ নাহং রমণী—আমিই কৃষ্ণ। এ যে বেদান্তের পরাজ্ঞান। তাই মহাপ্রভু এই রাসলীলা-ধ্যানে বিভোর থাকতেন। তবে অন্তরে কামগন্ধ থাকতে রাসলীলার রস আস্বাদ করতে পারা যায় না।

উপমা—(২) ভগবান দয়াময়

মাদ্রাজে সেবার দারুণ অন্নকষ্ট হওয়ায় বহুলোক অনাহারে মারা যাচ্ছে শুনে, হৃদয়বান নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুযোগ করেন—আপনি তো সদাই বলেন, ভগবান দয়াময় ; কিন্তু অসংখ্য লোক যখন অন্নাভাবে মরছে, তখন ভগবানকে কি করে দয়াময় বলিতে পারি ? ঠাকুর মৃদু হাস্যে কহিলেন, বেশ কথা ! তোদের সায়েন্ (সায়েন্সে) না বলে, এক একটা নক্ষত্র একটা জগৎ, তার মধ্যে তোদের এই জগৎটা না কি সকলের চেয়ে ছোট ; আবার এই জগৎটাতে কত দেশ আছে, তার মধ্যে ভারত একটা, তার ভিতর আবার বাংলা দেশ, তার রাজধানী কলকাতা, তার একটা গলিতে তোদের বাড়ি, তার ভেতর তুই একজন। হিসেব করতে গেলে, তুই তো রেণুর রেণুও হোস না। তখন অতি নগণ্য তুই কি না তোর সৃষ্টিকর্তার দোষগুণের বিচার করতে চাস ! এই যে তাঁর পরম-দয়া। নরেন্দ্রনাথ অধোবদন।

উপমা—(৩)

সগুণ ব্রহ্মোপাসক নরেন্দ্রনাথের অন্তরে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব দৃঢ় কবিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতা পড়িতে বলিতেন। 'জ্ঞানামৃতসমরসোঽহং' জীব-ব্রহ্মের একতাব্যঞ্জক শ্লোকটি পড়িয়াই পুঁথিখানি রাখিয়া কহিলেন, জীব-ব্রহ্ম অভেদ বলা বা ভাবা বড় স্পর্দ্ধা !!! ঠাকুর কহিলেন, আমি কি তোকে তোর জন্য পড়তে বলেছি, আমাকে শুনাবি বলে পড়তে বলেছি। এইরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অদ্বৈতভাবে ভাবিত করেন।

উপমা—(৪)

দেবতা মন্ত্রের অধীন, মন্ত্র—শিবতম রস গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণের অধীন ; সুতরাং ব্রাহ্মণ দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই শাস্ত্রবাক্য-পোষণে ব্রাহ্মণত্ব অভিমানী এক যুবক ভাবিতেছে, এবার ঠাকুরের সন্তানমধ্যে শূদ্রভাগই অধিক। জগদ্‌ভ্রম-নিরশনে যাঁর আবির্ভাব, সেই অন্তর্যামী প্রভু তার ভ্রম নাশ ও ভাবপুষ্টি জন্য কহিলেন, না রে তা নয়।

একে একে নাম গণিয়া বলিলেন, তোরা ব্রাহ্মণই অধিক, শূদ্র কম। এখন তাহাকে আপন ভাবে আনয়ন অভিপ্রায়ে কহিলেন, ভগবান যখন ভূতলে অবতীর্ণ হন, দেবতারা তাঁর লীলারস আস্বাদ করতে মর্ত্যে আসেন। রাম-অবতারে দেবতারা সব বানর সেজে এসেছিলেন। কৃষ্ণ অবতারে গয়লা হয়ে এসেছিলেন। (আপনাকে দেখাইয়া) এবার না হয় ভদ্রশূদ্র সেজে এসেছেন, তাতে কি দোষ হতে পারে? তবু তোদের ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক।

নবম অধ্যায়

নব্যদের মোহ নাশ

অকৃতাত্মা হইলেও প্রভুর অনুকম্পায় কৃতাত্মা হইয়া নব্যগণ এতই স্ফীত যে, তাহারা ধরাকে সরাজ্ঞান করিত এবং আপনাদিগকে যেন ঠাকুরের মহাজন বলিয়া ভাবিত। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগকে তিরস্কারের পবিবর্তে পুরস্কার করিয়া কহিলেন, 'ওরে! আমি উলুবনে মুক্তা ছড়াই নে, কালে সব বুঝতে পারবি।' আরও কহিলেন, 'যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাঁরে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরাণী।' তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। কেশব সেন রামকে বলেছিল—'তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে? তাই অত ঘাঁটাঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভালো একটি গেলাস-কেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ভালো ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে।' ইহাতে একজন কহিল,—'মহাশয়! আমরা তো আর কেশববাবু নই যে, তাঁর মতো আপনাকে দেখব; না হয় কাল হতে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসবো না।' ঠাকুর অমনই সহাস্যে কহিলেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।'

মুক্তিলাভ

একটা কথা আছে—জপ তপ. কর কি, মরতে জানলে হয়। প্রভুর স্নেহপালিত যুবকদের অন্তরে কি জানি, এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার কৃপায় এবারের খেলায় তাহারা জয়লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ আর তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে না।

অভয় বাণী

আলোক-আঁধার সংমিশ্রণে যদিও আত্মপরিচয় কহিয়াছেন এবং কৃপাপুরঃসর কহিয়াছেন যে, জান্তে বা অজান্তে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে যে কেহ ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে ডেকেছে, তারাই এখানে আসবে। তথাপি প্রিয় নব্যগণ নগদ বিদায় (আদর) পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল না, তাঁহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইল। এই অভিপ্রায়ে ঠাকুর তাঁহার যুবক-সন্তানগণের মনোভাব পরীক্ষা করিতেন।

ভাব-পরীক্ষা

এই হেতু একজনকে কহিতেছেন, 'দ্যাখ, এক সময় বামনী (ভৈরবী), বৈষ্ণব চরণ, ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিত, বর্ধমান-রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন আমাকে অবতার বলেছিল। এখন গিরিশ, রাম, মনমোহনও আমাকে অবতার বলে; শুনে শুনে অবতারে ঘেন্না হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাকে তোর কি বোধ হয়?' সে বলিল, 'যাহারা আপনাকে অবতার বলে, তাহারা ইতর।' ঠাকুর স্মিতমুখে কহিলেন, 'ওরা সব অবতার বলে আমাকে

কত বড় করলে, আর তুই তাদের ছোটলোক বলছিস ?' যুবক কহিল, 'আমার ধারণায় অবতার পূর্ণ নহেন, অংশ মাত্র।' ঠাকুর কহিলেন, 'ঠিক বলেছিস। তবে তোর কি বোধ হয় ?' সে জানাইল—'আপনি সাক্ষাৎ শিব, অংশ নহেন। কারণ, আপনার উপদেশমতো জগৎগুরু শিবের ধ্যান করিতে যাইলে, এক আধদিন নয়, বহুদিন ধরিয়া শিবের স্থানে আপনাকেই দেখিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আপনিই সেই সত্যং শিবং সুন্দরং শিব।'

'তোর ভাবে তুই ঠিক, কিন্তু আমি তোর লোমের যোগ্য নই'—বলিয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর কি ?

ঠাকুর বলিতেন, 'কি জানি মহামায়ার প্রেরণায় আমি তোদের মধ্যে কতক শিব অংশ ও কতক বিষ্ণু অংশ বলে দেখি। পূর্ণ বিভোর হয়ে বলে, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আবার কালী ছোঁড়াটার ভাগ্য ভালো। সে দেখেছিল যত সব অবতার আমাতে লীন হয়ে গেল। তাই আমি তাকে বলি, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অবতার মানে না ; তারা বলে, আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যের মতো ঈশ্বর-প্রেমিক, কিন্তু বিজয় (গোস্বামিপ্রবর) বলেছিল—আপনি অবতারি—অর্থাৎ আপনার হতে অবতারগণের উদ্ভব। উইলিয়াম নামক একজন সাহেব আমাকে ঋষিকৃষ্ণ (যিশুখৃষ্ট) বলে ভজনা করেছিল। আর ঠাকুরবাড়ির একজন পালোয়ান আমাকে 'মহাবীর' বলে পূজা করে কুস্তীতে জিতেছিল।' আবার কামারহাটির মহাতপস্বিনী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দেখিতেন, ঠাকুর গোপাল-রূপে তাহার গলা জড়াইয়া পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিলে সেই গোপালমূর্তি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া যাইত। গৃহগমনকালে দেখিতেন, কোনো দিন বালগোপাল বা কোনো দিন বালকরূপী রামকৃষ্ণ তাঁহার ক্রোড়ে চাপিয়া যাইতেছেন ; এই হেতু ঠাকুর তাঁহাকে আদর করিয়া 'গোপালের মা' বলিতেন, এবং শ্রীমতী মাতা-ঠাকুরাণীও তাঁহাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

সংশয় নিরসন

একটা মহাসংশয় আসিতে পারে ; পারে কেন, আইসে যে, ইহারা অনেকেই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিব, নারায়ণ এবং অবতার বলিয়া দেখিল, কিন্তু ইহাদের জীবনস্রোত পূর্ববৎ রহিল, না উন্নতির দিকে ধাইল ? ভক্ত কবি বলিয়াছেন—কৃষ্ণ দরশনের ফল কৃষ্ণ দরশন ; ইহাদের তাহাই হইয়াছে। রাজনন্দিনী রাজরাণী যাজ্ঞসেনী বনবাস-ক্লেশে বেদনা জানাইলে, ধর্মরাজ কহেন—আমি তো ধর্মব্যবসায়ী নই যে, লাভালাভ বিচার-পূর্বক ধর্মাচরণ করিব ? শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রিতগণ সম্বন্ধে এই সদুত্তরটি প্রযোজ্য। প্রারব্ধ কর্ম বা ভগবৎ ইচ্ছায় জন্ম-মরণ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণচরণতরীতে যাঁহারা চিরদিনের মতো আশ্রয়-সুখ লাভ করিয়াছেন, সেই অদৃষ্ট বা কর্মফলদাত্রী ইচ্ছাময়ীই জানেন—তাহাদের কি গতি হইবে। এই প্রসঙ্গে বিচারও আবশ্যক যে, অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই বা কেন প্রভুর পদাশ্রয় পাইল ?

এই সংশয় নিরসন জন্য ধীমান শ্রীনরেন্দ্রনাথ বলেন যে, গতিশীল চক্রদ্বয়ের সংযোজক দণ্ডটিকে কোনো শক্তিমান ব্যক্তি এক আঘাতে কর্তন করিলে, একখানি চক্র অমনি তথায় নিপতিত হয়। অপরখানি পূর্বগতি জন্য কিছুদূর যাইয়া তবে পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবানগণের অবস্থাও ঠিক

সেইরূপ। অর্থাৎ প্রভুর কৃপায় তাঁহার আশ্রিতগণের ইহজন্মের কর্মফল নিঃশেষে দগ্ধ হওয়ায়, তাহাদের ভাবী জন্ম নিবৃত্তি পাইয়াছে। তবে সংস্কারজাত কর্মফল বর্তমান শরীরে ভোগ করিয়া দেহান্তে শাশ্বতগতি লাভ করিবে—ইহা অনুমান নহে, ধ্রুব সত্য।

নিত্যলীলা

দক্ষিণেশ্বরে বিরাজকালে কি জানি কি ভাবে ঠাকুর একদিন আপন মনে বলিতে থাকেন—এসে ঠেকেছি যে দায়, কব কায়, যার দায় সে-ই জানে, পর কি বুঝে পরের দায়। তার পর কহেন, এবার যাদের না হল, পরের বার হবে। তাতেও যাদের না হবে, তাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। ভাবে বুঝা গেল, প্রভু আবার আসবেন।

আর একদিন নহবৎখানার কাছে মেয়েদের স্নানের ঘাটের উপর বকুলতলায় দাঁড়াইয়া ভাবভরে ভক্তদের বলেন—তোমরাই সুখী, এলে, আনন্দ করলে, ছুটি অর্থাৎ জগজ্জ্বালা হতে উদ্ধার পেলে। (আপনাকে দেখায়ে) এখানকার নিষ্কৃতি নাই, সরকারী লোক কি না, যখন যেখানে আবশ্যক, সেইখানেই যেতে হবে। ভাবসাম্যের পর ভক্ত-আগ্রহে—উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখায়ে কহেন—ঐ দিকেই। তবে কত দিন পরে, তাহা বলেন নাই।

আবার একদিন কোনো কারণে শ্রীমাকে কহেন—পাছে কর্মবিপাকে অন্য গতি হয়, তাই ভক্তদের অন্তিমকালে আমি এসে, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। শ্রীমার মুখে শুনিয়াছি। বড়ই করুণাপূর্ণ আশাপ্রদ বাণী !!! এইরূপ যাতায়াতে কত যে অসংখ্য জীবের মহৎ কল্যাণ হবে, তাহা ইয়ত্তার অতীত।

বোধ হয়, ভাব পরিস্ফুট-করণে, রামলীলা উপলক্ষ্য করিয়া, গল্পচ্ছলে নিত্যলীলাটি বুঝাইয়া দেন। বলছেন—ভগবান যখন নিত্য, তাঁর লীলাও নিত্য। তোদের সায়েনে (সায়েন্সে) না বলে—এক একটা নক্ষত্র এক একটা জগৎ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জননি তব বিগ্রহং, এই রকম অনন্ত জগতে অনন্তকাল ধরে তার লীলা হচ্ছে, ইহাই বালক রাম কাকভূষুণ্ডিকে দেখায়েছেন। গল্পটি এই—বালক রাম একদিন আঙিনায় বসে খাবার খাচ্ছেন দেখে কাকভূষুণ্ডি মনে করিল, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম ? পরখ করবার ইচ্ছায় ছোঁ মেরে যেমন হাতের খাবার কেড়ে নিতে গেল, অমনই বালক রাম বাম হাত দিয়ে ধরতে গেলে, পালাবার জন্য উড়তে উড়তে একটা স্বর্গ (সৃষ্টি) ভেদ করে দেখলে—সেখানে যুবারাম, কিন্তু বালক রামের হাতটি তার পিঠের ওপর রয়েছে। এই রকম পর পর স্বর্গ ভেদ করে দেখে—কোথায়ও রামচন্দ্র রাবণ বধ করছেন, আর কোথায়ও বা রাজা হয়েছেন, কিন্তু সকল স্বর্গেই দেখে যে সেই বালক রামের হাত তার পিঠের ওপর। পরাস্ত হয়ে যখন অহমিকা গেল, বুঝলে ইনিই সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম। তখন জ্ঞান হলে, বালক রামকে প্রণাম করে তাঁর প্রসাদ খেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। মূঢ় আমরা অনায়াসলব্ধ পূর্ণ-ব্রহ্ম প্রভুকে পাইয়া, পাছে তাঁর মহিমা অবধারণে অসমর্থ হই, তাই রামলীলা অবলম্বনে আপনারই নিত্যলীলা অর্থাৎ অসংখ্য জগতে অনন্ত কাল ধরিয়া যে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা হইতেছে ও হইবে, ইহাই আমাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন।

সমতা দান

প্রভু যদি প্রসন্ন হইয়া সেবাপরায়ণ প্রিয় ভৃত্যকে 'তোতে আমাতে সমান' বলিয়া আপন আসনে উপবেশন করান, তাহাতে প্রভুর মহত্ব এবং ভৃত্যেরও গৌরব প্রকাশ পায় ; কিন্তু

ভৃত্য যদি ধৃষ্টতা প্রযুক্ত প্রভুর আসনে বসিতে যায়, তাহলে সে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হয়। ঠাকুর ভাবিলেন—তাঁহার কার্যে সমাগত নরেন্দ্রনাথ যদি চিরদিনই নিম্ন পদবীতে থাকে, তবে ভাবীকালে তাঁহার স্বরূপ হইয়া লোকসমাজে কিরূপে মর্যাদা পাইবে? এই হেতু বোধ হয়, তাহাকে আপনসহ সমতা প্রদান মানসে একদিন ভগবৎ-প্রসঙ্গে অর্ধ-বাহ্যদশায় উন্মত্ত ও উলঙ্গপ্রায় প্রভু তাহার জানুর উপর স্বীয় জানু দিয়া চাপিয়া বসিলেন। মণিকীটের (কাঁচপোকার) আক্রমণে তৈলপায়ীর (আরশুলার) যেরূপ অবস্থা হয়, দেখিলাম—নরেন্দ্রনাথ ঠিক সেইমতো। যেন প্রভুর পরশে আচ্ছন্নপ্রায়। উন্মত্ত প্রভু আপন হাতে তামাক খাইয়া, বলপূর্বক সেই হাতে নরেন্দ্রনাথকে তামাক খাওয়ালেন। আবার সেই হাতেই যখন নিজে ধূমপানোদ্যত, শঙ্কিত ও শীর্ণপ্রায় নরেন্দ্রনাথ 'কি করেন, কি করেন' বলিয়া বাধা দিতে যাইলে, জ্বলন্ত প্রভু ধমক দিয়া কহেন—হীনবুদ্ধি তুই বুঝিস না যে তোর শরীর আর আমার শরীর অভিন্ন। দুই-ই আমার শরীর। দেখিয়া আমি হতভম্ব! ঘটনাটি বৈকাল বেলায়, ঘরে আর কেহ ছিল না।

দশম অধ্যায়

দণ্ডে দণ্ডে মানুষ মরে বাঁচে

দক্ষিণেশ্বরে বিরাজ করিলেও গ্রীষ্মসমাগমে কোনো কোনো বৎসর ঠাকুর জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করিতেন। শিবের সংসার (দরিদ্র অবস্থা) জানিয়া মথুরানাথ তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার, এমন কি, খড়কেটি পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে দিতেন। কমল ফুটিলে সৌরভে আকুল হয়ে ভ্রমর যেমন উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ঠাকুরের দিব্য দর্শন এবং তাঁহার মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিতে শত শত নর-নারী আগমন করিত। এই কারণে নিকটস্থ ফুলুই শ্যামবাজার গ্রামের গোস্বামিগণ কোনো এক পর্ব উপলক্ষে তাঁহাকে তাঁহাদের আলয়ে লইয়া যান। হরিনাম-সংকীর্তনে ভাবসমাধি হয়, ইতিপূর্বে ঐ অঞ্চলের লোক কখনো দেখে নাই। সুতরাং ঠাকুরের এই ভাব আবেশের বিষয় প্রচারিত হইলে, 'এক দিব্য মানুষ হরিনামে দণ্ডে দণ্ডে মরে, বাঁচে', দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় এতই জনতা হয় যে, স্থানাভাবে অনেকে নিকটস্থ ঘরের চালে ও বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করে। শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সপ্তাহব্যাপী কীর্তনানন্দে বিভোর হওয়ায়, শরীর এতই অবসাদ হয় যে, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুস্থবোধ করিতে প্রায় পক্ষকাল লাগিয়াছিল।

ভাবসাগর

অধ্যবসায় সহকারে সাগরতলস্থ দ্রব্যনিচয়ের অনুসন্ধান বরং সম্ভবপর; কিন্তু অতল রামকৃষ্ণ-সমুদ্রে কি আছে বা কি নাই, তাহার অভিজ্ঞান একরূপ অসম্ভব। কোনো এক আত্মচৈতন্য মহাপুরুষ কহিয়াছেন যে, তাঁহার এক-একটি ভাবের প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানকে বার বার অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু আভাস পাইতেছি যে, এই পুরুষোত্তমে বৈদিক যুগের নারায়ণ ঋষির অপূর্ব তপস্যা, রামচন্দ্রের সত্যপালন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-সামঞ্জস্য, শঙ্করের মায়াবাদ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য-ভক্তি প্রভৃতি ভাবের আশ্চর্য সমাবেশ।

নব্যগণ

ভাবময় ঠাকুর অপার করুণায় যাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছেন এবং আদর করিয়া যাহাদিগকে কহিয়াছেন, শ্রীমন্দিরে আরতির ঘড়ি ঘণ্টা বাজলে কেঁদে ডাকতাম, ওরে! তোরা কে কোথায় আছিস আয়, তবে তো তোরা এসেছিস। আর তোদের চিত্র আমার চিত্তে অংকিত থাকায়, একে একে আসিলেই চিনতে পেরেছি—তোরা আমার। এখন আপনার সেই পরিচিত অনুচর নব্যগণের শুভ কামনায় তাহাদের সহিত একাসনে বসিয়া কহিলেন, তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, তোদের সঙ্গে সারাদিন ধর্মকথা কহিলে, তোরা আমাকে লাইক করবিনি। এই বলিয়া এমন হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভবনাথ কহিল, ক্ষান্ত দিন মহাশয়! আর হাসতে পারছি না, পেটের নাড়ীগুলোয় বেদনা হয়েছে। চ্যাংড়া হইলেও তদ্‌গত প্রাণ কি না! তাই এই মধুর আচরণের প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া, পাছে কেহ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এই আশংকায় সতর্ক করিলে বলেন, ওরে! লোক না পোক, কিন্তু তোরা যে আমার।

অভিনয়

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জননি তব বিগ্রহং, এমন যে জগন্মাতাকে, ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র তোরা কি ধ্যান-ধারনা করবি! পচা মাছ ঝাল দিয়ে রেঁধেছি, খেয়ে আনন্দ কর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না হয় বড় জোর ২৷৩ ঘণ্টা ধ্যান করলি, বাকি সময়টা তো বাজে গেল। যাতে তোদের মন আমাতে ষোল আনা আকৃষ্ট হয়, তাই, তোদের ভালোর জন্যই এই রঙ্গরস। মনে করিস না, আমি বোকা, আর তোরা শালারা সেয়ানা। তোদের এমন করে যাব যে, যে অবস্থায় থাকিস বা যা দেখিস না কেন, সব সময় তোদের আমাকেই মনে পড়বে, আর আমারই মুখ দেখবি। যদি তোদের এমনটি না হল, তো, হল কি?

আবার অভিনয় আরম্ভ হইল, কিন্তু এবার একটু মাত্রা চড়াইয়া, খেউড় খিস্তি কথায়। বলিলেন রমণী অঙ্গ-বিলাস জন্য যে রাগ, এইসব শুনলে অনেকটা কেটে যাবে। ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য অবস্থায় জগন্মাতাকে কহিতে লাগিলেন, 'মা! তুই তো পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী, তবে বেদ-পুরাণের ক, খ, আর খেউড় খিস্তির ক, খ, কি আলাদা' বলিয়া, যোনি শব্দটি জপ করিতে করিতে গভীর সমাধিস্থ হইলেন। বহুক্ষণ পরে বাহ্যাবস্থায় আসিয়া আমাদিগকে কহিলেন, দ্যাখ! যোনি বলিলেই জগদ্‌যোনি মা ব্রহ্মময়ীকে দেখে তাঁতে ডুবে যাই। শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় ভক্তিভরে ভগবৎস্তুতি করিতে করিতে অন্তরে দিব্য ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু দুষ্ট ছেলের মতো কুরুচি হইয়া যথেচ্ছ অশ্লীল কথা জপে যে ভাবসমাধি হয়, ইহা তো মানবে কখনও সম্ভব নয়; এবং ইতিহাসও এরূপ প্রমাণ করে নাই।

বেদান্ত

ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, ঔষধ প্রয়োগের সুফল হইয়াছে অর্থাৎ নব্যরা তাঁহাতে একেবারে তন্ময় হইয়াছে, তখন কহিলেন, বেদান্ত শুনবি? ওরে! বেদান্ত তিনটি কথা মাত্র—অস্তি, ভাতি, প্রিয়, সৎ চিৎ আনন্দ। অস্তি অর্থাৎ ঈশ্বরো অস্তি। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে? তাই রামপ্রসাদ বলেছে, আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে নাই। যদি কেউ অন্তরের সঙ্গে বলতে পারে—ঈশ্বরো অস্তি, ঈশ্বর আছেন, অমনই সে দেখবে ঈশ্বরো ভাতি, অর্থাৎ সর্বভূতে তাঁর প্রকাশ। যাই দেখল ঈশ্বর

বিদ্যমান, অমনই ঈশ্বরকে প্রিয় অর্থাৎ অতি আপনার জেনে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। আবার কহিলেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা বললেই কি এই জাজ্বল্যমান জগৎটা মিছে হয়ে যায়, তা নয়। যতক্ষণ অজ্ঞান, জগৎটা ততক্ষণ সত্য, এর অভাব নাই; কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় আর প্রাণপাত সাধনায় যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সাধক দেখে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব-জগৎ হয়েছেন। তখন তাঁর কাছে জগৎটা মিছে হয়ে গেল। আর জীবঃ শিবো সনাতন, জীবই শিব। পাশবদ্ধ ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। কথাগুলি এমন দিব্যভাবে বলিলেন, যাহাতে আমাদের মন এক অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ হইল। এ দৃশ্যটি জীবনে ভুলিবার নহে। ঠাকুর বলিতেন, টিয়েপাখি সারাদিন রাধাকৃষ্ণ বলছে, যাই বেড়ালে ধরল, অমনই নিজের রব ক্যাঁ ক্যাঁ করতে লাগল; কিন্তু প্রভুর কৃপায় এই বেদান্তজ্ঞান চিরদিনের মতো আমাদের ভেলাস্বরূপ হইয়াছে।

কর্তাভজা মত

আবার কর্তাভজার বিষয় বলিতেছেন, কর্তা কি না ভগবানকে ভজনা করা। প্রকৃতি নিয়ে সাধন এদের একটা পথ, বড়ো কঠিন ব্যাপার, যেন সাপে নেউলে খেলা। তাই এরা বলে, মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হ'গে যা কর্তাভজা। আরও বলে, সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি, সাপ না খাইবে তায়। অমিয় সাগরে সিনান করিবি, কেশ না ভিজিবে তায়। রন্ধন করিবি ব্যঞ্জন বাটিবি, হাত না ধুইবি তায়। নির্লিপ্তের ভাব। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী এই মতের সাধক ছিল, একদিন আমাকেও তাদের আখড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। তোদের কিন্তু ও পথ নয়।

একাদশ অধ্যায়

জগৎগুরু-উপদেশামৃত

গুরুবাদ

জন্মগত সংস্কার-প্রভাবে বিচিত্র প্রকৃতি স্বতঃসিদ্ধ। যিনি প্রজ্ঞাবলে তাহার মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, অনুকূল পথ প্রদর্শনে তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। এই গুরুবাদ সনাতন মতের একটি বিশেষত্ব; এবং এই উদ্দেশ্যে একেশ্বরের বিবিধ নাম, রূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়ের অবতারণা হইয়াছে। অন্যথা একই পরিচ্ছদে বিভিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ সুশোভন প্রচেষ্টায় অশোভন করাই হয়।

ঠাকুর বলিতেন, কালী কল্পতরু, সদাশিব জগদ্‌গুরু। সুতরাং কল্পতরুমূলে কঠোর সাধনায় যে প্রভু নিজ অস্তিত্বকে ঈশ্বরের বিরাট অস্তিত্বে নিমজ্জন করিয়াছেন, তিনিই শিবগুরু ও বিশ্বগুরু। অন্যথা কানে ফুঁ ব্যবসায়ী শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু। আবার বলিতেন, মানুষ গুরুমন্ত্র দেয় কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। আরও বলিতেন, মানচিত্র দেখে কাশী বুঝান যেমন, শাস্ত্র পড়ে তাঁর (ভগবানের) বিষয় বলাও ঠিক তেমন। তবে সাধকের তীব্র ব্যাকুলতা আসিলে, (জলমগ্ন ব্যক্তির কোনোমতে জলের উপর ভাসিয়া নিশ্বাস ফেলিবার জন্য যে প্রচেষ্টা অর্থাৎ আকুপাঁকু করা তাহারই নাম ব্যাকুলতা) ভগবানই কোনো না কোনোরূপ উপদেশ বা দীক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বিরল।

মন্ত্র-দীক্ষা

ঈশ্বরের মহিমাবাচক যে মহাবাক্য—যাহা মনকে ত্রাণ করিয়া দিব্যভাবে ভাবিত করে, তাহারই নাম মন্ত্র ও দীক্ষা। ঠাকুর কহেন, কর্তাভজারা বলে, মন্‌তর মন্‌তর বলছিস কি? মনই হচ্চে মন্‌তর। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল। অর্থাৎ মন যদি আগ্রহসহ ভগবানের ভজন না করে, তাহা হইলে গুরুমন্ত্র ও ইষ্ট কি করিবেন? গুরু বীজ দিবেন মাত্র, কিন্তু শিষ্যকে যত্ন দ্বারা তাহাকে বৃক্ষতে পরিণত করিয়া ফলবান করিতে হইবে। আবার কখনো কখনো আক্ষেপ করিয়া কহিতেন, গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। আমি যেমন অঙ্গের বসন পর্যন্ত ফেলে দিয়েছি অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ জন্য সর্বত্যাগী হয়েছি, একটা চেলা পেলাম না যে, এমনটি করে।

ভার গ্রহণ

আবার বলছেন, দীক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়, শিষ্যের ইহ ও পরকালের সকল বোঝা বহিতে হয়। একেই তো আমি ক্ষুদ্র মানুষ, জোর না হয় দু' চারজনের ভার সইতে পারি, অনেকের ভার নিতে গেলে চাপে মারা যেতে হবে। ছোটো ছোটো কাঠ দু' একজন নিয়ে জলে ভাসতে পারে, কিন্তু বাহাদুরি চকোর অনেককে নিয়ে ভেসে যায়। মানুষ দু' পাঁচজনের ভার টানতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিন গাড়ি বিশ-পঁচিশখান মালগাড়ি টেনে নিয়ে যায়। তবে যে একেবারে মন্ত্র দিই না এমন নয়, দু' দশজন যারা নেহাৎ নাছোড়বান্দা হয়েছিল, তাদের দিতে হয়েছে, তবে কাহাকে কানে ফুঁকে, কাহার জীবে লিখে বা কাহাকে স্পর্শ করে। সাধুর বহু শিষ্য করা দোষ, মহাপ্রভুও বলেছেন—বহু শিষ্য না করিবে। তবে উপগুরু হতে পারি, এতে বিশেষ ঝোঁক পোয়াতে হয় না, উপদেশ দিয়েই ছুটি। যার কাছে যা কিছু সদুপদেশ পাওয়া যায়, তিনিই উপগুরু। অবধূত চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন।

গুরুই দেবতা

গুরুকে মানুষ-বুদ্ধি করা মহাদোষ। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। অর্থাৎ মোদো মাতাল হলেও আমার গুরু নিত্যানন্দ-দাতা। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়, ত্রিদোষ-নাশক ; পাতিলেবু অম্বলের মধ্যে নয়, অগ্নিবর্ধক, হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়, পিত্তনাশক ; তেমনই গুরুও মানুষের মধ্যে নন, ভবপারের কর্ণধার। গুরুর প্রসন্নতায় সর্বার্থ-সিদ্ধি হয় ; গুরু মেহেরবান তো চেলা পলোয়ান। গুরু ও ইষ্ট অভেদ। ও শিষ্য, ঐ দেখ বলে চৈতন্য করে ; গুরুই শিষ্যের সম্মুখে তার ইষ্টরূপে প্রকট হন।

গুরুভক্তি

বাবা, কর্তা ও গুরু—এই তিনটি সম্ভাষণ শুনিতে ঠাকুর ভালোবাসিতেন না। দুষ্টবুদ্ধি কোনো এক যুবক এই ভাবটি ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন উদ্ধতভাবে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করায়, তাহার কেন, সকলের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর কহেন, তোর এত হীনবুদ্ধি যে, তোর গুরুবাক্যে অনাদর? গুরুভক্তি ছিল মহামতি অর্জুনের। একদিন ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে নিয়ে বেড়াবার সময়, তার গুরুভক্তি দেখবার ইচ্ছায় কহেন, দেখ সখা! কত বক উড়ছে ; গুরুভক্তিতে তাহাই প্রত্যক্ষ করে অর্জুন বলিল, হাঁ সখা! আবার ঠাকুর যাই বললেন, কৈ সখা, পাখি কোথায়? অর্জুন অমনি বলিল, হাঁ সখা

পাখি তো দেখছি না। রাজপুত্র অর্জুন কি কৃষ্ণের খোসামুদি করছিল? তা নয়, অসীম গুরুভক্তিতে ঐরূপ দেখেছিল। এইরূপ গুরুভক্তি হওয়া চাই, তবেই কল্যাণ। ঠিক ঠিক যার গুরুভক্তি হয়, সে গুরুর বংশধর, অনুচর, এমন কি, তাঁর দেশের লোকদেরও গুরুর মতো শ্রদ্ধা করে। দৈবাৎ একজন মানুষ লংকাতে গিয়ে পড়লে, তাঁহার ইষ্টদেবতা রামের মতো মানুষের আকার দেখে, বিভীষণ তাকে রাম বলে পূজা করে, ধন-রত্ন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন। যুবক তখন করযোড়ে নিবেদন করিল, জানি, আমি চিরদিনই আপনার অনুকম্পার পাত্র, কেবল আপনার মুখে 'আমি তোর গুরু' এইটি শুনিবার ইচ্ছায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছি। ঠাকুরও কৃপাপরশে তাহাকে চরিতার্থ করিলেন।

ঈশ্বর-তত্ত্ব

ঠাকুর কহিলেন, শাস্ত্র বলে ঈশ্বর সাকার, আবার তিনি নিরাকার। (রহস্য করিয়া) কেহ বলে ঈশ্বর নীরাকার কিনা জলের আকার। দেখ, ঈশ্বরের ইতি করা যায় না; তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আবার ইহার পরে যে কি, তা বলা যায় না। যেমন ঘণ্টা বাজল ঢং—এটি সাকার ভাব, তার পর ঢংয়ের অং-টি নিরাকার ভাব, আর ঢং ও তার অং-টি শুনে মনে যে একটা ভাবের উদয় হয়, সেটি সাকার নিরাকার পারের অবস্থা। সচ্চিদানন্দ-সাগরে কি আছে বা কি নাই, তা বলা যায় না। শ্রুতি সভয়ে এই কি এই কি বলে নীরব। ছয় ছয়খান দর্শন কত মতই বলিল, তবে তিনি যখন ভক্তি (আত্মরতি) হিমে জমাট বেঁধে (যেমন একই সময় একই জল তরল ও ঘন অর্থাৎ বরফ) আত্মপরিচয় করেন, তখনই জানতে পারা যায়, তিনি কেমন।

ব্রহ্মতত্ত্ব

মুখে বলাতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু উচ্ছিষ্ট হন নাই। অর্থাৎ তিনি যে কি, তা কেহ বলিতে পারে নাই, ঠিক যেন বোবার স্বপ্ন দেখা। ঘি খেয়ে কেউ কি তার স্বাদ বলতে পারে?—জোর বলে, ঘি ঘির মতো। রমণ-সুখ শ্রেষ্ঠ সুখ, যার জন্য সকল জীবই লালায়িত; পরব্রহ্ম হচ্ছেন সেই কোটি কোটি রমণ-সুখের জমাট। শুদ্ধসত্ত্ব ঋষিরা প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মসুখ অনুভব করে আত্মারাম হয়েছেন।

তত্ত্বকথা

এমত সময় তর্কচূড়ামণি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলেন, ও শশধর! তুমি তো মহা-পণ্ডিত, কত বক্তৃতা দিচ্ছ, আমাকে কিছু শুনাও না? পণ্ডিতজী বিনীত হয়ে কহিলেন, শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব আলোচনায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কোথায় আপনার কৃপায় ভক্তিবারিতে শান্তিলাভ করিব, না আমি আপনাকে তত্ত্বকথা শুনাইব? (শ্রীমুখে শুনিয়াছি এইরূপ প্রশ্নে কেশববাবুও ঠাকুরকে বলিয়াছেন—কামারশালায় কি ছুঁচ বেচা চলে?) ঠাকুর তখন কহিতে লাগিলেন—একমেবাদ্বিতীয়ং, বলিতে বলিতে ভাবস্থ, তথাপি অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় কহিলেন, মানবে এই ভাব ধারণ করতে অক্ষম হবে বলে সেই সচ্চিদানন্দ একাধারে অর্ধনারীশ্বর হলেন। তাতেও যদি সম্যক বুঝতে না পারে, তাই হরিহর ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করলেন। যিনি এমন, তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যোগ। ওগো! যোগ মানে হাতি ঘোড়া নয়, ভগবানে মনোযোগ। এই যোগের ধারা তিনটি—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম।

জ্ঞান

এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। তিনি (বিভুই) জীব জগৎ সবই হয়েছেন, ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান। তাঁর কাছে যাবার সময় কিন্তু নেতি নেতি করে সব ফেলে যেতে হবে; অর্থাৎ যা কিছু দেখছি বা ভাবছি—সব মিথ্যা অসার। কেবল তিনিই সত্য ও সারাৎসার। এই ভাবটি এলে তবে পেঁছানো যায়। জ্ঞান তাঁর মহিমাতে মুগ্ধ হয়ে তাঁতেই গা ঢেলে দেয়, কি না তাঁতে ডুবে যায়; কেননা, তাঁর স্বরূপ জেনে তাই হয়ে যায়। তবে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ কাহারও এই জ্ঞান হয়।

ভক্তি

ভক্তি কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বুঝে না, বা জানতেও চায় না। চায় কেবল মাধুর্য, যাতে তাকে নিরন্তর উপভোগ করবে। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক। জ্ঞান পুরুষ বলে ভগবানের সদর বাড়িতেই থাকে, অর্থাৎ তাঁর মহিমাতে আত্মহারা হয়ে যায়। ভক্তি স্ত্রীলোক, তাঁর অন্দরমহলে যায়, আর রসো বৈ সে যে তিনি, তাঁহার রস আস্বাদন করে। এই শুদ্ধা ভক্তি কেবল ব্রজগোপীদের হয়েছিল। মানবের পক্ষে সুদুর্লভ বলিয়া ঠাকুর গীতারম্ভ করিলেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়।
তারে কেবা পায়, সে যে ত্রিলোক-জয়ী॥
শুদ্ধা ভক্তি কেবল আছে বৃন্দাবনে।
গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে॥
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথাই বই॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই।
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মেলে কই!
ভক্তির কারণে, পাতাল ভুবনে বলিরাজার দ্বারে দ্বারী হয়ে রই।

মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না। সবাই সঙ্গে থাকতে হয় বলে, ভগবান সহজে ভক্তি দিতে রাজি হন না।

কর্ম

কর্মমাত্রই ভগবানের পূজা জেনে, তাঁর প্রীতির জন্যে যে কর্মানুষ্ঠান করে, সেও মুক্ত। কেননা নিরন্তর অনুধ্যান করায়, আপন অন্তরে সে ভগবানের বিকাশ উপলব্ধি করে।

অদ্বৈত জ্ঞান

অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর। দেখিসনে ময়রার দোকানে ছানা চিনি মেশায়ে একটা ঠাশা প্রস্তুত করে; পরে তা হতেই গোল্লা, বরফি, তালশাঁস, আতা সন্দেশ তৈয়ের করে। যেমন একই ছানা চিনির রূপান্তর নানা রকম সন্দেশ, তেমনই মানব-কল্যাণ-জন্য সেই একই সচ্চিদানন্দ বিভিন্ন নাম রূপ—শিব দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু, আবার জীবজগৎ হয়েও আপনাকেই প্রকাশ করছেন। পলতা হতে কলের জল এসে কলকেতার রাস্তায় আর লোকেদের বাড়িতে, কোথাও বাঘের মুখ, কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে যেমন সেই একই জল পড়ছে; তেমনই বিভু নানা রূপ ধরে খেলা করছেন।

মত না পথ

হিন্দুধর্ম বল, মুসলমানধর্ম বল বা খ্রীষ্টধর্ম বল, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের কথাই বলছে ; আর সেই এক এক মত আশ্রয় করে মানব তাঁকেই লাভ করছে। অতএব যত মত তত পথ। তুমি তোমার ধর্মমতে যেমন নির্ভর কর, অপরকেও তার ধর্মমতের উপর তেমনই নির্ভর করতে দাও।

উদারতা

গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চের দল, কলমির দাম ; কিন্তু স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদার বুদ্ধি দল বাঁধে না। কোনো বিষয়ে—ধর্ম বল, বিদ্যা বল, গানবাজনা বল, ঠিক ঠিক গুণী হলে তার উদার বুদ্ধি হয়।

সাধুসঙ্গ

ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশে, অধিকারী ভেদে ঠাকুর পূজা, জপ, ধ্যান করিতে বলিতেন ; কিন্তু সকলকেই কহিতেন, সদসৎ বিচার সতত আবশ্যক। আরও বলিতেন, তাঁর কাছে যাবার জন্যে রাজপথ হচ্ছে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা দ্বারা তাঁদের সদ্‌গুণ অলক্ষ্যে অন্তরে প্রবেশ করে, তাতে বিশেষ কল্যাণ হয়। চালুনি (চাল ধোয়া) জলে যেমন সিদ্ধির নেশা কাটে, সাধুসঙ্গে তেমনই সংসার-নেশা কেটে যায়। সাধু কি করে চিনিব বলায় কহেন—মাথায় জটা, গেরুয়া পরা বা গায়ে ছাই মাখা, কৌপীন তেলক পরা ফোঁটা কাটা সাধু—যারা ওষুধ দেয়, রোগ ভালো করে ইত্যাদি, তাদের কখনো বিশ্বাস করবিনে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি তার কি রকম আচরণ, তবে বিশ্বাস করবি। মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁকে দেখলে হৃদয়ে স্বতঃই ভগবদ্‌ভাবের উদ্দীপনা হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু।

একদেশী ভাব

একঘেয়ে ভাব ভালো নয়। পূজা করি বলে কীর্তন করব না, বা নাম করি বলে ধ্যান করব না, এ ভাব ভালো নয়। ভগবানকে ঝালে ঝোলে অম্বলে সকল রকমে আস্বাদ করতে হবে।

ভগবানে চিত্ত-সমর্পণ

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা চিঁড়ে কোটে ; একজন ঢেঁকিতে পাড় দেয়, অপর জন হাত দিয়ে চিঁড়ের ধান উল্টে দেয়, কুলাতে ঝাড়ে, আর ক্রেতা এলে, তার সঙ্গে দর-দাম করে ; কিন্তু মনটি রাখে যাতে ঢেঁকির মুগুরটি হাতে না পড়ে। তেমনই সংসারে যত কেন কর্ম কর না, মনকে সদাই ভগবৎপাদপদ্মে রাখবার চেষ্টা করবে, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে, যাতে তাঁকে অন্তরে দেখতে পাও।

আত্মবিশ্বাস

কেহ নিজেকে পাপী বা বদ্ধ বলিলে ঠাকুর কহিতেন—সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ, বন্ধন-মুক্তি সবই মনের খেয়াল। বিশ্বাস কর, তোমরা সেই অমৃতের পুত্র, তাঁর অংশ ; তখন পাপী দুঃখী বা বদ্ধ কি করে ? গীত ধরিলেন, ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। মা কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়। তবে যেমন ভাব তেমন লাভ তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়। আবার গীতি ঃ—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তরো কেমনে, তা জানা যাবে গো শংকরী ॥
আমি হত্যা করি ভ্রূণ, নাশি গো-ব্রাহ্মণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

এই ভাবটি আমাদের দৃঢ় করিবার জন্য একটি গল্প করিলেন ঃ—

এক বাঘের বাচ্ছা কোনো ঘটনায় ভেড়ার দলে মিশে আপনাকে ভেড়ার মতো ভাবত, ভেড়ার মতো ডাকত ও ঘাস খেত। দৈবাৎ কোনো একটা বাঘ তাই দেখে তাকে আড়ালে বোঝালে, তুমি ভেড়া নও, বাঘের বাচ্ছা। বিশ্বাস না করলে, তাকে জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে, জলের উপর উভয়ের প্রতিবিম্ব দেখায়ে বললে—আমিও যা, তুমিও তাই। তখন ভ্রম ঘুচে গিয়ে সে বাঘের মতো গর্জন করতে লাগল। বিশ্বাস কর, তোমরা তাঁর অংশ, তখন পাপী, বন্ধ কি করে? মহাপ্রভু বলেছেন—একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে।

ঈশ সহ সম্বন্ধ

শুধু ফাঁকা ফাঁকা ডাকলে রস হয় না। ভগবানের সঙ্গে বাপ, মা, সখা, প্রভু ইত্যাদি একটা সম্বন্ধ পাতায়ে ডাকলে তবে ভাব ঘন হয়, আর ভাব যত জমাট বাঁধে, ততই আনন্দ হয়; তবে ডাকার মতো ডাকা চাই। গীত—একবার ডাকার মতো ডাক দেখি মন শ্যামা মা কি থাকতে পারে। কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম আলো করে ॥

তাঁহাতে অনুরাগ

কৃপণের ধনে যেমন টান, সতীর পতির প্রতি যেমন টান, তেমনই টান ভগবানে হওয়া চাই, তবে তো কল্যাণ। প্রহ্লাদ বলেছেন—অবিবেকীর বিষয়ের প্রতি যেমন অনুরাগ, প্রভু! তোমাতে আমার যেন সেইরূপ অনুরাগ হয়। ছেলে মরে গেলে ঘটি ঘটি কাঁদে, ভাতার মরে গেলে কলসি কলসি কাঁদে; কিন্তু ভগবানের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল বেরোয় না।

ধ্যান

ঢাক বাজিয়ে—কি না আমাকে ভালো বলবে বলে লোকের সামনে উপাসনা করলে মনের অহংকার বাড়ে। তাই ধ্যান করবে কোণে, বনে আর মনে অর্থাৎ গোপনে। কেউ টের পাবে বলে ন্যাংটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার ছলে ধ্যান করত। রামপ্রসাদ বলেছে—তুমি লোক দেখানে করবে পূজা, মা তো আমার ঘুষ খাবে না।

উপাসনা

উপাসনা ততক্ষণ (তত দিন) আবশ্যক, যত দিন (যে পর্যন্ত) ভগবানের নামে অশ্রুপাত হলেও উপাসনা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সিদ্ধপুরুষ হয়েও ন্যাংটা ধ্যান করত; বলত—লোটাকে রোজ মাজা-ঘসা না করলে ময়লা ধরবে যে, অর্থাৎ মায়ার কুহকে মন ভগবান হতে অন্তরে পড়বে।

নিষ্ঠা

ইষ্টনিষ্ঠার ঘন মূর্তি মহাবীর রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—জানি প্রভো! শ্রীনাথ আর জানকীনাথে প্রভেদ নাই। তথাপি কমললোচন রামচন্দ্র! তুমিই আমার সর্বস্ব ধন।

দ্বৈতাদ্বৈত ভাব

হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—ঠাকুর! যখন আমি দেহ-বুদ্ধিতে থাকি, তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন জীব-বুদ্ধিতে থাকি, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। আর যখন আত্ম-বুদ্ধিতে থাকি, হে রাম! তখন আমি তোমার সঙ্গে অভেদ হয়ে যাই।

অনাসক্তি

সংসার আশ্রমে অনাসক্তভাবে থাকতে হয়। পরিবারবর্গকে ভগবানের বস্তু, আর আপনাকে তাঁর দাস ভেবে তাদের সেবা করতে হয়। কিন্তু মনে রাখা চাই, তাঁর ইচ্ছা হলেই আমাকে সরায়ে দেবেন। যেমন বাবুর বাড়ির চাকরানী বাবুর ছেলেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে, নিজের পয়সা দিয়ে তাকে খাবার কিনে দেয়, আবার তার ভালো সাজ-পাটের জন্য গিন্নীর কাছে দরবারও করে; কিন্তু সে জানে যে, বাবুর মর্জি হলেই তাকে বিদেয় করে দেবে।

ভক্ত-সংসার

কে বলে সংসারে থেকে ভগবান লাভ হয় না? মুনিঋষিদের অনেকেই তো সংসারী ছিলেন, তাঁদেরও তো ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তবে বে'-থা করবার আগে যখন মনটা ষোল আনা নিজের হাতে থাকে, তখন একচোট ভগবানের ভজন করে নিতে হয়; তাহলে পরে ততটা গোল বাধে না। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে যেমন হাতে আঠা লাগে না, ঠিক সেইমতো। তবে মন মুখ এক করে তাঁকে ডাকতে হয়; ভাবের ঘরে চুরি (কপট) হলে কিছুই হবে না। মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মরণ মনন করে, সে তো বীর ভক্ত। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, ঠিক শব-সাধনার মতো; শবের উপর বসে সাধন করবার সময় মাঝে মাঝে তার মুখে জল-ছোলা দিতে হয়, নইলে সাধকের ঘাড় ভেঙে দেবে। পরিবারবর্গের খাবার যোগাড়টা আগে করে দিতে হয়। ঘরে চাল নেই শুনলে উপাসনার ভাব কোথায় উড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে, অন্ততঃ কিছুদিনের মতো ভগবৎ আরাধনা না করলে তাঁর উপর নির্ভর আসে না, বা তেমন রসও পায় না।

সন্ন্যাস

বেপরোয়া হয়ে উঁচু তালগাছ হতে ঝাঁপ দেবার নাম সন্ন্যাস। বড়ই কঠিন; একেবারে আসক্তিহীন। তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো; নাগা সন্ন্যাসীরা মূর্খ গোঁয়ার হলেও, অন্তরে খুব একটা ত্যাগের ভাব আছে। এমন কি, চড়ক গাজনের সন্ন্যাসীরাও ভালো; তাদেরও অল্পবিস্তর ত্যাগ আছে।

সংসার ও সন্ন্যাসের প্রভেদ

এখন সংসার ও সন্ন্যাসের প্রভেদ দেখাইতেছেন। দেখিসনে খৈ ভাজবার সময় ভাজনা-খোলায় যে খৈগুলা থাকে, সাদা হলেও তাদের গায় ভাজনা-খোলার একটা রাঙাটে দাগ পড়ে যায়। আর যে খৈগুলা ছিটকে খোলার বাইরে পড়ে, তারা বেদাগ হয়। তেমনই সংসারাশ্রম থেকে সিদ্ধিলাভ করলেও সংসারের একটা দাগ লেগে থাকে। আর যারা সন্ন্যাসী, একেবারে আমিত্ব ত্যাগ করে, ভগবানের আরাধনায় প্রাণপাত করে, তারাই বেদাগ হয়। তবে দুই-ই কঠিন। যদি বল, লোক-কল্যাণ বড়ই অহংকার; তোর

কল্যাণ কে করে তার ঠিক নেই, তুই আবার লোক-কল্যাণ করবি ? ভক্ত হলেও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারে থাকায় তার অনেক ত্রুটি হয়, তার মাফ আছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর ত্রুটির মাফ নেই। স্ত্রীলোকের কাছে ভিক্ষে করেছিল বলে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন—বলেছিলেন, স্বকর্মফলভুক পুমান্।

আসক্তি

আসক্তি যাবার নয়। কৌপীন কো আস্তে এত্তা হুয়া। সাধু গাছতলায় থাকেন, গেছো ইঁদুরে কৌপীন কাটে, তাকে মারবার জন্য বেড়াল পোষা, তার দুধের চেষ্টায় গরু পোষা ইত্যাদি ক্রমেই পর্ব বেড়ে গেল।

আমিত্ব

আমিত্ব কিছুতেই যায় না। অমুকের ছেলে আমি, পণ্ডিত আমি ইত্যাদি। তুলনায় পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্য চলে যেতে পারে ; কিন্তু সাধু আমি, এ অহংকার কিছুতেই যায় না। রাধেগোবিন্দ বলবার সঙ্গে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমি সাধু ভেবে অহংকারও বেড়ে যায়।

মুক্তি

মুক্ত হব কবে, আমি যাবে যবে আমি মলে ঘুচায় জঞ্জাল। ভগবানের দর্শনলাভ হলে তবে আমিত্ব নাশ হয়।

সত্যাশ্রয়

সত্যাশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, আর সেই সত্যের উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অন্য সাধন-ভজন থাক বা নাই থাক, সত্যনিষ্ঠ হলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। যদি কোনো লোক ১২ বৎসর ধরে মনে জ্ঞানে সত্য কথা বলতে পারে, তার বাক্সিদ্ধ হয়। ঋষিরা সব সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে যা বলতেন, তাই ফলত।

শুদ্ধবুদ্ধি

এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে মাটি নিয়ে ফোঁটা কাটছে দেখে, আর এক ব্রাহ্মণ ও স্থানটা অপবিত্র বলায়, তিনি বলেন—নারায়ণ যখন ত্রিবিক্রম হয়ে, এক পদ দ্বারা সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করেছিলেন, তখন এ স্থানটা কি বাদ পড়েছে ? তাই অপবিত্র হয়েছে ? এরই নাম শুদ্ধবুদ্ধি।

নির্ভরতা

অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক টানতে টানতে যে আরাম হয়, নির্ভরতা ঠিক তাই। অর্থাৎ অনেক খাটা-খাটুনি—কিনা তপস্যার পর, হার মেনে ভগবানকে, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক' বলে নিশ্চিন্ত হবার নামই নির্ভরতা। রাম-প্রসাদ গেয়েছেন, যখন যে ভাবে কালী রাখিবে আমারে। সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি মা তোমারে॥ কোনো কারণে সুরেশবাবুকে বলেছিলেন—বেড়ালছানার কি সুন্দর স্বভাব, মা বই আর জানে না। বেড়াল তার ছানাকে মুখে করে গৃহস্থের বিছানাতে রাখলে তাতেও ম্যাও, আর ছাইগাদায় রাখলে তাতেও ম্যাও। মানুষ যদি সকল অবস্থায় মার (ঈশ্বরীর) উপর নির্ভর করে, তবেই সুখ পায়।

দান

বস্তুত্যাগ বিনা চিত্তপ্রসাদ (প্রসার) অসম্ভব, আমাদিগকে ইহাই শিখাইবার ইচ্ছায়, দানের মহিমা-কীর্তনস্থলে ঠাকুর কহিতেছেন—*দানে দুর্গতি খণ্ডে ; দানমেকং কলৌ যুগে। দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জ্ঞান ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি, বিনা দানে মথুরা পানে, যেতে* পারলে ব্রজেশ্বরী—রামপ্রসাদ গেয়েছেন। মনুয়ারে সীতারাম ভজন কর লিজে। ভুখে অন্ন পিয়াসে পানি ’লঙ্গে বস্ত্র দিজে।

নারদীয় ভক্তি

নাম-কীর্তন প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছেন ঃ—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি অর্থাৎ হরিনাম-সংকীর্তন অতি সহজ সাধন। নাম-সংকীর্তনের ফলে কর্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মন ভগবানে নিমগ্ন হয়। যোগানুষ্ঠানের ফল যে সমাধি, তাহাও নাম-সংকীর্তনে লাভ হয়। যেমন কীর্তন হচ্ছে—নিতাই আমার মাতা হাতি ; তখন নাচ, গান সুর, তাল, সবদিকে হুঁশ আছে। ভাব যত ঘন হতে থাকে, তখন গান-টান ভুলে বলতে থাকে হাতি হাতি। ক্রমে মন যখন ভগবৎপাদপদ্মে ডুবে যায়, তখন কীর্তনীয়া ‘হা’ বলিয়াই ভাবস্থ হয়। বলিতে বলিতে ঠাকুরও সমাধিস্থ হইলেন। ইহারই নাম আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।

শান্ত চিত্তে ভগবদ্বিকাশ

চঞ্চলমতিতে ভগবৎ-ভাবের স্ফুরণ হয় না, এইটি বুঝাইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন ঃ —মসজিদে মোল্লা সায়েব আল্লাহো, আল্লাহো বলে যতক্ষণ চিৎকার করে, আল্লা তার দিক দিয়েও যান না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাল্লাক হয়ে যখন চুপ মেরে বসে পড়ল, তখন অন্তরে আল্লার উপলব্ধি করে, আহ্লাদে কখনো দাঁড়াচ্ছে, কখনো হাঁটুগেড়ে বসে, মনে মনে কত প্রার্থনা জানাচ্ছে ; আবার কখনো বা মাটিতে দণ্ডবৎ পড়ছে। যেন আত্ম-নিবেদন করছে।

অহঙ্কার

পুজো বল, জপ বল, সবই মনের দ্বারা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু মন এতই বাঁকা যে, কিছুতেই বাগ মানে না। ঠাকুর বলিতেন—মনের স্বভাব ঠিক কুকুরের লেজের মতো, এই সিধে করে ছেড়ে দাও, আবার যা তাই। সুতরাং এমন মন নিয়ে আমাদের ভগবৎ আরাধনার আড়ম্বর শুধু চেষ্টা মাত্র। ইহাও প্রশংসনীয় ; কারণ, ভগবৎ-উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানও কল্যাণকর। অতএব উপাসনা চেষ্টায় স্ফীত হইয়া পাছে মনে করি যে, আমরা কি হইয়াছি। তাই আমাদের সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর কহিতেছেন ঃ —আরাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥ অর্থাৎ প্রাণ ভরিয়া হরির আরাধনা করিতে পারিলে, কায়ক্লেশপ্রদায়ক তপস্যার প্রয়োজন কি ? আবার একমনে হরির আরাধনা করিতে না পারিলে, বৃথা তপস্যায় কি ফল ? করুণাময় হরিকে আপন অন্তর ও বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারিলে তপস্যার কি আবশ্যক ? আবার ভাগ্যদোষে তাহা করিতে না পারিলে, তপ, জপ সবই বিফল।

রিপু নয় মিত্র

অনেকে বলেন, রিপুনাশ না হলে ভগবানলাভ হয় না। তাই প্রভু জনান্তিকে কহিতেছেন ঃ

—তোমাদের সায়েনে (সায়েন্সে) না বলে কোনো বস্তুর বিনাশ নেই, এক রকম না এক রকম অবস্থায় থাকে। তেমনই রিপুরও নাশ হয় না ; তবে মোড় ফিরায়ে দিতে পারলে, রিপুই আবার মিত্রের কাজ করে। যেমন কাম--এর জন্যে লোকে কতই না দুষ্কর্ম করে ; কিন্তু একে ভগবানের প্রীতি-কামনায় লাগাতে পারলে তাঁর দর্শনলাভ হয়। ক্রোধ মানে রাগ কিনা অনুরাগ—ভগবানে অনুরাগ কর। লোভ—টাকা-কড়ি বিষয়-আশয়ে লোভ না করে প্রভুর কৃপা পেতে লোভ কর। মোহ—অনিত্য বিষয়ে বা স্ত্রী-পুত্রতে আমার বলে মোহে না গিয়ে, ভগবানকে অতি আপনার জেনে মোহে যাও। যাতে মাতাল করে, তার নাম মদ। ঐশ্বর্য-মদে মত্ত না হয়ে ঈশ্বরের গুণগানে মত্ত হও। মাৎসর্য—কি না অহঙ্কার—আমি ধনী—আমি পণ্ডিত, আমি কি না করতে পারি বলে অহংকার না করে, আমি ভগবানের দাস, তাঁর পায়ে যখন মাথা দিয়েছি, তখন আবার কার খোসামুদি করব ? ইহার নাম মাৎসর্য।

কলিযুগ শ্রেষ্ঠ

চঞ্চলস্বভাব বানরকে ভিমরুলে দংশন করিলে সে যেমন আরও চঞ্চল হয়, মানবের চিত্ত ঠিক সেইরূপ। সদসৎ বিচার-পূর্বক সাধনাই মনকে স্থির করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু দেখা যায় বহু চেষ্টায়ও মন স্থির হয় না। তাই ঠাকুর বলিতেছেন ঃ—একেবারে শান্ত হলেই তো মনের মরণ ; কিন্তু কে আপনার মরণ চায় ? তাই মন চঞ্চল। মন স্থির হলে তাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব দেখে সাধক মুক্ত হয়ে যায়। এই মনকে স্থির করবার জন্য সত যুগে দশ হাজার বৎসর ত্রেতা ও দ্বাপরে হাজার হাজার বৎসর ধরে ঋষিরা সব তপস্যা করেছেন। কলিযুগ শ্রেষ্ঠ যুগ ; এই কলিযুগে যদি কেউ, যে কোনো উপায়ে হোক, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে মনকে স্থির করতে পারে, নিশ্চিত তার ভগবদ্দর্শন হয়।

ভগবৎলীলা দুর্বোধ্য

ভগবৎ-কথায় রামদাদার বাচালতা দেখিয়া ঠাকুর কহিলেন, ভালো রাম ! তুমি তার কি করলে ? দশ হাত জলের নীচে ইলিশ মাছ বেড়ায় তা খেলে পেট গরম হয়। আর ডাব নারকেল বিশ হাত উঁচুতে রোদ পাচ্ছে, তার কি না শৈত্য-গুণ। কামার বেটা সারা দিন আগুন-তাতে হাপর টানছে, তার কি না সর্দি, কেবল ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ছে। আর ডুবুরি জলের ভেতর ডুব গালছে, সে কি না মিছরির সরবৎ খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে। আর দেখ বিপত্তে মধুসূদন, যাঁর স্মরণ করলে সকল বিপদ ঘুচে যায়, সেই তিনি দাসের মতো যে পাণ্ডবদের সঙ্গে ফিরছেন, তাদেরই কি না যত বিপদ। তা রাম, যতই বল না কেন, ভগবানের ইতি করা যায় না, আর তাঁর লীলাও বুঝা যায় না।

ইষ্টত্যাগে ব্যভিচার

এক বাবাজীর মুখে সমদৃষ্টির কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, সে কি গো ! কণ্ঠীমালা তেলক-ছাপ, তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। যেমন এক আখের রস হতে গুড় ; চিটেগুড়, ওলা, মিছরি, চিনি সব ভিন্ন রকম হয়, তেমনই কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, স্বরূপে এক হলেও রূপে ভিন্ন। নিষ্ঠাবান সাধক এইটি জেনে আপন ইষ্টমূর্তির ধ্যানে ডুবে যায়। কিন্তু তা বলে কি সে অপর দেবতাকে ঘৃণা করে ?—তাদেরও ভক্তি করবে। পতিই পরম গুরু জেনে সতী স্ত্রী তাঁতেই মন-প্রাণ ঢেলে দেয় ; আর স্বামীর সম্বন্ধ বলে শ্বশুর দেবর

ভাসুর এদেরও সেবা ভক্তি করে। কিন্তু শয়নকালে স্বামীরই আশ্রয় নিতে হয়, না হলে যে ব্যভিচারিণী হবে। সেইরূপ স্বামীস্বরূপ আপন ইষ্টদেবতাকে পরিত্যাগ করে যে অন্য দেবতার অনুরাগ করে, সে তো ব্যভিচারিণী।

আমাদের কোন্ পথ ?

জিজ্ঞাসায় বলেন, আর্য ঋষিদের প্রবর্তিত সনাতন পথই অবলম্বনীয়।

গীতা

প্রভু কহেন—আধা (অর্ধেক) বৈরাগ্য আধা জ্ঞান, পুরো বৈরাগ্য পুরো জ্ঞান। গীতার কথা কাটা যায় না। গীতার তাৎপর্য হচ্ছে ত্যাগ। গীতা গীতা বলে জপ করতে করতে তাগী (ত্যাগীই) মনে উদয় হয়। অর্থাৎ হে মানব! সর্বস্ব ত্যাগ করে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ কর।

পরিশেষে রহস্য করিয়া কহেন—

কেহ কারো শিষ্য নয়, কেহ নহে গুরু।
যে যারে ঠকাতে পারে সেই তার গুরু॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

যুবকগণের উন্নতি-সাধন

যদিচ আপন আদর্শে যুবকগণের ধর্ম-জীবন গঠন করিতেছেন, তথাপি নানাভাবের ভক্ত-সংস্রবে যাহাতে তাহাদের ভাব-প্রসার হয়, এবং আদান-প্রদানও করিতে পারে, এই হেতু ঠাকুর যখন তাঁহার ভক্ত-ভবনে গমন করিতেন, তখন যাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেন। নব্যগণ ভক্ত-সমাজে কিরূপ আচরণ করে, তাহা লক্ষ্য করিতেন, এবং তদনুসারে তাহাদের দোষ-গুণ সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিতেন। অভিজাত নব্যগণ কেবলই যে কলিকাতার ভদ্র-সমাজে শিষ্টাচার শিক্ষা করিবে, এমত নহে, বরং যাহাতে তাহারা অশিক্ষিত জনসাধারণ, তথা নেড়া-নেড়ি, বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সহ মিলিত হইয়া তাহাদের আচরণ দর্শন এবং তাহাদের নিকট হইতেও ধর্মভাব শিক্ষা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঠাকুর—তাহাদের অনেককে সঙ্গে লইয়া পানিহাটির চিঁড়ার মহোৎসব হরিনামের হাটবাজারে গমন করেন।

চিঁড়ার মহোৎসব

দক্ষিণেশ্বরের ক্রোশ দুই উত্তরে গঙ্গার পূর্বতটে পানিহাটি গ্রাম। এই স্থানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে এক অনুরাগী বৈষ্ণব অবস্থান করিতেন। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। অতুল ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির একমাত্র বংশধর এবং পরমা রূপবতী নারীর স্বামী হইয়াও, ভগবৎপ্রেমে এতই অনুরক্ত হন যে, সংসারের বন্ধনস্বরূপ কামিনী-কাঞ্চনকে উপেক্ষা করিয়া অহর্নিশি হরিনামামৃতপানে বিভোর থাকিতেন। বন্ধুবর্গের উপদেশে তাঁহার পিতা কহেন—বৈভব ও সুন্দরী যাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না, তখন তাহার দেহকে আবদ্ধ করিলে কি ফল হইবে? তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য ও হরিভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রবণে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ এবং ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে নীলাচল হইতে ফিরিবার সময় জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাপ্রভু তথায় শুভাগমন করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতা, প্রেমাস্পদ পত্নী এবং লোক-কল্যাণ-আস্পদ ঐশ্বর্যকে অবহেলা করিয়া আমার প্রতি চিত্তার্পণ করায় অপরাধী হইয়াছ। সুতরাং তোমাকে অনুগ্রহরূপ নিগ্রহ করিবার অভিলাষে আমার আগমন। অতএব দণ্ডস্বরূপ, সভক্ত আমাকে সেবা করিয়া কৃতকর্মের ফলভোগ কর। প্রভুর কৃপামধুর শাসনে উল্লসিত হইয়া গোস্বামীজী তখনকার উপাদেয় ভোজ্য চিঁড়া, দধি ও ফল মিষ্টান্ন সংযোগে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যে উৎসব অনুষ্ঠান করেন, তাহাই চিঁড়ার মহোৎসব বা দণ্ড-মহোৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঠাকুরের গমন

সে কত কালের কথা। ঐ পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপন মানসে ঐ দিবস বৈষ্ণবকুল ঐ স্থানে সমবেত হইয়া হরিনাম-সংকীর্তনে এতই উন্মত্ত হন যে, বৈষয়িক চিন্তার আর অবসর থাকে না। এই কারণে ঠাকুর এই উৎসবকে হরিনামের হাটবাজার বলিতেন। যাহাতে বৈষ্ণবগণের মহানুদ্দেশ্য সার্থক হয় এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত হরিভক্তির স্রোতও প্রবাহিত থাকে, এই

অভিলাষে একাধারে ত্রিমূর্তি ঠাকুর (চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত) তথায় যাইয়া ভক্তগণকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করিতেন। তাই, যুবকগণসহ এবারও উৎসবে গমন করিলে, বৈষ্ণবগণ প্রভুর পুণ্য-দর্শনে উৎসাহিত হইয়া 'এই আমাদের নিতাই এসেছে' বলিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া মহানন্দে নৃত্য ও কীর্তন করিতে থাকেন। করুণাময় প্রভুও তাহাদের কল্যাণ-বাসনায় প্রায় সারাদিন কীর্তনানন্দে বিভোর হন। কিন্তু ঐ দিনে মেঘবর্ষণে সিক্ত হইয়া, আর্দ্র ভূমিতে নগ্নপদে নৃত্য করিবার পর নৌকাযোগে দেবালয়ে ফিরিবার কালে শৈত্য বোধ করেন। ইহাতে গলদেশে বেদনার সঞ্চার হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অসাধ্য গলরোগের সূচনা হয়; এবং এই সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভক্তগণকে একত্র করিয়া এক উদার সঙ্ঘেরও সূত্রপাত হয়।

ভক্তের মনস্তুষ্টি

ইতিহাসে দেখা যায়, ভগবান তাঁহার আশ্রিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য সদাই শঙ্কিত। সুতরাং নব-লীলায় উহার ব্যতিক্রম হইবে কেন ? পরদিন কোনো এক আশ্রিত অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালকের ন্যায় শঙ্কিতভাবে কহেন—'মাইরি, এতে আমার দোষ নাই। হরিনাম-সংকীর্তনে আমি আত্মহারা হই জেনেও রাম কাল আমাকে পেনেটির চিঁড়ার মহোৎসবে নিয়ে যায়। অবশ্য সঙ্গেও তোদের দু-চারজন ছিল। সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে নৃত্য করায়, ঠাণ্ডা লেগে গলায় একটু বেদনা হয়েছে।' রাম দাদার কার্যের প্রতিবাদ করায় কহেন—'ভাবিস নে, দু-চারদিন সাবধান থাকলে ভালো হয়ে যাবে।'

রক্ত নিঃসরণ

যদিও কলিকাতা হইতে ভক্ত চিকিৎসকগণ (তন্মধ্যে ডাক্তার নিতাই হালদার অন্যতম) দেবালয়ে যাইয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, তথাপি বেদনার সাম্য হয় নাই। পীড়া তো তাহার নির্দিষ্টকাল ভোগ করিবে, সে জন্য কি ভক্তসহ আলাপনে বিরত থাকিব, এই ভাবিয়া ঠাকুর নিজ দেহের রোগ-নিরাময় উপেক্ষা করিয়া, ভক্ত-মঙ্গলবাসনায় পূর্ববৎ ঈশ্বরীয় কথা বলায়, বেদনাস্থান হইতে সহসা একদিন রক্ত নিঃসরণ হয়।

ভক্তগণ উদ্বিগ্ন

বৈদিক যুগের ঋষির ন্যায় যোগেন-মা ও গোলাপ-মা ভগবৎ উপাসনায় সিদ্ধা বলিয়া ঠাকুরের নারী-ভক্তগণের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, এবং শ্রীমাতৃদেবীর নিতান্ত অনুগত থাকায় ঠাকুর ইহাদিগকে স্নেহ করিয়া জয়া-বিজয়া বলিতেন। সেই গোলাপ-মার আলয়ে, কোনো পর্বোপলক্ষে সমাগত ভক্তগণ যখন অবগত হন যে, বেদনাস্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়াছে, তখনই তাঁহারা উদ্বিগ্ন চিত্তে দেবালয়ে গমন করেন এবং কলিকাতায় আসিলে সু-চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া সকলে প্রার্থনা জানাইলে ঠাকুর সম্মত হন। তাঁহারা বাগবাজার পল্লীতে ভাগীরথী-সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীও মনোনীত করেন।

কেল্লাতে আগমন

দেহধারণে রোগ-সঞ্চার স্বতঃসিদ্ধ, এবং প্রতিকারকল্পে ঔষধ-সেবনও চির-অনুমোদিত। ঠাকুর বলিতেন, রোগ যেমন শিবের সৃষ্টি, ঔষধও তাঁহারই সৃষ্টি, রোগ হইলে ঔষধ-সেবন কর্তব্য। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে এই রোগের অবতারণা, তাহা তিনিই জানেন;

এবং কলিকাতায় অবস্থান করিয়া চিকিৎসা (তাঁহার বা আমাদের) নিমিত্ত সম্মত হন ; কলিকাতায় আগমনকালে নির্দিষ্ট ভবনটি দেখিয়া কহেন—এটি গঙ্গাযাত্রীর উপযুক্ত ; ভক্তগণসহ আমার আবাসের অনুপযুক্ত। সুতরাং বলরাম-মন্দির, (যাহাকে তাঁহার বাগবাজারের কেল্লা বলিতেন। কারণ, যে সমস্ত ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর গমনে সুযোগ হইত না, তাহাদের কল্যাণের জন্য মধ্যে মধ্যে এই ভবনে আসিয়া করুণা-প্রকাশে তাহাদের চিত্ত চিরদিনের মতো অধিকার করিয়া লইতেন।)—তথায় পদার্পণ করেন। বলা বাহুল্য, বলরামের ভক্তিতে প্রীত হইয়া প্রভু শতাধিকবার তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠান এবং বহুবার তথায় রাত্রিযাপনও করিয়াছেন।

চিকিৎসা

দক্ষিণেশ্বরে বিরাজকালে ভক্তগণ সুবিধামতো তাঁহার পুণ্য দর্শন এবং উপদেশামৃত পান করিয়া আসিতেন। উৎসব বা পর্ব উপলক্ষে অল্প সময় পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইলেও ঘনিষ্ঠভাবে মিলন বা ভাবের আদান-প্রদানে তেমন সুযোগ পাইতেন না। যত্নশীল হইলেও, বায়ু-চালিত ধূলিকণাতে দেহ যেমন মলিন হয়, তেমনই সংসার বা সমাজে বাস করায়, ভগবদ্ভক্ত হইলেও, মানবচিত্ত অজ্ঞাতসারে গ্লানিযুক্ত হয়। সেবাব্রত অবলম্বনে তাঁহারই অনুধ্যানে এবং ভক্তসহ তাঁহার লীলামৃত অনুশীলনে মালিন্য নাশ ও ভ্রাতৃভাবের পরিপুষ্টি হইবে, বোধ হয়, এই অভিসন্ধিতে ঠাকুর যেন পীড়ার চিকিৎসাচ্ছলে অথবা আমাদেরই সংসারবিকারশান্তির জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরামও অযাচিতভাবে ভক্তসহ ভগবানকে পাইয়া পরমানন্দে বরণ করিয়া লন। এখানে আপন রোগ নিরাময় ইচ্ছা করুন বা নাই করুন, নবাগত পিপাসুগণকে কৃপামৃতদানে পরিতৃপ্ত করিতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিত্যগোপালকে কৃপা

আজ রবিবার, অবকাশ-দিন বলিয়া অনেক ভক্ত প্রভুর সন্দর্শনে 'বলরাম-মন্দিরে' সমাগত। তন্মধ্যে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামী একজন। নানাভাবে ভগবৎ-প্রসঙ্গের পর কালীপদ ঘোষ ও কবিবর গিরিশচন্দ্র গীত আরম্ভ করিলেন—

আমায় ধর নিতাই,
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাতে,
লাগল সে ঢেউ প্রেম-নদীতে।
প্রেম-তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়ে যাই ॥
নিতাই ! খৎ লিখিলাম আপন হাতে।
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে।
কি দিয়ে শোধিব আমার প্রেমের মহাজন ॥
আমার সঞ্চিত ধন সব ফুরাল,
তবু ঋণের শোধ না হল।
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়ে যাই ॥

ভাবপ্রবণ গীতটি শ্রবণে ভাবময় ঠাকুর হয়তো ভাবিলেন—জীবদায়ে দায়ী আমি জীব-ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া যেন বিক্রীত হইলাম। অথবা প্রাণপাত করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিলাম না। অর্থাৎ এখনও অনেকে ভগবৎ-প্রেমে নিমগন হইল না। তাই বুঝি প্রভু ভাবাবেশে নিত্যগোপালের দিকে দক্ষিণ চরণ বাড়াইয়া দিলে, গোস্বামীজী কৃতার্থবোধে শ্রীপদখানি হৃদে ধরিয়া আঁখি-বারিতে অভিষেক করিতে থাকিলেন। ভাবাবসানে তাঁহাকে এবং তৎসঙ্গে অনুরাগী বৈষ্ণবগণকে মুক্তিপ্রদ তারকব্রহ্ম নাম বিতরণ মানসে কহিলেন—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যদি কেহ ভাবেন মহাবাক্যটি একবার বলিলেই তো হইত। শাস্ত্র বলেন—শিষ্যের দেহ-মন-বুদ্ধির বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার পরিশুদ্ধিকল্পে তিনবার বলাই বিধি, ঠাকুর বলিতেন—দেখিস নে, বিশ্রাম করবার ইচ্ছায় মাঝিরা যখন গঙ্গাতে হাজারমণী কিস্তি বাঁধে, একবার নগী পুঁতলে পাছে খুলে যায়, তাই পুঁততে ও তুলতে তিন-বারের বার নগী এমন পুঁতে যায় যে, বান ডাকলেও ওপড়ায় না। ভবপারের কর্ণধার কি না, তাই শিষ্য অন্তরে মহাবাক্য-রূপ নগী তিনবারে এমন বিদ্ধ করিলেন যে—সংসার ঊর্মিতে আর তাহার বানচাল হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

স্থানান্তর-গমনেচ্ছা

অভীষ্টদেবের সেবায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়া ধন্য হইব, বলরামের এইরূপ মহান আশয় থাকিলেও শিষ্টাচারসম্পন্ন ঠাকুর ভাবিলেন, বলরাম যদিও আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জন্য আনন্দমনে তাহার সকল অসুবিধাই ভোগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি উঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি কিরূপে শান্তিপ্রিয় কোমলকায় ভক্তকে অযথা ব্যস্ত করিতে পারি? সুতরাং অন্য কোনো সুপরিসর স্থানে গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্ত কালীপদ ঘরে বসিয়া ভগবান দর্শন করিব ভাবিয়া শ্যামপুকুর পল্লীতে তাঁহার ভবনের নিকট গোকুল ভট্টাচার্যের বাড়ি মনোনীত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্যামপুকুরের বাড়ি

পরিসর ও পরিচ্ছন্ন হইলেও দ্বিতলে মাত্র তিনটি ঘর। হল বা নাচঘর, যেটি দুটি অংশে বিভক্ত, সেইটি ঠাকুরের বাস জন্য নির্ণীত হয়। অপর দুটি ছোট গৃহ শ্রীমাতৃদেবীর আবাস ও সেবকগণের বিশ্রাম জন্য ব্যবহৃত হয়। নিম্নতলে রন্ধন, স্নান, শৌচাগার ও দর্শকদিগের আরামস্থান এবং প্রশস্ত আঙ্গিনা। এই বাটীতে আগমন করিলে ঠাকুরের চিকিৎসা, পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা হইল। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যথারীতি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, যুবক ভক্তগণ পর্যায়ক্রমে সেবানিরত হইলেন এবং পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বর হইতে আগমন করিয়া পথ্য-প্রয়োগের ভার লইলেন।

সেবকগণ

জগন্মাতার প্রেরণায় যাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সুতরাং আমাদের গুরুপুত্র রাখালরাজ (ব্রহ্মানন্দ), লাটু (অদ্ভুতানন্দ), গোপাল দাদা (অদ্বৈতানন্দ), যোগীন্দ্র

(যোগানন্দ), নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), ছোট বা হুটকো গোপাল সকল সময়ই থাকিতেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), শরচ্চন্দ্র (সারদানন্দ), শশিভূষণ (রামকৃষ্ণানন্দ) এবং শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরাম (প্রেমানন্দ) প্রভৃতি স্ব-আবাসে স্নানাহার করিয়া যথাসময়ে সেবা জন্য উপস্থিত হইতেন। যোগীন্দ্রনাথ ও বলরাম বাবু চিকিৎসককে সংবাদ দান, ঋষিকল্প মাস্টার মহাশয় (ম) এবং গিরিশ বাবু, খ্যাতনামা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে আনয়ন এবং অপরাপর ভক্তগণ ঔষধ, পথ্য ও আহার্য আহরণ করিতেন। আবার কেহ কেহ বা মনস্তুষ্টি বা রোগ নিরাকরণ অভিপ্রায়ে এলোপ্যাথি ডাক্তার ও কবিরাজ আনিতেন। চিকিৎসা কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতেই চলিত।

মাতৃদেবী-মাহাত্ম্য

প্রাচীন যুগে দক্ষরাজ-তনয়া ভগবতী সতী পিতৃ-মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া জগতে সতী-ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইদানিং নবযুগে ত্যাগ, তপস্যা ও করুণার প্রতিমূর্তি সেই পূর্ব-সতী ভগবতী শ্রীসারদা দেবী যদি তাঁহার অনবধানতায় স্বামীর কোনোরূপ অগৌরব হয়, এই আশংকায় দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে যেরূপ কঠোর ব্রতধারিণী ছিলেন, এখানেও তদ্রূপ আচরণ করিতে থাকিলেন। নারীজাতিকে পাতিব্রত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দেবী অর্ধাঙ্গী আপন অঙ্গ শোষণ করিয়া অপরার্ধ স্বামীর অনুধ্যান ও সেবানুষ্ঠানে প্রাণপাত করিবেন,—ইহা আর বিচিত্র কি ? সুতরাং এখানে বহু পুরুষ-পূর্ণ ভবনে অবস্থান করিয়াও কখন যে শৌচাদি সমাধা করিতেন এবং একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এমন নিস্তব্ধভাবে থাকিতেন যে, ভক্তমধ্যে অনেকেই তাঁহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ডাক্তার সরকার

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আগমন করিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল ঈশ্বরীয় কথায় অতিবাহিত করিতেন। বলিতেন, কি জানি তোমার উপর আমার এমন একটা অনুরাগ হইয়াছে যে, দেখিয়া যাইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কেবল তোমারই বিষয় ভাবি। এরূপ তো অন্য কোনো ধনী রোগী সম্বন্ধে হয় না। হয় তুমি আমাকে মোহিত করিয়াছ, নয় তো তোমার গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। দেখ না, বেলা অধিক হইয়াছে জানিয়াও তোমাকে ছাড়িয়া গৃহে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। রোগ-বৃদ্ধির আশংকায় সকলের সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করি বটে, কিন্তু আমার সহিত কথা কহিলে রোগ ততটা বৃদ্ধি পাইবে না। আমি চিকিৎসক কি না, অনেক বিবেচনা করিয়া অল্প কথায় তথ্য বুঝিয়া লই। তথাপি শিষ্টাচার জন্য সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না যে আমি স্বার্থপর। ডাক্তার সরকার মথুরবাবুর বন্ধু এবং ঠাকুরের পূর্ব-পরিচিত, সেহেতু 'তুমি' সম্বোধন করিলেও ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিতেন না বরং সমধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

নন্দন ও বিজ্ঞান

কোনো একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, দেখ ভগবানের বিষয় তুমি যাহা বল, বেশ বুঝিতে পারি, আর তোমার কথা শুনিতেও আনন্দ

পাই। (ব্যঙ্গভাবে) কিন্তু মহাত্মা-নন্দনের দলই—কৌশল্যা-নন্দন, যশোদা-নন্দন, মেরি-নন্দন, শচী-নন্দন এরাই যত গোল বাধিয়েছে। এই যে বিজ্ঞানের এত চর্চা করছি কেন? আশা করি, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করিতে পারিব।

করুণা প্রকাশ

বাক্যব্যয় না করিয়া কেবল করুণায় তাহাকে কৃতার্থ করিবেন ভাবিয়া ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে কহেন, কে জানে মা কালী কেমন গানটি করত। কিন্তু শান্তস্বভাব মাস্টার মহাশয়, পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, এই আশংকায় উচ্চরবে গান করিতে অক্ষম হওয়ায়, একটি যুবককে বলিলেন—তুই জোরে গান কর তো। সে গাহিল—

কে জানে মা কালী কেমন।
ষড়-দর্শনে না পায় দরশন॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন।
মহাকাল জেনেছেন মা কালীর মর্ম, অন্যে তা বুঝবে কেমন।
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন!

ঠাকুর ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না। (আত্ম-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রাণ বুঝিতে পারে, কিন্তু বিক্ষিপ্তস্বভাব মন বুঝিয়াও বুঝে না।

সরকারের দর্প-চূর্ণ

ঠাকুরের সম্মুখে যখন গীতটি হইতেছিল, তখন তাঁহার পশ্চাৎদিকের কক্ষে মনীন্দ্র গুপ্ত ন্যমক একটি বালক গান শুনিয়া সমাধিস্থ। লাটু দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাবাবেশে পাছে পড়িয়া যায়, তাই নিরঞ্জন তাহাকে সামলাইতে যাইয়াই তদবস্থ—দৃশ্যটি অপূর্ব। কারণ, ভগবানের নাম-গান শ্রবণে যে এমন ভাব হয়, সচরাচর তো দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঠাকুর, সরকার মহাশয়কে বলিলেন—'তুমি তো একজন বড় ডাক্তার। দেখ দেখি, হঠাৎ ওদের কেন এমন হল?' ডাক্তারপ্রবর প্রথমে হস্ত, পরে পদ, তৎপরে যন্ত্রযোগে হৃৎপিণ্ড, পরিশেষে চক্ষুমধ্যে অঙ্গুলি প্রদানে সর্ববিধ পরীক্ষা সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলেন,—বিজ্ঞান-শাস্ত্রমতে উহারা মৃত। জন্মস্থান কামারপুকুরের নিকট ফুলুই-শ্যামবাজারে কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া ঠাকুরকে ক্ষণে অচেতন, ক্ষণে চেতন হইতে দেখিয়া তথাকার লোক বলিয়াছিল,—এমন এক আশ্চর্য মানুষ এসেছে যে, হরিনাম-কীর্তনে দণ্ডে দণ্ডে মরে, বাঁচে। তখন তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার কৃপালব্ধ সন্তানগণের যে ঈদৃশ অবস্থা ঘটিবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? সমাধিমুক্ত হইয়া ছেলেরা পরম দেবতার শ্রীপদে প্রণাম করিতে আসিলে, সরকার মহাশয় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহেন—দেখছি এ সমস্ত তোমারই খেলা। আজ আমি তোমার কাছে পরাজিত; আমার বিদ্যাভিমান, এমন কি সকল অভিমানই চূর্ণ হইয়া গেল। তুমি যদি বল, তোমার দর্শনে যত লোক আসিয়াছে, তাহাদের পাদুকার মালা গলায় পরিয়া আমি স্বচ্ছন্দে পথে যাইতে পারি। ঠাকুর তখন স্মিতমুখে কহিলেন,—তুমি মহৎ ব্যক্তি, তোমার কথাই কাজের সমান।

চতুর্থ অধ্যায়

শরৎকাল—দুর্গাপূজা

বর্ষাবসানে ধরিত্রী যখন জীবগণের প্রাণাধার, লক্ষ্মীরূপা, পীত ও হরিদ্বর্ণ ধান্য-ধনে বিভূষিতা হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন, যখন বৃষ্টিধারা ও ঝঞ্ঝাবাতমুক্ত পাদপগণ স্নাতক ব্রহ্মচারীর ন্যায় শান্তচিত্তে ভগবৎ-অর্চনে উন্নতশীর্ষ হইয়াছে, যখন সুনির্মল সরসীতে কুমুদিনীকুল বিভুপদে অর্ঘদান-আকাঙ্ক্ষায় প্রস্ফুটিত হৃদয়ে ভক্তি-সৌরভে দিক আমোদ করিয়াছে এবং প্রসাদলুব্ধ মধুকর তাহাকে বেষ্টন করিয়া বন-বন, ভন-ভন শব্দে ঈশ-গুন-গান করিতেছে, তখন বিমর্ষ ছায়া মেঘরাশিকে বিতাড়ন করতঃ আনন্দ হাস্য করিতে করিতে সুখময় শরতের অভ্যুদয় হইল। প্রকৃতির এই আনন্দভাব দর্শনে, ভাবপ্রবণ বাঙালীর অন্তরে পরমাপ্রকৃতি শ্রীদুর্গার শারদীয়া পূজাকাল জাগরিত হইল ; এবং কি ভাবে আনন্দময়ীর অর্চনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব, এই ভাব ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই চিত্তে অল্পবিস্তর প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারাই কেবল কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ—এই মহাপূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আবাহন না করিলেও মহামায়ার আগমনে শুভ হইবে জানিয়া অপর সাধারণেও সাহচর্য করিতে অগ্রসর হইল।

বাঙালীর জাতীয় উৎসব

শারদীয়া পূজাটি বাঙালীর জাতীয় উৎসব। ভক্ত-বৎসলা ভগবতী সন্তানগণের দুষ্কৃতি-নাশ-বাসনায় কন্যারাশি আশ্বিনে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। সুতরাং স্নেহলতা কাত্যায়নীকে কি ভাবে আদর করিব, কি সাজে সাজিয়া তাঁহাকে সাজাইব এবং ঈর্ষাদ্বেষ ভুলিয়া কিরূপে তাঁহার বিশ্বসন্তানদের প্রীত করিব—এই ভাবনায় সমগ্র বাঙালীই যে যথায় থাকুন না কেন, এক অভিনব আনন্দভাব ধারণ করেন। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বলে—যাহারা দুর্গাপূজা করে, তাহারাই বাঙালী। বঙ্গবাসী সুদূর দেশে অবস্থান করিলেও, কোনো না কোনো প্রকারে তথায় শ্রীদুর্গামাতার পূজা করিবেই করিবে।

ভাবাবেশে পূজাগ্রহণ

এই প্রেরণায় ভাগ্যবান সুরেন্দ্রনাথ পরিবারবর্গের প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গামাতার পরিপূজনে আগ্রহান্বিত হইলেন, এবং ঠাকুরের অনুজ্ঞা লাভে উল্লসিত হইয়া মহাপূজায় তৎপর হইলেন। এক অদ্বিতীয় হইয়াও জীবকল্যাণ জন্য যিনি অর্ধনারীশ্বর হইয়াছিলেন এবং যুগে যুগে জগন্মঙ্গল-কল্পে যিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করেন, সেই ভক্তবৎসল প্রভু মহাষ্টমী দিনে শুভ সন্ধিক্ষণে ভাবাবেশে জ্যোৎমার্গে পূজামণ্ডপে যাইয়া দেখেন যে, সুরেন্দ্রের ভক্তিযোগে প্রতিমাতে জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছে, আর তিনি গদগদভাবে মা, মা, বলিয়া রোদন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেন, মোহনীয়া প্রতিমা, শ্রদ্ধাবান পূজক এবং তদ্গতচিত্ত ভক্তের সমাবেশ হইলে তথায় ভগবতীর আবির্ভাব হয়। প্রভুর কৃপায় এখানে তাহাই ঘটিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের পূজা গ্রহণান্তে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানগণকে সমস্ত ব্যাপার কহিয়া জগন্মাতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে সকলকে সুরেন্দ্র-ভবনে পাঠাইয়া দেন।

শ্রীকালী

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকেই কলন করেন বলিয়াই নাম কাল। সেই কালকে নিগ্রহ করিয়া যিনি আনন্দে নৃত্য করেন, তিনিই—কালী। অরূপা হইয়াও যাঁর রূপ-কল্পনা—তিনিই মেঘবরণা শ্যামা। অবিরাম বিশ্বপ্রসবে উলঙ্গিনী, অথবা বালিকার মতো লীলাবিলাসে উন্মত্তা, তাই উলঙ্গিনী। সৃষ্টি-স্থিতি-পালনে দয়ার্দ্রচিত্তে সুখপ্রসন্নবদনা, বরাভয়করা। আবার সংহার-বাসনায় করালবদনা ও অসিমুণ্ডধরা। যখন কিছুই ছিল না, কেবল আপনিই বর্তমান, তখনও বিদ্যার বীজস্বরূপ বর্ণমালাই মুণ্ডমালারূপে মায়ের গলায় শোভমান। নানা বর্ণ অর্থাৎ নাম, রূপ, ভাবকে নিজ অঙ্গে লীন করিবেন, তাই বুঝি আঁধার-বরণা। ভক্তের জন্ম-মরণ-দক্ষিণান্ত করিতে মুক্তকেশী দক্ষিণ চরণখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন। সন্তান-কল্যাণে বিপরীত আচরণে অর্থাৎ বামা হইয়াই দক্ষিণপদ প্রসার, তাই বুঝি লজ্জায় মৃদুহাস্যে দশনে জিহ্বা চাপিতেছেন।

ফলতঃ একাধারে এমন সৌম্যা ও ভীমা ভাবের প্রকাশ, যেন, পরব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া বোধ হয়। যিনি এতই মহিমময়ী, কিরূপে তাঁর দিব্যদর্শন লাভ হইবে,—তাই বুঝি অভয়। শবাসনা হইয়া দেখাইতেছেন যে, শিবের মতো হৃদয় শব অর্থাৎ নির্বিকল্প হইলে, তবে তাহাতে তাঁহার উদয় হইবে। এই আলোক আঁধাররূপা আদ্যামাতার শ্রীচরণে যাহারা আশ্রয় লয়, তাহারা যে জাতি বা বর্ণ হউক না কেন, কিংবা যে রকম আচরণ করুক না কেন, তাঁহার কাছে সকলের মান তুলামানে সমান মান হয়। তাই তুলারাশি অমানিশায় ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং তাঁহার অর্চনায় কৈবল্য নিশ্চিত জানিয়া সকলেই এই কৈবল্যদায়িনীর পূজার আগ্রহ করিয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ-কালী

তাই প্রভু ভক্তগণকে কহিলেন, আজ আদ্যাশক্তির আবির্ভাব তিথি, তোমরা সাত্ত্বিক-ভাবে তাঁহার পূজার আয়োজন কর। সন্ধ্যার পর ভক্তগণ পূজোপচার আনিয়া দিলে ঠাকুর ভাবভরে নিজ শিরে পুষ্প দিয়া কহিলেন—তোমরা সব মা কালীর ধ্যান কর। সকলে তাহাই করিল। কিন্তু ঠাকুর যাহাকে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা ভক্তিমান বলিতেন, সেই গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, প্রত্যক্ষ দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া কিরূপে অপর দেবতার ধ্যান করিব? সুতরাং প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া যেমন তিনি প্রভুর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, দিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনিই প্রসন্নবদনা ও বরাভয়করা হইয়া এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন আমরা সকলে পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। ফলতঃ প্রভুর এমন আনন্দঘনরূপ আমরা ইতিপূর্বে দর্শন করি নাই। এ রূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই উপভোগ্য।

স্থান পরিবর্তন

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে উপযুক্ত চিকিৎসা, যুবকদিগের আপ্রাণ সেবা ও শীতাংশ-সমাগমে অথবা যে কারণেই হউক পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম হইলে, ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে কলিকাতার বাহিরে অথচ নিকটস্থ কোনো মুক্তবায়ু স্থানে লইয়া যাইবার অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ, এরূপ স্থানে কলিকাতা অপেক্ষা আরও অধিক স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

কাশীপুর

কলিকাতার উত্তরাংশে কাশীপুরে ৺সর্বমঙ্গলাদেবী মন্দিরের নিকট রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর উদ্যানবাটীটি মনোনীত করা হইল। উদ্যানটি বৃহদায়তন, এবং বিবিধ ফল-পুষ্প বৃক্ষে শোভিত, সদর রাস্তার পূর্ব-পার্শ্বস্থিত। পূর্বাস্যে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইলে দ্বিতল বাটী পাওয়া যায়। উপরতলে প্রশস্ত খোলা ছাদ-সংযুক্ত একটি সুপরিসর গৃহ, যথায় প্রভু অধিষ্ঠান করেন। পার্শ্বস্থ একটি ছোট ঘর রাত্রজাগ্রত সেবকগণের নিদ্রাস্থান। নিম্নতলে বড় গৃহটি ভক্ত-সম্মেলন এবং অপর দুইটি শ্রীমাতৃদেবীর আবাস ও সেবকদিগের বিশ্রাম স্থান। তদ্‌ভিন্ন পাকশালা ও যুবকদের সাধন-ভজন জন্য দুইটি পৃথক একতল গৃহ। বাড়িটির পূর্ব ও পশ্চিমদিকে স্বচ্ছ জলপূর্ণ সানবাঁধানো দুইটি পুষ্করিণী। বস্তুতঃ উদ্যানবাটীটি সকল বিষয়েই স্বাচ্ছন্দ্যময় হইয়াছিল। রেলবিস্তারকল্পে ইহা এখন সরকার বাহাদুরের অধিকৃত। পক্ষান্ত বা মাসান্ত কাল স্থানান্তর গমনে অশুভ জানিয়া, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির পূর্বদিন শুভবোধে শুভচণ্ডী শ্রীমাতৃদেবীকে অগ্রে করিয়া, সর্বাশুভ-নাশক প্রভুকে লইয়া ভক্তগণ কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেবানুষ্ঠান

যুবক সেবকগণ সুকুমার ও সুখপালিত হইলেও, ভবানীপতির ভূতগণমতো অক্লান্ত শ্রমে তাঁহাদের পরম দেবতার সেবার সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা করিলেন। উৎসাহ অভাবে অনভ্যস্ত ক্লেশকর কর্ম পাছে শরীর ও মনের অবসাদ আনয়ন করে, সেজন্য আনন্দ উৎস নরেন্দ্র-নাথ তাঁহাদিগকে সদালাপ ও সুমধুর গীতে উৎসাহিত করিতে থাকেন। জানিতেন যে, ইহারা প্রফুল্ল থাকিলে প্রভুর সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চলিবে। এক ব্যক্তির উপর এককালে একাধিক কার্যভার অর্পণ করিলে কোনোটিই সুসম্পন্ন হইবে না জানিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ কাহাকেও ডাক্তারের নিকট পীড়ার সমাচার দানে ঔষধ আনয়ন, কাহাকেও পথ্য সংগ্রহ, কাহাকেও বা আহার্য আহরণে নিয়োগ করিলেন। ভালোবাসায় একপ্রাণ হইলেও, পঞ্চপ্রাণ পাঁচজনকে পর্যায়ক্রমে ঠাকুরের শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং সকল ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলেন। সময়-পরিমাপক যন্ত্র (ঘড়ি) একবার পরিচালিত হইলে যেমন অবাধে চলিতে থাকে, প্রভুর পরিচর্যা ঠিক সেইমতো চলিতে লাগিল। এদিকে গৃহী ভক্তগণ সাধ্যমতো অর্থযোজনা, সুচিকিৎসা ও স্বচ্ছন্দবাস জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

আপন ব্যবস্থা আপনি করিলেন

অনুরাগের অর্চনায় প্রীতা হইয়া জগন্মাতা যাঁহাকে পুরস্কাররূপ প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সেই তিনি এখন কিরূপে ভক্তসংগৃহীত অর্থে (চাঁদায়) দেহধারণ করিবেন ? অথবা শুদ্ধসত্ত্ব বলরামের শুভ কামনায় তাঁহাকে কহেন—আমার পথ্যাদি যা-কিছু তুমিই যোগাবে। আবার উদারবুদ্ধি সুরেন্দ্রনাথকে বলেন—জানো তো এরা সব (ভক্তগণ) কেরাণী নারাণী, তুমি আমার থাকবার বাড়িভাড়াটা দিও। তাহাতে বলরাম ও সুরেন্দ্র আপনাদিগকে ভাগ্যবান ভাবিয়া, সানন্দে সম্মত হন।

ভক্তদের আনন্দ

শীতাগমে উপবন অবস্থানে স্বাস্থ্যোন্নতি দর্শনে ভক্তকুলের বিপুল আনন্দ হইল। ভাবিলেন, নিরাময়-কামনায় ভগবৎ-সন্নিধানে প্রার্থনা, প্রাণপাত সেবা এবং পোষ্যবর্গকে বঞ্চনাপূর্বক অর্থযোজনা সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল।

যুবকগণের মনোভাব

একে অভিজাত, তাতে মেধাবী ছাত্রজীবন, আবার কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, ইহাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, পাঠসমাপনে সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিভাবলে না-জানি কত গণ্যমান্য ব্যক্তি হইবেন? এবং সেই সঙ্গে স্ব স্ব সংসার, তথা বহু সংসার-সমষ্টি সমাজ ও স্বদেশের কতই না উন্নতি করিতে পারিবেন; কেবল তাঁহারা কেন, তাঁহাদের অভিভাবকদিগেরও অন্তরে এক সময় এই সুখাশার সঞ্চার হইয়াছিল এবং হওয়াই সম্ভব।

সাধনস্পৃহা

ঠাকুর বলিতেন—কলম বাড়া (ঢালু) পথ দিয়া কেল্লা প্রবেশকালে লোকে বুঝিতে পারে না যে, সে কত নীচে যাচ্ছে। তেমনই এই মহামনা যুবকগণ প্রভুর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণে অজ্ঞাতসারে কত উচ্চ মার্গে যাইতেছেন, তাহা চিন্তা করিবার অবসর ঘটে নাই। অগ্নি-নিকটস্থ-হবি দ্রব হইয়া যেমন অগ্নিপানেই ধাবিত হয়, তেমনই ইহাদের নির্মলচিত্ত প্রভুর সান্নিধ্যে বিগলিত হইয়া দিন দিন তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছিল।

তাই তাঁহারা ভাবিলেন—ঠাকুর যখন পূর্বাপেক্ষা সুস্থ আছেন, তখন অযত্নলভ্য এই নিভৃত স্থানে তাঁহারই উপদেশমতো অল্পবিস্তর সাধন করিবার সুযোগ আসিয়াছে। কেবল ব্রহ্মচর্য পালনে যদি ভগবানলাভ হয়, তাহা হইলে মল্লদিগের ভগবদ্দর্শন হইত। শাস্ত্রচর্চায় যদি কৈবল্য হয়, তবে পণ্ডিতগণও মুক্ত। দারিদ্র্যে যদি শ্রেয়লাভ হয়, ভিখারীরা তাহলে পূর্ণকাম হইয়াছে। সকল দুঃখের মূল বাসনাকে বর্জন করিতে না পারিলে এবং ঋষিবালকদের মতো গুরুসেবায় প্রাণপাত করিতে না পারিলে জ্ঞান বল, ভক্তি বল বা ভগবৎসাক্ষাৎকার বল, কিছুই হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা অধিকতর উদ্যমে প্রত্যক্ষ দেবতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং অবসরকাল অবহেলা না করিয়া, আমিই সেই বিভুর অংশ এবং তিনিই আমাতে বিদ্যমান ভাবিয়া, গুরু, মন্ত্র ও ইষ্ট অভেদজ্ঞানে জপ-ধ্যানাদি করিতে থাকিলেন।

সেবাই শ্রেষ্ঠ সাধন

পর্যায়মতো সেবা করিয়া যিনি যেমন অবসর পাইতেন, অমনই নির্জন গৃহে যাইয়া ধ্যানে বসিতেন। কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু, ভ্রাতৃবৎসল, হৃদয়বান শরচ্চন্দ্র নির্দিষ্টকাল পরিচর্যা করিয়াও অন্য ভ্রাতাদের অবসর দিতে আরও অধিকক্ষণ প্রভুর নিকট অবস্থান করিতেন; ইহাতে ঠাকুর তাঁহার প্রতি সমধিক প্রসন্ন হন, আশীর্বাদ করেন, যাহাতে তাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি হয়। একনিষ্ঠ শশিভূষণই কেবল পর্যায়বিধি লঙ্ঘন করিয়া, কোনোমতে স্নানাহার সমাপনে সদাসর্বক্ষণ যেন ছায়ার ন্যায় প্রভুপার্শ্বে বিদ্যমান থাকিতেন; বলিতেন—মূর্ত ভগবান-জ্ঞানে যাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহাকে অনাদর করিয়া, কোন সুখে অদৃশ্য দেবতার (পরমাত্মার) আরাধনা করিব? ইহারা সকলেই যখন দিক্‌পাল, তখন গুণ যশ কব কার?

ধুনি প্রজ্বলন

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কতিপয় যুবক ভাবিলেন—নিত্যই তো গৃহমধ্যে ধ্যান করি, আজ নাগা সন্ন্যাসীর মতো ভস্ম মাখিয়া, ধুনি জ্বালিয়া মুক্তাকাশতলে ভগবচ্চিন্তা করিব। কিন্তু সাধুদিগের মতো সংস্কৃত ভস্ম কোথায় পাইবেন? সুতরাং অনুকল্পে টিকাভস্ম কি না তামাক খাওয়া টিকার ছাই অঙ্গে মাখিয়া নাগা সাজিলেন। পৌষ মাস, দারুণ শীত, ধুনির কাষ্ঠই বা কোথায়? আবার অগ্নি বিনা নগ্নদেহে গগনতলে ধ্যানের পরিবর্তে কম্পনই সম্ভব! অগত্যা শুষ্ক পর্ণরাজি সংগ্রহ করিয়া ধুনি জ্বালিলেন এবং তাহার পার্শ্বে ধ্যানে বসিলেন।

বাসনাদগ্ধ

'হবির্দানে হোমাগ্নির ন্যায় ইহাদের পূর্ণাহুতিতে সেইমতো অগ্নিশিখা দেখিয়া, আনন্দে বা কি জানি কোন্ প্রেরণায় ভাবিলেন—যেন সংস্কারজাত বাসনা দগ্ধ করিতেছি। ঐকান্তিক ভাবে সং উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম অঙ্গহীন হইলেও, মহৎ ফল প্রসব করে। সুতরাং অল্পদিন ঈদৃশ অনুষ্ঠানে, অথবা ফলদাতা প্রভুর কৃপায়, ইঁহাদের ধারণা হয়, যেন নীচ বাসনা সকল ধীরে ধীরে দগ্ধপ্রায় হইতেছে।

নরেন্দ্রনাথের উকিল হবার ইচ্ছা

ইতিপূর্বে যদিও নরেন্দ্রনাথ প্রভুর কৃপায় প্রকৃত আমি-আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক বোধ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি পিতৃবিয়োগে মায়ার তাড়নায়, মাতৃ-ভ্রাতৃ-পালনে অর্থার্জনে নিরত হইতে হয়; এবং তজ্জন্য পিতৃবৃত্তি ব্যবহারজীবীর পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত হন। অভিলাষ–কোনোমতে ইহাদের একটা উপায় করিতে পারিলেই নিষ্কৃতি। সুতরাং উদ্যান-বাটীতে আসিয়াও মধ্যে মধ্যে দু-চার পাতা আইন-পুস্তক পড়িতেন। কিন্তু প্রভুর সেবা এবং আত্মসাক্ষাৎকার মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল। কারণ, দক্ষিণেশ্বর অবস্থানকালে ঠাকুর তাঁহাকে একদিন কহেন–আগে তোর মা-ভাইদের এক মুঠ অন্নের যোগাড় করে আয়, তোকে পরমহংস করে দেব।

অতুলের অনুযোগ

কারণ না জানিয়া অতুলবাবু (নাড়ীজ্ঞান থাকায় ঠাকুর যাঁহাকে হাত দেখাইতেন) প্রভুর নিকট অনুযোগ করেন–আপনারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, অর্থবাসনায় লোকের রোগ কামনা, বিষয় জন্য বিবাদ বাধানো এবং অযথা মিথ্যাভাষণে ডাক্তার, উকিল ও দালালদের ধর্ম হয় না। কিন্তু দেখিতেছি, এখানে আসিয়াও নরেনবাবু ওকালতি পরীক্ষায় সচেষ্ট। ঠাকুর কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুহাস্য করেন মাত্র। আমার মতো বুদ্ধিমান অতুলচন্দ্রের ঘটে আসে নাই যে, আপন প্রতিনিধি করণ ইচ্ছায় যাঁহাকে বিশেষভাবে গঠন করিতেছেন, এবং ভাবীকালে যিনি বহু ব্যক্তিকে ইতর ব্যবহার-মুক্ত করিয়া ভগবৎপথে চালিত করিবেন, সেই প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ কি তাঁহার ন্যায় ব্যবহারজীবী হইবেন?

নরেন্দ্রের গৃহত্যাগ

ভগবৎলীলা দুর্বোধ্য! ঠাকুর বলিতেন—যিনি ডাঙায় নৌকা চালান, তাঁর খেলা বুঝা যায় না। অতুলের অনুযোগের দু-চার দিন পর, হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো একবস্ত্রে ও নগ্নপদে গিরিশ-ভবনে উপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসায় বলেন–অবিদ্যামাতার

মৃত্যু ও বিবেক পুত্রের জন্ম-অশৌচে এই অবস্থা। গিরিশবাবুর অনুরোধে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কাশীপুর উদ্যানে যাইয়া চিরদিনের মতো আত্মনিবেদনছলে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইলেন।

ঈশ্বরকোটি

বিভিন্নভাব-সমন্বিত ভক্তহৃদয়ে যখন শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান, তাঁহারা যে জাতি হউন না কেন, সকলেই দেবোপম। তথাপি ইঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, বাবুরাম ও যোগীন্দ্রকে ঠাকুর ঈশ্বরকোটি অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলিতেন। কহিতেন—লাউ-কুমড়োর যেমন আগে ফল, পরে ফুল, ইহারা সেইরূপ। ঈশ্বরেচ্ছায় সিদ্ধপুরুষ হইয়াই জন্ম, পরে সাধন, লোকশিক্ষার জন্য।

ধর্ম-প্রচার-ভার

মাধুর্যপূর্ণ যে সার্বভোম ধর্ম উপদেশ করিলেন, ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া কালে যাহাতে বহু লোকের কল্যাণ সাধিত হয়, এই অভিপ্রায়ে ঠাকুর এখন সেবকগণকে নানা-ভাবে গঠন করিতে লাগিলেন। গৃহিগণ সংযম ও ভক্তিপরায়ণ হইলেও, সংসার-পালনে ব্যাপৃত থাকায়, সময়াভাবে সমর্থ হইবে না জানিয়াই যুবক সেবকদের উপর ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন; এবং যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত সাধু বা আদর্শ-মনুষ্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। যিনি আপ্তকাম, তাঁহার বাসনা নিশ্চিতই ফলবতী হইবে।

সেবকগণ হাজারি

মহাপীঠে শ্রীকালী মাতার অর্চনা করিয়া উত্তরায়ণ সংক্রমণে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান এবং নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শনে ভেদবুদ্ধির পারে যাইবেন ভাবিয়া, অনেক সাধু তখন পৌষমাসে কলিকাতায় আসিতেন, এবং দিন কতক জগন্নাথ ঘাটে বিশ্রাম করিয়া, সময়মতো অভিলষিত স্থানে যাত্রা করিতেন। প্রবীণ হইয়াও সঙ্গগুণে নবীন, গোপালদাদা অদ্বৈতানন্দ কতিপয় সাধুকে গৈরিক-বসন ও রুদ্রাক্ষমালা দানের বাসনা জানাইলে, ঠাকুর কহেন—'আমার এই যুবক-সেবকরা হাজারি, অর্থাৎ প্রত্যেকেই হাজার সাধুর সমান, তুমি ইহাদেরই সৎকার কর।' তদনুসারে গোপালদাদা ঠাকুরের সমক্ষে যুবক-গণকে ত্যাগ ও পবিত্রতার পরিচায়ক গৈরিক বসন, এবং প্রভুর করকমল-শোধিত, শঙ্কর-ভূষণ, সুতরাং শিবত্ব-প্রতিপাদক রুদ্রাক্ষমালা পরাইয়া প্রসাদী মিষ্টান্নে পরিতোষ করিলে ঠাকুর আনন্দ বোধ করেন।

ভিক্ষা-মহিমা

সদ্বংশজাত সুশিক্ষিত সন্তানগণ ভগবৎলাভ বাসনায় বৈরাগ্য ও সেবাব্রত বরণ করিলেও দুর্বার অহমিকা সহজে নাশ হইবার নহে জানিয়া, ঠাকুর ইহাদিগকে তৃণ অপেক্ষা লঘু অর্থাৎ অমানী করিবার অভিপ্রায়ে ভিক্ষাটনে প্রেরণ করিলেন। বিশ্বজননী মহেশ্বরী যিনি শ্মশানবাসী শঙ্করকে প্রসন্নতারূপ অন্ন-দান করিয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং সারদেশ্বরীরূপে তাঁহার কুমার সন্ন্যাসীগণকে আশীর্বাদ-স্বরূপ অন্ন ও অর্থ ভিক্ষা দিলেন। ভিখারীর আবার মর্যাদা কোথায়? এই ধারণাটি হইলে পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে না। যুবকগণের তাহাই হইয়াছিল বলিয়াই, কোথাও

বিতাড়িত, কোথাও বা 'গুন্ডার মতো ছোঁড়ারা খেটে খেতে পারে না, ট্রামের কন্ডাক্টারিও জোটে না, চুরি করবার ছলে ভিক্ষে করতে এসেছে' বলে তিরস্কৃত হইলেও ক্ষোভের পরিবর্তে আনন্দই হইয়াছিল ; আবার অনেক স্থলে আদরসহ ভিক্ষাও প্রাপ্ত হন। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে অন্ন পাক করিয়া নিবেদন করিলে, ঠাকুর সানন্দে অগ্রভাগ গ্রহণ করেন, এবং উহার সংবর্ধন জন্য মস্তকেও ধারণ করেন।

নরেন্দ্রকে রাম নাম দান

সকল সেবকই সন্তান, এবং তাহাদের উন্নতির জন্য সদাই সচেষ্ট ; জানিতেন যে, কালে ইহারা সকলেই দিক্‌পাল হইবে। তথাপি ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারীকে সমুন্নত করিলে, ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা ইহাদেরও অভ্যুদয় হইবে। বোধ হয়, এই কারণে বাল্যাবধি বৈরাগ্যবান ও ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে উপদেশ করিতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বর অবস্থানকালে ঈশ্বরের মাতৃভাব উপলব্ধি করিতে একদিন যাহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কি জানি কোন্ প্রেরণায়, অথবা ভগবানের পিতৃভাব অনুভব-বাসনায়, গভীর নিশায়, যখন অনেকেই নিদ্রিত, তখন সেই নরেন্দ্রনাথ রামনামে উদ্যান পূরিত করিয়া উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেছেন জানিয়া, প্রভু তাঁহাকে নিজ সকাশে আনাইলেন এবং তারকব্রহ্ম রামনাম প্রদান করিলেন।

রোগের অবতারণা

নীতি-শাস্ত্র বলেন, আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফলই রোগ ; বেশ কথা ! এই অপরাধে রোগ কেন, আমাদের অশেষ দুর্গতিও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্ব-চৈতন্য-বিগ্রহ যিনি, তাঁর আবার রোগ কেন ? অপাত্রকে উদ্ধার করাই তাঁহার অপরাধ, কিন্তু ইহার প্রতিকার নাই। জীবদায়ে দায়ী জগত্তারণ করুণাবশে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তাদের দুষ্কৃতি গ্রহণেই রোগ। অথবা ভক্তকুলকে একত্র করিয়া এক অসাম্প্রদায়িক সংঘ প্রবর্তন-মানসে রোগের অবতারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশীর্বাণী 'চৈতন্য হউক'

যাহা হউক, কাশীপুর-উদ্যানে আগমনাবধি অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়া ঠাকুর ভাবিলেন—এখনো এমন কতকগুলি লোক আছে, যাদের আশা না মিটাইলে, তাঁহার দায়িত্বের কতকটাও শোধ হইবে না। অনুমান, এই উদ্দেশ্যে কল্পতরু প্রভু তাহাদের এবং তৎসহ সকলের কল্যাণ-মানসে রাজবৎসরের প্রথম দিনে অপরাহ্ণকালে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া, উদ্যানের দক্ষিণভাগে, যথায় গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহার লীলামৃত অনুশীলন করিতেছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, আপনাদের মধ্যে অতর্কিতভাবে প্রভুকে পাইয়া ভক্তকুল আনন্দে আত্মহারা হইল। নক্ষত্র-ভূষণ চন্দ্রমামতো ভক্তভূষণ প্রভু ভাবভরে গিরিশচন্দ্রকে কহিলেন—আমাতে তুমি কি দেখেছ বা বুঝেছ ? তখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে নতজানু হইয়া করজোড়ে গিরিশচন্দ্র নিবেদিলেন—ব্যাস, বাল্মীকি যাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন নাই, দীন আমি কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতে পারি ?

গিরিশের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে কহিলেন—তোমাদের আর কি বলিব—আশীর্বাদ করি, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

কল্পতরু

শুভাশিষে আশ্বস্ত হইয়া সকলে যখন শ্রীপদে প্রণতি করিতেছিল, প্রভু তখন ভাবাবেশে কোনো এক ভাগ্যবানের (নাম স্মরণ নাই) শিরে চরণ দান করায় বোধ হইয়াছিল, পুরাকালে গয়শিরে পদার্পণ করিয়া নারায়ণ যেমন পিতৃগণের মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন, ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণরূপী গদাধর আগন্তুককে সেইমতো কৃতার্থ করিলেন। পরে একে একে রামলাল দাদা, অতুলচন্দ্র, কিশোর, অক্ষয় মাস্টার প্রভৃতি অনেকের হৃদে 'মা জাগ জাগ' বলিয়া হস্ত প্রদান করিলে, অয়স্কান্তমণিযোগে কৃষ্ণকান্তি লোহ যেমন কাঞ্চনে পরিণত হয়, তাহাদের চিত্ত তদ্রূপ হইয়া সর্ব-দেবময় তনু প্রভুতে স্ব স্ব ইষ্টরূপ দেখিয়া আনন্দ-বিভোর হইয়াছিল। অক্ষয় মাস্টার কিন্তু তাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইল বুঝিয়া ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

সর্বময় দর্শন

কল্পতরু-তুল্য করুণা-বিতরণ দর্শনে অল্পবুদ্ধি বৈকুণ্ঠ মুগ্ধ হইয়া 'কে কোথায় আছিস আয়', বলিয়া রব তুলিলে প্রভু তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করায়, যেন আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় সম্মুখে দাঁড়াইলে, স্মিতমুখে কহেন—তোর তো আগেই সব হয়ে গেছে! মানি, তবু সাধ তো মিটে নাই মনে করায়, যেমন তাহাকে কৃপা-স্পর্শ করিলেন, অমনই সে তাহার অন্তর বাহিরে, পুত্তলিবৎ ভক্তমণ্ডলী মধ্যে, উদ্যানের পাদপ-পত্রে ও গগনে সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাণ্ডুরোগে আঁখিতে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রাভ দেখায়, তাহার ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ক্ষণিক আবেগে এক-আধ ঘণ্টা বা একদিন নহে, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় এইরূপ দর্শনে সে যেন উন্মাদের মতো হইয়াছিল।

মানব আমরা, চিরদিনই বহুরস আস্বাদে অভ্যস্ত, সুতরাং একরস-মাহাত্ম্য কি বুঝিব? আর আমাদের সে তপস্যাই বা কোথায়? ইহার জন্যই তো কঠোর সাধন-ব্যবস্থা। যখন সে দেখিল, তার ক্ষুদ্র ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মহান ভাব আর ধারণ করিতে পারিতেছে না, তখন অন্তর্যামী প্রভুর পদে অক্ষমতা জানাইলে তাহার সে ভাব সাম্য হয়। বৈকুণ্ঠ তাঁহার একান্ত আশ্রিত, এবং করুণায় তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন, তাই কৃপাময় প্রভুর কৃপায় তার এই সুদুর্লভ দর্শন ঘটিয়াছিল। বিনা সুতায় হার গাঁথা যাঁর রীত, তিনি যে গোবরগাদায় পদ্মফুল ফুটাবেন, এ কি আর বড়ো কথা?

আশ্রিত অক্ষম হইলেও প্রভু তো বিরূপ নহেন, তাই মাঝে মাঝে তাকে অবাধ দর্শন দেওয়ায় সে এতই আত্মহারা হয় যে, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া যায়। এই হেতু তার দৃঢ় ধারণা এবং অনেককেও কহিয়াছে, 'প্রভু তাহার জীবন্ত-জাগ্রত দেবতা।' এ-তো গেল এক অবস্থার কথা। আবার পীড়িতাবস্থায়ও একবার দেখে যে, প্রভু তাহার ললাট হইতে বহির্গত হইয়া এমন মধুর নৃত্য করিতে থাকেন যে, তাহাতে সে বিমোহিত হইয়া যায়। প্রভুর করুণায় এমনটি যদি না দেখিত, তাহা হইলে অন্তর্যামী অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, কথাটা তার কাছে কথার কথা হইত।

তৃতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রের বৈরাগ্য

বৈরাগ্য কি ? ভগবানকে সারাৎসার ও অতি আপনার জানিয়া তাঁহার জন্য সর্বত্যাগই বৈরাগ্য। মহর্ষি শাক্যসিংহ এই বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক। সুতরাং তাঁহার পূতচরিত আলোচনায় নির্বেদ-উদয়ে নরেন্দ্রনাথ ভাবেন—তাঁহার প্রতি ঠাকুরের স্নেহও যেন তাঁহার বন্ধন স্বরূপ হইয়াছে। অতএব ইঁহার মায়া কাটাইয়া অন্যত্র যাইয়া কঠোর তপস্যায় যদি ঈশদর্শন পাই তো ভালো, নচেৎ তপস্যাতেই জীবনান্ত করিব। এই ইচ্ছায়, বা দুষ্ট বুদ্ধির প্রেরণায় সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন ; অনুমান বুদ্ধগয়ায়। যে কারণে হউক, তারক দাদা ও কালীভায়া সঙ্গে যান। স্থিতধীর উদয়ে অথবা প্রভুর আকর্ষণে যখন বুঝিতে পারেন যে, প্রভুর কৃপা বিনা অন্য কোথাও কিছু হইবে না, তখন লজ্জিত হইয়া কাশীপুরে প্রত্যাগমন করেন।

ঠাকুরের আক্ষেপ

এই সময় বিমর্ষভাবে ঠাকুর কোনো যুবককে কহেন—দ্যাখ, নরেন্দ্র এতই নিষ্ঠুর যে, এই অসুখের সময় আমাকে ছেড়ে, কানাই ঘোষালের (পূর্ববন্ধু) ছেলে, যাকে নরেন্দ্র এখানে আশ্রয় দিল, সেই তারকের সঙ্গে কোথায় গেছে, বা তারক তাকে হুড়িয়ে (ভুলায়ে) নিয়ে গেছে, আর কালীও সঙ্গে গেছে। (বলিয়া রাখা ভালো যে, প্রভুর কৃপা পাইয়াও তারক দাদা কর্মবিপাকে ইতঃপূর্বে ছায়ার মতো নৃত্যগোপালের [পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত] সঙ্গে ফিরিতেন।)

বালককে প্রবোধ দিবার মতো যুবক যখন কহিল—কোথা যাবে নরেন্দ্র ? হট্ করিয়া যাইলেও আপনাকে ছাড়িয়া কদিন থাকিবে ? আমার ধারণা—শীঘ্রই ফিরিবে। তখন প্রভু হাসিমুখে কহেন—ঠিক বলেছিস, যাবে কোথায় ? এলু তলা বেল তলা, সেই বুড়ীর পোঁদ তলা। আমার কজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছেন, তখন আমারই পেছনে তাকে ঘুরতে হবে। বলা বাহুল্য, দুচার দিন পরে নরেন্দ্রনাথ যেন অপরাধীর মতো প্রভুসমীপে উপস্থিত হন।

নরেন্দ্রের অহমিকা নাশ

আমি কর্তা, আমি কি-না করিতে পারি—এই দুর্বুদ্ধির নাম অহমিকা। ইনি সহজে যান না, তবে বার বার পুরুষকারে অভীষ্ট-সিদ্ধি না হইলে, ইহার প্রভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় যেন কতকটা সাম্য হয়। ঠাকুর একটি উপমা দিতেন—একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে বসে ভাবল—কেন আর এখানে থাকি, চেষ্টা করে দেখি না যদি দেশ পাই ; বহুক্ষণ উড়ে যখন কূল পেল না, তখন হতাশ হয়ে সেই মাস্তুলে এসে বসল। নরেন্দ্রনাথের ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

সাধনোপদেশ

ঠাকুর বলিতেন—আত্মহত্যা সামান্য নরুণ দিয়ে করা যায়, কিন্তু অপরকে মারতে হলে ঢাল খাঁড়ার দরকার। জানিতেন যে, উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথই তাঁহার প্রবর্তিত সার্বভৌম ধর্ম প্রচারে লোককল্যাণ করিবে, তাই তাহাকে নানাভাবে সাধনোপদেশ করেন। কারণ, ধর্ম-রাজ্য বল, আর সংসার-ক্ষেত্রই বল, সকল স্থলেই উৎকর্ষ লাভ করিতে উদ্যমের

প্রয়োজন। আবার আয়াস সহ ধনার্জন না করিলে, ভোগ বা ত্যাগে (দান) উহার রস-বোধ হয় না। তদ্রূপ প্রাণপাত তপস্যায় উপযুক্ত হইতে না পারিলে, ব্রহ্মবস্তুর রসাস্বাদ হয় না।

ঠাকুরের আনন্দ

ন্যাংটাকে ঠাকুর বলেছিলেন—ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ। শক্তি আরাধনা বিনা কেহই মহৎ হইতে পারে না। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য, সুতরাং প্রতীক-পূজার বিরোধী। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রভুর আদেশে—শ্রীকালী মাতার মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করেন—মা! আমার বিবেক-বৈরাগ্য দাও। আবার 'মা ত্বং হি তারা' ঠাকুরের নিকট এই গীতটি শিখিয়া সারারাত্র গানে মহামায়ার মহিমাতে বিভোর হন। মনের মতো পুত্র হইলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়, নরেন্দ্রনাথ জগন্মাতার শরণ লওয়ায় ঠাকুরের ততোধিক আনন্দ হইয়াছিল। পরদিন আমাকে এই বিষয় বলিতে ঠাকুর যেন আহ্লাদে আটখানা হন।

নরেন্দ্রের কুণ্ডল ধারণ

যখন দেখিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ সাধন-পথে বিশেষ অগ্রসর, তখন তাঁহাকে আপন অনুরূপ করিবার মানসে আপনি যথায় যেভাবে সাধনাদি করিয়াছেন, তাঁহাকে তথায় সেইভাবে সাধন করাইতে সচেষ্ট হইলেন। এ সাধনায় শঙ্খকুণ্ডল ধারণ আবশ্যক, তজ্জন্য গঙ্গাধরকে (অখণ্ডানন্দকে) কলিকাতা হইতে কুণ্ডল আনিতে পয়সা দেওয়া হইল, কিন্তু যথাকালে আনীত না হইলে, ঠাকুর স্বহস্তে মৃৎকুণ্ডল গড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে পরাইবার সময় কহেন—এই কুণ্ডল ধারণে ধ্যাননিরত বুদ্ধদেব সিদ্ধকাম হন, আশীর্বাদ করি—তুমিও ইহা পরিয়া দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে ধ্যানযোগে সিদ্ধ হও।

সাধনে সিদ্ধ

কিন্তু গভীর নিশায় পঞ্চবটীমূলে সাধনা ভীতি ও বিঘ্নসংকুল। কারণ, ঠাকুর জানিতেন যে, তথায় ভগবতীর পীঠরক্ষক ভৈরব বিরাজ করেন। তাই বিঘ্নাশঙ্কায় প্রসন্নতারূপ কবচে রক্ষা করিয়া, নির্ভীক হুট্‌কো গোপালকে সঙ্গে দিয়া মহানিশায় দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, প্রভুর কৃপায় মহাপীঠে সপ্তাহব্যাপী সাধনায় নরেন্দ্রনাথের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

নির্বিকল্প সমাধি

একটা কথা আছে—যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত চায়। নরেন্দ্রনাথেব খাঁই আর মেটে না! প্রভুর করুণায় নামমাত্র সাধনে নিজেকে কৃতকার্য ভাবিয়া চরম সাধন নির্বিকল্প আকাঙ্ক্ষায় ঠাকুরকে যখন তখন বিরক্ত করিলে—'কালে হইবে' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেন। কবে যে হবে, কিছুই জানেন না; কিন্তু এক দিন ধ্যানের সময় অনুভব করেন যে, প্রাণবায়ুর ঊর্ধ্বগতিতে দেহাদিভাব লুপ্ত হওয়ায় চিত্ত যেন কোনো ভাবাতীত রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। দেহাত্মবুদ্ধি আমরা, দেহ অতিক্রম করিয়া মনকে অজানিত স্থানে ধাবিত দেখিলে ত্রাসিত হইয়া থাকি। তাই নরেন্দ্রনাথও ভীতচিত্তে কহেন—আমার দেহটা কোথায় গেল? তখন তড়িংগতি বৃত্তি কি আর উত্তরের অপেক্ষা রাখে? সুতরাং বলিতে না বলিতে, যথা হইতে সকল বৃত্তি প্রসৃত, তাঁহার মনোবৃত্তি তথায় চকিতে মিলাইয়া গেল; এবং দেহটা যেন কাষ্ঠপুত্তলিবং পড়িয়া রহিল। দ্বিতলে যাইয়া গোপাল

দাদা এই ব্যাপার জানাইলে, প্রভু সানন্দে কহেন—ভালোই হয়েছে, উহার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে। যখন তখন আমাকে দিক্ করায় (যেন কিছুই জানেন না) মা ব্রহ্মময়ী আজ উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। এখন খানিকক্ষণ ঐ ভাবেই থাকুক।

উহার প্রশংসা

প্রাণপাত তপস্যায় বা ভগবৎ-কৃপায় একবার এই অবস্থায় উপনীত হইলে মানবচিত্ত তথা হইতে আর ফিরিতে চাহে না, বা পারেও না। ঠিক যেন লৌহখণ্ড চুম্বক পর্বতে আকৃষ্ট। নরেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। যে পরম পুরুষের আকর্ষণে মর্ত্যে আগমন এবং যাঁহার কৃপায় সুদুর্লভ অদ্বৈতভাব লাভ, সুতরাং তাঁহারই ইচ্ছায় সমাধি-মুক্ত হইয়া দগ্ধবস্ত্রমত দেহবুদ্ধি লইয়া ধীরে ধীরে বস্তুজগতে ফিরিয়া আসেন। প্রণতি নিবেদন ইচ্ছায় চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, প্রভু কহেন—আজ তোমাকে যে পরমপদের আস্বাদ করাইয়াছি, উহা কেবল তোমারই জন্য চাবি দেওয়া রহিল, অর্থাৎ রক্ষিত হইল। আবার যখন আমার ইচ্ছা হবে, তখন দেব। এ অবস্থায় শুদ্ধাচারে থাকা উচিত। পুরুষকারপ্রিয় অথবা সাদা কথায় গোঁয়ার-গোবিন্দ বলিয়া বহু প্রয়াসেও নরেন্দ্রনাথ এ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হন নাই। প্রভুর অন্তর্ধানের বহুদিন পরে কুব্জাম্রক ক্ষেত্র হৃষীকেশ তীর্থে ধ্যাননিরত অবস্থায়, সহসা এক দিন তাঁহার প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া হিমাঙ্গ হইলে সঙ্গী আমরা শঙ্কা করি—বুঝি নরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতেছে। পরদিন সংজ্ঞা লাভে বলেন, এত দিন পরে প্রভুর কৃপায় পুনরায় এই নির্বিকল্প অবস্থা পাইলাম। স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডে বর্ণিত রৈভ্যদেবের তপস্যায় প্রীত হইয়া কুব্জ আম্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর দেন যে, এই ক্ষেত্রে আপ্রাণ তপস্যা করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে। তদবধি হৃষীকেশের নাম কুব্জাম্রক ক্ষেত্র হইয়াছে। ভূস্বর্গ হিমালয়ে অবস্থিত। বদরিকাশ্রমের দ্বার বলিয়া হরিদ্বার, কেদারনাথের দ্বার বলিয়া হরদ্বার, কিন্তু কেদারখণ্ডমতে হিমালয়কে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মর্ত্যে ভাগীরথী প্রবাহিত হইবার জন্য নাম গঙ্গাদ্বার। ইহার ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হৃষীকেশ।

প্রভুর মহিমা

ঠাকুর বলিতেন—অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর। ইহাতে বুঝা যায় যে, নির্বিকল্প না হইলে দ্বৈতভাব ঘুচে না। ব্যাপার বড়ই কঠিন, তবে বলা যাইতে পারে—কোটি কোটি মানবমধ্যে কদাচিৎ কোনো সুকৃতিবান উহার আভাস মাত্র পান। প্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, নর্মদাতীরে তেতাল্লিশ বৎসর প্রাণপাত তপস্যায় ন্যাংটাজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়। সবই যাঁহার আশ্চর্যময়, অতি অল্পক্ষণেই স্বয়ং ঐ অবস্থায় অধিরূঢ় হন এবং তিন দিন অবিরাম ভাবে উহাতে অধিষ্ঠান করেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, ইচ্ছামত নরেন্দ্রনাথকে উহার রসাস্বাদ করাইয়া ধর্মরাজ্যের চরম সীমায় উপনীত করিলেন।

ভক্তকে রক্ষা

ভক্তকে কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ভগবানই জানেন। কলেজের ছাত্র সরলপ্রাণ সারদাপ্রসন্ন (ত্রিগুণাতীত) অভিভাবকদের তাড়নায় ঘরে থাকিয়া ভগবৎ উপাসনা, এবং কাশীপুরে আসিয়া প্রভুর সেবা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাঁহার বিলাপে

ঠাকুর ব্যথিত হন, এবং গেরুয়া বসন দিয়া বলেন—পুরীধামে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবৎ-ভজন কর গে। তাঁহার পিতা আসিয়া অনুযোগ করিলে কহেন—আমি কি তোমার ছেলেকে আটক করে রেখেছি? পারো তো ঘরে নিয়ে যাও।

উন্নতেরও পতন হয়

ঈশ-আরাধনায় স্ফীত হইয়া যেন মনে না করি, আমাদের উচ্চাবস্থা হইয়াছে। বাগবাজারের তুলসী সাধুখাঁ হরিনাম-সাধনায় ভক্তিনম্র হওয়ায় পল্লীর সকলেরই আদরণীয় হয়। ঠাকুরও দেখিয়া বলেন, ইহার উচ্চ অবস্থা; কিন্তু যোষিৎ-অঙ্গ পরশ হইলেই পতন হইবে। কিছুদিন পরে দেখা যায়, তাহার কপাল ভাঙিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহেব ডাক্তার দেখান

সন্তানগণের সমধিক যত্ন সত্ত্বেও দুর্বল দেহে ভক্ত-ভাবনায় বা বাগানবাড়িতে শীতের আধিক্যে অথবা যে কারণেই হউক, রোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে ভিতরের ক্ষত বাহিরে প্রকাশ পায়, এবং তৎসঙ্গে রক্ত ক্লেদ নিঃসরণে যাতনাও বৃদ্ধি হয়। যদিচ প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে, তথাপি প্রায় আট মাস হইতে যায় আশামতো উপশম না দেখিয়া ভক্তগণ বড়ই উদ্বিগ্ন হন; এবং কি রোগ, বা কি উপায়ে শান্তি হইতে পারে, এই আশায় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞ ডাক্তার কোট্‌স সাহেবকে আনয়ন করেন।

ডাক্তার সাহেবের বিস্ময়

ডাক্তার সাহেব গলদেশ চাপিয়া পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলে, ঠাকুর যেন শিহরিয়া উঠেন এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বভাবজ সমাধিতে নিমগন হন। ডাক্তার তখন ইচ্ছামতো পরীক্ষা করিয়া কহেন—ইহাকে ক্যানসার অর্থাৎ কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগ বলে। বহুদিন ব্যাপিয়া অবিরাম ঐশ্বরিক কথায় গলমধ্যস্থ সূক্ষ্ম শিরা ও ঝিল্লীর উত্তেজনায় ইহার উৎপত্তি। আমাদের দেশে ইহাকে ধর্মযাজকের কণ্ঠরোগ কহে। আমাদের উগ্র ঔষধ এ অবস্থায় ক্লেশদায়ক, সুতরাং বর্তমান চিকিৎসাই শুভ। সে যাহা হউক, এমন অদ্ভুত রোগী তো জীবনে দেখি নাই! আমাদের ধর্মশাস্ত্র বাইবেলে পড়িয়াছি, মাত্র প্রভু ঈশামশীর ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে এই রূপ ট্রান্স—ভাবসমাধি হইত। আজ কিন্তু প্রত্যক্ষ করিলাম, এই মহাভাগ স্বেচ্ছায় এমন সমাধিস্থ হইলেন যে, দেহবুদ্ধি আদৌ রহিল না। ইঁহার পুণ্যদর্শনে আমি এতই মুগ্ধ যে, পারিশ্রমিক লইয়া হস্ত ও মনকে কলুষিত করিতে পারি না। বরং আমার প্রাপ্য অর্থ ইঁহারই সেবায় উৎসর্গ করিলাম—বলিয়া ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন।

চিকিৎসক অন্বেষণ

কলিকাতায় অবস্থানকালে ডাক্তার সরকার প্রত্যহই আসিতেন। কাশীপুর দূরবর্তী হওয়ায় কলিকাতার কার্য সমাপনে এখানে আসিবার তেমন অবসর হইত না; কেবল লোকমুখে সমাচার লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ এমন একজন চিকিৎসকের অন্বেষণ করেন, যিনি নিত্যই আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পারেন। ভৈষজ্য চিকিৎসক বলিয়া ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল তখন প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থামতো ঔষধাদি কষ্টদায়ক হওয়ায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত

অবশেষে হোমিওপ্যাথি-প্রবর্তক ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তকে অতুলবাবু আনয়ন করেন। এমন হৃদয়বান চিকিৎসক সচরাচর পাওয়া যায় না। ইনি নিত্যই আসিতেন এবং ঠাকুর যাহাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাহাতে যত্নবান হইতেন। একারণে সকলেই সন্তুষ্ট হন। চিকিৎসক যদি রোগীর প্রতি সহৃদয় না হন, এবং রোগীও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হন, তাহলে সে চিকিৎসার মূল্যই থাকে না। এক্ষেত্রে রোগী যেমন আশ্চর্যময়, চিকিৎসকও তেমনই শ্রদ্ধাবান। তাই তিনি আসিবার সময়, কোথায় সুগন্ধি ফুলটি, কোথায় সুমিষ্ট ফলটি সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের জন্য আনিতেন এবং কিরূপ পথ্য রুচিকর হইবে, তাহাও আনিতেন। দুর্বল শরীর ভারময় পাদুকা কষ্টকর ভাবিয়া, মখমল-নির্মিত কোমল পাদুকা আনিয়া স্বয়ং প্রভুর শ্রীপদে পরাইয়া দেন। উহা অদ্যাপিও বেলুড় মঠে অর্চিত হইতেছে। ফলতঃ ইঁহার ভক্তিপূর্ণ চিকিৎসায় পীড়ার উপশম হইলে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ পান।

পঞ্চম অধ্যায়

কুমারগণের অভিষেক

অভীষ্ট দেবতার আপ্রাণ-সেবা এবং ভগবানবোধে তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন ব্যতিরেকে শিষ্য-পদবীর সার্থকতা হয় না। যুবকগণ এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। আবার সেবার জন্য প্রভুর অনুধ্যানে ও শ্রীঅঙ্গ পরশনে অন্তর্বহি নির্মল হইয়াছিল বলিয়াই ঠাকুর তাঁহাদের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হন। সুতরাং উত্তরকালে তাঁহার প্রবর্তিত সাম্যধর্ম প্রচারে মলিন ব্যক্তির সংসর্গে পাছে ইঁহাদের অপকর্ষ হয়, এই হেতু শাস্ত্রবিধিমতে তাঁহার শিরোভাগে সাধারণের অলক্ষ্যে জগতের কারণস্বরূপ এবং প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ মহাপাবনকারী বারিপূরিত যে ধর্মরূপী ঘট স্থাপিত ছিল, উহা হইতে স্বহস্তে সেই পূতবারি দ্বারা অভিষেক করিয়া কহিলেন, সর্বেশ্বরীর কৃপায় আজ হতে তোমরা এতই পবিত্র হইলে যে মলিন ব্যক্তি-সহ মিলনে বা তাদের অন্নগ্রহণেও আর অপবিত্র হবে না। রাজচক্রবর্তী রাজকুমারকে যেমন যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন, নরদেব ঠাকুরও তাঁহার কুমারগণকে দিক্‌পাল রূপে ধর্মরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

শঙ্কা সমাধান

শঙ্কা উঠিতে পারে, সন্ন্যাস দিলেন না কেন ? ঠাকুর হয়তো ভাবিয়াছিলেন—(১) নির্বেদ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র। কেশবভারতী মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, যৌবনে রিপু প্রাবল্যে নির্বেদ অসম্ভব ; আবার আমিত্ব নাশ বিনা সন্ন্যাসগ্রহণে অহংকারেরই উদ্রেক হয়। (২) শক্তিপ্রধান বাঙলাদেশে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সন্ন্যাস ফলপ্রসূ হয় না বলিয়াই ভগবান শঙ্করাচার্য বিফলমনোরথ হন। (৩) বিশেষতঃ পঞ্চক্রোশী কালীপীঠে অভেদ ব্রহ্ম-শক্তির আরাধনা বিনা ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং দ্বৈতভাবের আবেষ্টনে অদ্বৈতভাব-সমন্বিত তান্ত্রিকী দীক্ষা (অভিষেক) কালে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিবে জানিয়া অনর্থক সন্ন্যাস দেন নাই। (৪) মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, সন্ন্যাস উপায় মাত্র। তখন উদ্দেশ্য পরিহারে উপায় অবলম্বন সমীচীন নহে বুঝিয়াই সন্ন্যাস দেন নাই। (৫) যাঁহার প্রসন্নতায় সর্বার্থ-সিদ্ধি সুনিশ্চিত এবং যাঁহাদের উপর প্রভু সদাই সুপ্রসন্ন,

তখন কোন্ প্রাণে তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস-গহনে ফেলিয়া শান্তির পরিবর্তে দুঃখার্ণবে ভাসাইবেন? বোধ হয় এইরূপ চিন্তায় সন্ন্যাস দেন নাই।

ঘাত-প্রতিঘাত

ঘাত-প্রতিঘাত বিনা কোনো ভাবেরই পরিপুষ্টি হয় না। ঠাকুর বলিতেন, জটিলা কুটিলা কৃষ্ণদ্বেষিণী ছিলেন বলিয়াই তাঁদের গঞ্জনায় গোপীদের কৃষ্ণানুরাগ বর্ধিত হয়। আরও বলিতেন—চাপান-উতোর না হলে, কেবল একতরফায় কবি পাঁচালীর গান জমে না। তাই বুঝি প্রভুর এই ঘাত-প্রতিঘাতের অবতারণা। গৃহী ভক্তরা ঘাত-প্রতিঘাতমধ্যে আপন ভাব বজায় রাখিয়া যুগপৎ ধর্মচিন্তা এবং সংসার ও সমাজ-সেবা সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন। সুতরাং কুমারগণকে এই কল্যাণমার্গ দিয়া আনয়ন না করিলে তাঁদের ত্যাগ ও নির্ভরতা পূর্ণ বিকাশ হইবে না এবং সংসারী সন্তানগণেরও তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে না; বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী ও গৃহী সন্তানমধ্যে কিছু দিনের জন্য যেন একটা ঝটিকা সৃজন করিলেন। বলিতেন—সতের রাগ জলের দাগের মতো মিলায়ে যায়! (যষ্টি-আঘাতে জল দ্বিধা হইয়া আবার ক্ষণমধ্যে মিলায়ে যায়) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং গোস্বামিপ্রবর বিজয় একসময়ে হরিহরাত্মা ছিলেন, কিন্তু কুচবিহার বিহারের পর আদর্শ উপলক্ষ্যে সৌহার্দ ছিন্ন হইলে, এই উপমা ও উপদেশ দিয়া তাঁদের মিলন করিয়া দেন।

পিতৃ-অন্ন-পুষ্ট ছাত্রজীবন, সুতরাং সংসার অনভিজ্ঞ কুমারগণ, ভক্তগণের রক্তার্জিত অর্থ, যাহা আত্মবঞ্চনায় প্রভুর সেবাজন্য অর্পিত হইত, ব্যবস্থাপূর্বক ব্যয় করিতে না পারায় গৃহিগণ তাঁহাদিগকে মিতব্যয়ী করিবার প্রয়াস পাইলে বিতণ্ডার উদ্ভব হয়। ফলে উভয়েরই কল্যাণ হয়; যুবকদিগের সংযম এবং গৃহস্থগণের উদারতা বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনায় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কহেন ইচ্ছা করিলে ধনিগণকে আকর্ষণ করিতে পারি; কিন্তু দারিদ্র্যই যখন তপস্যার শোভা, তখন স্পৃহা হয় না; তবে তুই যেখানে মাথায় করে নিয়ে যাবি, সেইখানেই যাব। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছায় অচিরে আনন্দমিলন সংঘটন হয়।

বসন্তোৎসব

মধুময় বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি দেবী নবসাজে সাজিয়া যখন সকল প্রাণীর অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করেন, মানব জাতিও তাহাতে বঞ্চিত হয় না। সুতরাং পুরাকাল হইতে মানবগণ এই সময় যে আনন্দোৎসব করে, তাহাকে বসন্তোৎসব কহে। বৃন্দাবনচন্দ্র সহচর-সহচরী সঙ্গে এই কালে যে আনন্দ-কৌতুক করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা দোল-লীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের লীলা বলিয়া এই দোলপর্ব ভারতের প্রায় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত। দেবালয়ে অবস্থানকালে ঠাকুরও এই উৎসবে আনন্দ-বিভোর হইতেন।

যদিও তিনি অসুস্থ, তথাপি তাঁহার পূর্বলীলা-গাথা শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ আবীর খেলার সঙ্গে ভজন আরম্ভ করিলে প্রভু দ্বিতলে বসিয়া সন্তান-গণের এই অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করেন। ভক্তি, বৈরাগ্য ও আনন্দ উচ্ছ্বাস—অনেক গীতের পর নরেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন—সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই-ই। ভজলে অযোধ্যানাথ দুসরা না কোই-ই॥ ইত্যাদি। কিন্তু বিহারে রঘুবংশবীর, সখা সহিত

সরযূতীর। তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ-রজ পাই-ই॥ শেষ চরণটি না জানায় গীত হইল না। সকল বিষয়ই পূর্ণ করিতে যাঁহার আগমন, তাঁহার নিকট গীতটিও কেন অপূর্ণ রহিবে? তাই ঐ অংশটি খোকা (সুবোধানন্দ) দ্বারা লিখাইয়া নিম্নতলে পাঠাইয়া দেন। লিখিবার সময় বানান জিজ্ঞাসা করিলে কহেন—ছেলেবেলা বুঝি দাঁড়া-গুলি খেলে বেড়িয়েছিস, তাই এখন বানান জিজ্ঞাসা করছিস?

প্রভুর কৃপা দর্শন

ক্রীড়া, কৌতুক ও ভজনে মাতিয়া যখন সকলে প্রভুর পীঠ প্রদক্ষিণে নৃত্য করিতে থাকে, তখন রং মাখা ভূত আমাদের দেখিবার বা কৃতার্থ করিবার অভিলাষে, ভূতনাথ ভক্ত-ভূষণ শশিভূষণ দ্বারা আবাহন পাঠান। যাঁর আকর্ষণে জলধি স্ফীত এবং নদী উজান বয়, প্রভুর সেই মধুর আকর্ষণ বা আবাহনে সকলে স্ফীত হইয়া আমি আগে যাব, আমি আগে যাব বলে, দুড় দাড় শব্দে উপরে উঠিয়া শ্রীপদে প্রণতি করিল, এবং তাহাদের ভূত-মূর্তি দর্শনে ভূতেশ্বরও বিশেষ প্রফুল্ল হইলেন। আবার ভূত-জননী শ্রীমাতৃদেবীও তাঁহার ভূত-পুতগণের আচরণে প্রসন্না হইয়া প্রচুর প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন।

মানবের কর্তৃত্ব স্বভাব

কিছু বুঝি না বুঝি, মানব আমরা সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতে ভালোবাসি। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে এই ভাবটি দেখা যায়; ইহারই জন্য সংসারে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি। কোন্নগরের মনোমোহন দাদা একজন বিজ্ঞ ভক্ত; জ্ঞানে না হউন, বয়সে তো বটেই। সেজন্য আমরা তাঁহাকে সম্মান করি। গ্রীষ্মকালে কোনো এক রবিবারে প্রভুর দর্শনের পর নিম্নতলে আসিয়া কহেন—তোমাদের গোলমালে ঠাকুরের বিরক্তি বোধ হইতেছে। শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ; ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল। ভক্তানন্দ প্রভু পার্শ্বচর শশিভূষণকে কহিলেন—আজ কি আমার অসুখ বেড়েছে? তাই বুঝি ছোঁড়ারা হট্টগোল করছে না? ওদের আমার কাছে ডেকে আন্।

ভক্তসঙ্গে কৌতুক

আনন্দই ব্রহ্ম। কেবল যে ঈশ্বর-আরাধনায় উহা লাভ করিতে হইবে, এমত নহে। পরপীড়ন ও আত্মবঞ্চন পরিহারে সদাচারী হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক এবং রহস্য দ্বারাও ভক্তচিত্তে যাহাতে আনন্দের উদয় হয়, সেজন্য ঠাকুর তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন—গোমড়া (বিমর্ষ) মুখ আমি দেখিতে পারি না; তাই বুঝি স্নেহের আবাহন। কারণ না বুঝিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে উপস্থিত হইলে আনন্দকন্দ প্রভু আনন্দ বিতরণ-মানসে লাটুর কোষ-বৃদ্ধি দেখিয়া হোলং, কিবা দোলং, 'তারে না দুলালে আপনি দোলে' বলিয়া নানারূপ রসরঙ্গের আঁখর সঙ্গে এমন কীর্তন আরম্ভ করিলেন, যাহাতে আমরা সকলেই হাস্যরসে অভিভূত হইলাম। এমন তো কোথায় দেখি নাই বা শুনি নাই যে, রোগ-যাতনা উপেক্ষা করিয়া কে কোথায় আশ্রিতগণকে পরিতুষ্ট রাখিতে সদাই ব্যস্ত। অথবা আমাদের চক্ষে রোগ-ভেল্কি লাগাইয়া যেন অপর কাহারও পীড়ার সমবেদনায় রোগীর ন্যায় আচরণ; অন্তরে কিন্তু পূর্ণ আনন্দ। এরূপ ভাব কেবল প্রভুতেই সম্ভবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিধি বিমুখ

বিধাতার বিড়ম্বনায় বা ভাগ্যাভাবে ভক্তকুলের আনন্দ আর অধিক দিন রহিল না। আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে প্রকৃতি আর্দ্র হওয়ায়, সকল প্রাণীতেই অল্পাধিক শৈত্য সঞ্চার হয়। ভক্তগণ আয়াস করিলেও কৃশদেহে এই শৈত্য ঠাকুরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হয়। তজ্জন্য গলা বেদনা অধিকতর হওয়ায় ক্ষত হইতে ক্লেদ নিঃসরণ আরম্ভ হয়। আবার উহার উপর কাশ সঞ্চারে যাতনাও বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধা সত্ত্বেও অল্পমাত্র তরল পথ্য গ্রহণে অসমর্থ হন। কোনো মতে যদি কিঞ্চিৎ পান করিলেন, অমনি দ্বিগুণ-মাত্রায় ক্লেদ নির্গত হওয়ায় আরও ক্লেশ বোধ করেন। ইহা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন।

প্রভুর সত্তা-গ্রহণ

একদিন শ্রীমুখ-বিগলিত ক্লেদমিশ্র পায়স হস্তে নরেন্দ্রনাথ কাতরভাবে কহেন—প্রভুর সুব্যবস্থায় তাঁহার প্রসাদ ধারণে আমাদের চিত্তপ্রসাদ হইয়াছে, কিন্তু এখন বিধি বিরূপ। আইস, তাঁহার সত্তাস্বরূপ ইহা পান করিয়া আমাদের অস্থিমজ্জায় যেন তাঁহার অবাধ অধিষ্ঠান বোধ করিতে পারি। এই বলিয়া কিয়দংশ স্বয়ং পান করিলেন এবং আমাদিগকেও করাইলেন। দৃষ্টি দ্বারা, বাক্য দ্বারা এবং পরশ দ্বারা পূর্বেই যিনি অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন জগতের সত্তাস্বরূপ যে অব্যয় রস, সেই রস দ্বারা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিরদিনের মতো প্রভু আমাদের দেহে বিরাজ করুন, ইহাই প্রার্থনা। সন্তান-বাৎসল্যে গোরস যেমন সুস্বাদু দুগ্ধে পরিণত হয়, বিজ্ঞানমতে এই বিষাক্ত জীবাণু প্রভুর কৃপায় ভক্তগণ পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়াছে।

নিজ মহিমায় বিদ্যমান

লীলাবিলাসে প্রাকৃত তনু ধারণ করিলেও, প্রভু নিজ মহিমায় সদাই বিরাজমান। কেবল আশ্রিতকে কৃতার্থ-করণ অভিলাষে তাহাদের সেবা গ্রহণ বা তাহাদের সঙ্গে ভগ্নস্বরে ভগবৎকথায় বহির্জগতে আগমন করিতেন, নতুবা অধিক সময়ই ভাব-সমাধিতে নিমগন থাকিতেন। তোদের কাছে আমার দর্শন বিষয় লুকায়ে রাখব না, বোধ হয়, এই অঙ্গীকারে কহেন—ভাবাবেশে দেখি, দেবগণ সূক্ষ্মশরীরে আমার কাছে উপস্থিত ; আর আমিও ক, কা, কি, কুট্ আদি দেবভাষায় তাঁদের সঙ্গে আলাপন করছি ; দক্ষিণেশ্বর অবস্থানকালে প্রভুর মুখে এই দেবভাষা অনেকবার শুনিয়াছি। যদি কোনো বুদ্ধিমান বলেন যে, বোকা আমরা, কেন উহার অর্থ জানিয়া লই নাই। উত্তর—যাহার দর্শনেই মোহিত, তখন কৌতূহল নিরসনে প্রশ্ন করা কি সম্ভব? আর এক কথা—ক্ষুদ্র আমরা প্রভুর সকল মাহাত্ম্যই বুঝিয়াছি কি না? তাই এই দেবভাষার অর্থ না জানায় কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে।

সাগরপারে শ্বেতকায় ভক্ত

আরও বলছেন—দেখছি সাগরপারে অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আছে ; তাদের সঙ্গে মিশতে হলে তাদের মতো পোশাকের দরকার। তাই ইচ্ছা হয় ইজের পরে ডিশবাটিতে খাই। কহিবামাত্র সকলই সংগ্রহ হইল এবং প্রভুও উহা ব্যবহারে আনন্দ করিলেন। প্রভুর প্রেরণায়

পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার মহিমা প্রচারকালে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহারই কথা স্মরণ করিয়া ঐ দেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। নচেৎ সন্ন্যাসী হইয়া সাহেব সাজিবার বাসনায় নহে।

ভক্তদের প্রার্থনা

যাঁহার লীলাবিগ্রহ বিদ্যমান থাকিলে ভক্তকুলের শ্রেয়ঃ এবং সর্বসাধারণেরও মঙ্গল, এই কামনায় নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানগণ প্রার্থনা করেন—যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া রোগ নিরাময় করেন। ঠাকুর কহিলেন, মনে করিলেই দেহটাকে সুস্থ করতে পারি, কিন্তু যে মনকে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করেছি, তখন তুচ্ছ শরীরের জন্যে কি করে সেই মনে আরোগ্য ইচ্ছা করি ? তবে তোদের জেদে মহামায়াকে জানাই—যাতে দুটো খেতে পারি, তাই কর। মা বললেন, যখন এত মুখে (অসংখ্য) খাচ্ছ, তখন একটা মুখে নাই বা খেলে ? শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট।

প্রবোধ দান

আবার আমাদের প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন—রোগে ভুগে দেহটা কেমন হয়েছে, সূক্ষ্ম শরীরে বেরিয়ে এসে দেখি গলার ভেতর ঝাঁজরার মতো হয়েছে ; তা হতে পুঁজ রক্ত পড়ছে, আর খোলটা (দেহটা) যেন কেমন একরকম হয়েছে। ওরে, দেখে এত হাসি এলো যে কি বলব। মানুষ এই নশ্বর দেহের ভালোবাসায় ভগবানকে ভুলে বাঁচবার কামনা করে। ঠাকুর বলিতেন, টিয়াপাখি সারাদিন রাধাকৃষ্ণ বলছে, যেমন বেড়ালে ধরল, অমনই ক্যাঁ ক্যাঁ রব। তেমনই মানব আমরা সুস্থাবস্থায় যত কেন ভক্ত হই না পীড়িত হইলে বাঁচিবার জন্য লালায়িত। অচ্যুত হইতে মনের বিচ্যুতি হয় বলিয়াই ঠাকুর রোগী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারিতেন না।

আনন্দ বিকাশ

রোগবৃদ্ধি সঙ্গে সপ্তাহকাল আহার-নিদ্রায় বঞ্চিত হইলেও এমন আনন্দ বিকাশ হয়, যাহা ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখেন নাই। কারণ যে কি, তাহা বুঝাও যায় নাই। নিশিদিন উৎফুল্ল বদন ও জ্যোতিঃপূর্ণ বপু দর্শনে সকলেই মোহিত। সচ্চিদানন্দের এই কি সেই পরম ভাব ? তাই বুঝি দেখাইবার জন্য অচিন্ত্য আনন্দ। অথবা পূর্বে আমাদিগকে যে উপদেশ করিতেন—'দুখ জানে আর শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাক' বোধ হয় এই ভাবটি আমাদের অন্তরে দৃঢ় করিবার ইচ্ছায় প্রাণান্তকর অবস্থায়ও আনন্দের অবতারণা, বা তদ্গত-প্রাণ ভক্তকুল পাছে তাঁহার অদর্শনে নিরানন্দ হয়, তাই তাদের প্রবুদ্ধ করিবার অভিলাষে আনন্দ-বিকাশ। কিংবা মধুকর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সর্বকল্যাণকারী প্রভু লোকান্তর-গমনে তত্রস্থ প্রাণীগণের কল্যাণ করিবেন—ইহা ভাবিয়াই কি আনন্দ ? অথবা আনন্দ-ঘন প্রভুই জানেন, কি হেতু তাঁর আনন্দ-বিকাশ। তাঁর করুণাই যাদের সম্বল, তারা ভিন্ন অপরে এই দিব্যভাব বুঝিতে না পারিয়া পাছে অপরাধী হয়, এই ভাবিয়া কহেন এ অবস্থায় তোরা যাকে তাকে আমার কাছে আনিস নে।

প্রাণাধিক

প্রাণাধিক কথাটা আমাদের কাছে কথার কথা মাত্র। প্রভু কিন্তু তাঁহার আশ্রিতগণকে প্রকৃত প্রাণাধিক বলিয়া দেখিতেন। কোনো একজন সপ্তাহকাল নিকটে যায় নাই, বুদ্ধি-দোষে পাছে সে তাঁহার দিব্যভাব দর্শনে বঞ্চিত হয়, তাই সেবকগণকে কহেন—অমুক

আসিলে তাকে আমার কাছে আনবি। উদ্যানে যাইবামাত্রই তাঁরা তাকে অপরাধীর মতো ধৃত করিয়া উপরে লইয়া যান। অভিমানে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগ্নস্বরে ভর্ৎসনাচ্ছলে তাকে কহেন—হা রে! তোর কি আক্কেল? আমি অসুখে ভুগছি, আর তুই আমাকে দেখিস না? সে বলিল—অযথা কথাবার্তায় পাছে আপনার বেদনা বৃদ্ধি পায়, সেই ভয়ে পারতপক্ষে উপরে উঠি না। তখন প্রভু স্মিতমুখে কহিলেন—আমি তোদের শত অপরাধও লই না। তৎপরে স্বীয় ললাটে হাত দিয়ে বলেন—তোকে রোগা দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছে, আমার নিজের অসুখে তত কষ্ট হয় না। প্রবোধ দিবার ইচ্ছায় সে বলিল—অসুখে পড়ে আপনার চক্ষু রোগা হয়েছে বলেই আপনি সকলকে রোগা দেখছেন। তথাপি প্রবোধ না মানিলে নিরুপায় হইয়া সে জোরে তাল ঠুকিলে ঠাকুর বালকের মতো আনন্দ হাস্যে কহিলেন—করলেক কি রে? সেবকগণও তদ্দর্শনে হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন অধিক অভিনয় ভয়ে সে কোনোমতে প্রণাম সারিয়া নিম্নতলে পলায়ন করিল। আশ্রিতকে প্রাণাধিক করিয়া দেখিতে একমাত্র প্রভুকেই দেখিয়াছি।

নরেন্দ্রের রাধা দর্শন

যত বড় সাধু বা পণ্ডিত হউক না কেন, সংস্কারকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। যাঁহার বিধিতে উহার উদ্ভব, কেবল তাঁহারই করুণায় নিবৃত্তি পায়। এই সংস্কার-প্রভাবে বা নীতিশাস্ত্র-মোহে বা পাশ্চাত্য শিক্ষার আবিলে সুরুচিপূর্ণ নরেন্দ্রনাথ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে কুরুচি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর ভাবিলেন—নরেন্দ্র যদি প্রেমের প্রতিমা শ্রীমতীতে শ্রদ্ধাবান না হয়, তাহাকে চিরদিনের মতো মাধুর্য-রসে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। আবার প্রেমহীন হইলে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মচক্র পরিচালন তাহার পক্ষে সুখসাধ্য হইবে না। ইতিপূর্বে ইচ্ছামাত্রেই যাহাকে নির্বিকল্প অবস্থায় অধিরূঢ় করেন, এখন তাহাকে প্রেমধনে ধনী করিবার বাসনায় শয্যোপরি অঙ্গুলি দিয়া যেমন লিখিলেন—শ্রীমতী রাধে! নরেন্দ্রকে দয়া কর। অমনই যেন যাদুদণ্ড চালনায় বা কোনো মহাশক্তির (অর্থাৎ নিজশক্তি) প্রেরণায়, নরেন্দ্রনাথ রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং 'কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিবসত্রয় ভজনের পর, শুষ্ক দার্শনিক সরস হইয়া কহেন—প্রভুর কৃপায় আজ এক নূতন আলোক পাইলাম। যদি এ ভাবটা না হইত, তাহলে মাধুর্যবিহনে জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হইত।

সচ্চিদানন্দ-মাহাত্ম্য

একরাত্রে সংকটসংকুল অবস্থায় সেবকগণ যখন নিরাশায় অভিভূত এবং গিরিশবাবুও নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট, এমতকালে আশ্চর্যময় প্রভু কি জানি, কি ভাবে উল্লসিত হইয়া এক আশ্চর্যময় তত্ত্বের অবতারণা করিলেন। বলিলেন, সচ্চিদানন্দ-সাগর অপার ও অতলস্পর্শ, তাঁতে কি আছে, কি নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ বলতে পারে না; এমন কি, শ্রুতিও নির্বাক। জ্ঞানগুরু সদাশিব কেবল সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের হাঁটু-জলে নেমে, তার তিন গণ্ডুষ পান করেছেন! তাই তিনি ভোলা মহেশ্বর। মানুষের মধ্যে শিব-অংশ শুকদেব দূর হতে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর দেখেছেন। তাই তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, আর বিষয়বিরাগী নারদাদি ঋষিরা তার কল্লোল শুনেই কৃতার্থ হইয়াছেন। জীব তাঁর বাতাসেই গলে যায়, তখন দর্শন তো দূরের কথা।

রক্তদান

আবার যেমন কিছু বলিতে যাইবেন, গিরিশচন্দ্র করজোড়ে কহিলেন—ক্ষান্ত হউন। আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ইহাই যখন ধারণা হয় না, তখন আর অধিক শুনিতে কেন আপনাকে ক্লেশ দিই? বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দপ্রসঙ্গে ভাবের আতিশয্যে মুখ-বিবর হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসরণ দর্শনে সকলেই ত্রাসিত হন। কিন্তু প্রভু স্মিতমুখে কহিলেন–গিরিশ! কি দেখছ? এতে কি আর প্রাণ বাঁচে? সকলেই শঙ্কা করেন–বুঝি এখনই বা আমাদের সর্বনাশ হয়। তখন শিক্ষা দিবার মানসে আক্ষেপ করিয়া কহেন—মানব! তোমাদের কল্যাণ-কামনায় রক্তদান করলাম, এমন কি, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু ভগবানের জন্যে তোমরা কতটুকু মনপ্রাণ দিলে?

পরাভক্তি

প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে সকলে আশ্বস্ত হইলে, এবং ঠাকুরও কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করিলে, গিরিশচন্দ্র নিবেদন করেন–অনধিকারী হইয়াও আপনার করুণায় ধারণার অতীত পরাজ্ঞানের কথা তো শুনিলাম, এখন পরাভক্তি কি? জানিতে প্রার্থনা করি। আশ্চর্যের বিষয়, এবার কথাটি না বলিয়া, শয্যাপার্শ্ব হইতে ধূলি লইয়া মাথায় দিয়া কহিলেন—ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত নামে তিন হলেও বস্তুতঃ এক; তোমরা ঈশ্বরের ভক্ত, অতি পুণ্যময় সচ্চিদানন্দ-কথা তোমরা (ভক্ত) সকলে শুনলে, তোমাদের পদরেণুতে এ স্থান পবিত্র হয়েছে; তাই আমি আজ ভক্তগণের পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলাম। দেবদুর্লভ পরাভক্তি যে কি, নর-নারায়ণ স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদের দেখাইলেন যে, হীনের হীন দীনের দীন হইতে না পারিলে পরাভক্তির উদয় হয় না। গিরিশবাবু ও শরচ্চন্দ্রের নিকট যেমন শুনিয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মজ্ঞান

প্রভু যখন বুঝিলেন—তাঁহার লীলা অবসান-প্রায়, সুতরাং প্রেমের হাটবাজারও অচিরে ভাঙিবে, তখন এক গভীর নিশায় নরেন্দ্রনাথকে স্বীয় সকাশে আহ্বান করিলেন। বুদ্বুদের ন্যায় অগণন ব্রহ্মাণ্ড যে সচ্চিদানন্দসাগরে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই যেমন বিলীন, যিনি রূপের আকর হইয়াও অরূপ, গুণময় হইয়াও তাহার পার, অচল হইয়াও সচল, সর্বময় হইয়াও অসঙ্গ এবং বুদ্ধিতে বিরাজ করিয়াও ধারণার অতীত, অথচ শুদ্ধবুদ্ধির গোচর, এমন আশ্চর্যময় সচ্চিদানন্দ, ভাগ্যক্রমে যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব তাহাই হইয়া যায় অর্থাৎ নামরূপ ভাবের পারে যায়। ঠাকুর বলিতেন, যেমন লুণের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া তাতেই গলিয়া যায়। এই রহস্য যখন ভূতভাবন ভগবান শঙ্কর জীবমোহিনী আত্মবিস্মৃতা ভবানীর নিকট কীর্তন করিবেন, অথবা তাহারই তুরীয় ভাব তাঁহাকে স্মরণ করাইবেন, যদি কোনো জীব কৌতূহলবশতঃ শ্রবণ করিয়া ধারণাভাবে উন্মাদ বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সঙ্কট-নাশন শঙ্কর নন্দিকেশ্বর দ্বারা শ্রীকৈলাস প্রাণীশূন্য করিয়া অর্ধাঙ্গী ভবানীকে তাঁহার পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

নরেন্দ্রকে দান

পরমগুরু প্রভুও প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথকে এই পরমতত্ত্ব উপদেশ-মানসে তদ্গতপ্রাণ শশিভূষণকেও নিম্নতলে যাইতে বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে কহেন—ভালো করে দেখ যেন উপরে কেহ না থাকে। এইবার প্রভু তাঁহাকে অতি নিকটে বসাইয়া, যে ব্রহ্মজ্ঞান সৃষ্টিকাল হইতে গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই উপদেশ করিয়া করুণভাবে কহিলেন—যদিও আমাতে তোমাতে অভেদাত্মা, তথাপি বাহ্যদৃষ্টিতে এতদিন গুরু-শিষ্য রূপে পৃথক ছিলাম। আজ তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব অর্পণ করে ভিখারী হয়ে নামে রামকৃষ্ণ রহিলাম ; তুমি রাজরাজেশ্বর হয়ে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ হলে। দেখিও যেন এই কটা ছোঁড়া (যুবক সেবকগণ) তোমার আশ্রয়ে একসঙ্গে সাধন-ভজন করে। এই বলিয়া নিজ মহিমায় নরেন্দ্রমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, কিছুক্ষণ তাঁহাকে আপনভাবে আবিষ্ট রাখিলেন। স্বীয় অক্ষমতা এবং প্রভুর করুণা স্মরণে, প্রাণের আবেগে নরেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন এই ব্যাপার কহিয়াছিলেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব

ঈশ্বরতত্ত্ব দুর্বোধ্য ; নিরূপণে শ্রুতি নিরস্ত, ষড়দর্শনও পরাস্ত। সাংখ্যকার কহিয়াছেন—ঈশ্বর অসিদ্ধ। আবার তাঁর নরলীলা আরও দুর্বোধ্য। দুগ্ধজল মিশ্রণ ন্যায়, ঐশী ও মানব ভাবের এমন অপূর্ব সমাবেশ যে, ভাগ্যবশতঃ পাছে ফিরিয়া এবং কাছে থাকিয়া আলোক-আঁধার সংশয়ে মনে হইত—প্রভু ভগবান কি মানব ? কেবল আমাদের যে এই ভাব হইয়াছিল, এমত নহে,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদগণও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—'আমরা গোরার সঙ্গে থেকে ভাব বুঝতে নারলাম রে' তাই বুঝি আমাদের মোহনাশ-মানসে ইতঃপূর্বে কহিয়াছিলেন—যাবার সময় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব ; অর্থাৎ আমি

কে প্রকাশ করিব। তরঙ্গায়িত নদীতে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ডিত দেখায়, বিষয়াসক্ত ভক্তচিত্ত প্রভুর অনুকম্পায়, তাঁহার ঐশীভাবের আভাস পাইলেও নির্বেদ বিনা তাঁহার পূর্ণবিকাশ বুঝিতে পারিবে না, বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই করুণাময় ঠাকুর তাদের চরমকাল না আসিলেও, আপন প্রাণান্তকালে তাদের নিকট প্রকাশ করিবেন যে, তিনি কে?

উদয়াস্ত

লীলাকল্পে যাঁহার দেহধারণ, তিনিই জানেন—কবে উহার অবসান। নতুবা মানব আমরা কি বুঝিব? তাই যোগীন্দ্রকে কহেন—পাঁজীটা দেখ তো, কৃষ্ণা-প্রতিপদ কবে। উদ্দেশ্য কি? প্রকাশ করলেন না বা আমরাও বুঝিতে পারিলাম না। এখন মনে হয়, রামকৃষ্ণচন্দ্র শুক্লা দ্বিতীয়ায় উদিত হইয়া সব ধর্ম-সম্মিলনে জগতে শান্তি আনিয়া ভক্তকুলকে আলোক বুঝিতে অবসর দিবার ইচ্ছায় আঁধারের প্রথম কলায় অস্তমিত হইবেন।

শ্রাবণের শেষ দিন

আজ ধারা শ্রাবণের শেষ দিন, অথবা ভাগ্যহীন আমাদের অশ্রুধারার প্রথম দিন। অন্য দিন সেবক সঙ্গে যেরূপ কথাবার্তা কহেন, আজ সেরূপ নহে, যেন কেমন একটা ভাবান্তর। সারাদিনই ভাব বিভোর আর ঘন ঘন সমাধি। কিছুই না খাওয়ায় সেবকগণ ভাবিলেন—বোধ হয়, বেদনা-বৃদ্ধিতে আহারে অনিচ্ছা। তবে অন্য উপায়ে কিছু উদরস্থ করাতে পারিলে, বলাধান সম্ভব। আয়োজনও তদ্রূপ হইল। নিশা আগমনে সহজ অবস্থায় বলেন—দেবগণ-সমাগমে সারাদিন তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোদের সঙ্গে কথা কবার সময় পাই নাই। আজ ভাতের পায়স খাব; শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত। পায়স আনিলে বলিলেন— বসে খাব। অতিশয় দুর্বল জানিয়া সেবকগণ এমন ভাবে শয্যার পার্শ্বে উঠান, যাহাতে অনেকটা বসিবার মতো হয়। কিন্তু ইহাতেও শ্রান্তি দেখিয়া একজন প্রাণপণে বাতাস করিতে থাকে।

শূদ্রকে শয্যাত্যাগে অনুজ্ঞা

পায়স গ্রহণোদ্যত, এমতকালে দেখেন লাটু ও গোপালদাদা (জাতিতে শূদ্র) শয্যা ধারণ করিয়া আছেন। কহেন, ওদের বিছানা ছেড়ে দিতে বল। কেন করিবে! নরেন্দ্রের প্রশ্নে বলেন—ওরে! ভাত ভাত যে রে। আপনি তো বিধি-নিষেধের পার, তথাপি এ আদেশ কেন? নরেন্দ্রনাথ নিবেদন করিলে ঠাকুর বলেন—ওরে ব্রাহ্মণ-শরীর যে রে। তাই ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয়। অগত্যা লাটু ও গোপালদাদাকে শয্যা ছাড়িতে বলা হইল।

অন্ন-বিচার

যদিও বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অনেক ভক্ত ছিলেন, তথাপি ঠাকুর সকলের আলয়ে অন্নগ্রহণ করেন নাই। বলিতেন— লুচি-তরকারী খেতে পারা যায়, কিন্তু অন্ন নহে। কলিতে অন্নগত পাপই মহাপাপ। কিন্তু দেখিয়াছি, পরমভক্ত বলরাম বসুর ভবনে জগন্নাথদেবের অন্ন-ভোগ গ্রহণ করিতেন, বলিতেন—বৈষ্ণব বলে কুলপ্রথায় উঁহারা জগন্নাথ স্বামীকে অন্নভোগ দেয়, তাই উহা শুদ্ধান্ন।

বলরাম-মন্দিরে অন্নগ্রহণ করেন জানিয়া, কোনো ভক্ত তাঁদের শালগ্রাম শিলার অন্নভোগ দিয়া তাঁহাকে সেবা করাইবার প্রস্তাব করিলে ঠাকুর কহেন—তোমার তো কুলপ্রথা নয়,

কেবল আমাকে ভাত খাওয়াবার অভিলাষ, আবার তোমার দেখাদেখি অন্য ভক্তরাও এইরূপ করবে। তাহলে আমি সকল শূদ্র ভক্তবাড়িতেই ভাত খেয়ে বেড়াই ?

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ-সন্তান না হলেও, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতলে তৎপ্রস্তুত অন্নের অগ্রভাগ, বাধা দিলেও ঠাকুর বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং শ্রীমাতৃদেবীকেও দেন। বলেন—মহামায়ার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের ঘরে না জন্মালেও, নরেন্দ্র প্রাচীন নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের নর ঋষি। আমাকে জগন্মাতার গান শুনাতে, আর আমার কাজ করিতে দেহধারণ করেছে ; সে প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাই উহার অন্ন পবিত্র।

বর্ণ-বিচার

সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সমাজ-প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই, এবং তপস্যাই যখন একমাত্র ব্রত, তখন সকল মানবই এক বর্ণ ছিল। পরে সমাজ গঠন ও রক্ষণ-কল্পে, গুণের তারতম্যে জ্ঞান, বীর্য, অধ্যবসায় ও সেবার আসক্তি অনুসারে, সুতরাং অধিকার-ভেদে চাতুর্বর্ণের উদ্ভব হয়। বেদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনে যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহারাই ভগবানের মুখ-স্বরূপ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজিত হন। বেদ, ব্রাহ্মণ, সমাজ এবং উহাদের আধার ধরণীকে রক্ষা করিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহারাই বিরাটের বাহুস্বরূপ শৌর্যবান ক্ষত্রিয়। অধ্যবসায় সহকারে আয়াসকর কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনে যাঁহারা সকলের পালনভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা ঊরু বা স্তম্ভস্বরূপ মহামতি বৈশ্য। আর যাঁহারা বিবিধ শিল্পানুষ্ঠান এবং প্রীতিপূর্ণ সেবা দ্বারা সকলের অভাব মোচনে বুদ্ধিমত্তা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেন, তাঁহারাই নারায়ণের পাদস্বরূপ, সুতরাং সমাজের ধারক শূদ্রবর্ণ হন। ফলতঃ ঈদৃশ সুখকর বিধানে সৌভ্রাতৃভাবে দিন দিন সমাজের কল্যাণ হইতে লাগিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যদি কোনো ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ত্যাগ ও তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সদৃশ ঈশ্বরানুরাগী ও সদাচার-সম্পন্ন হন, সেজন্য কেহই তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করেন না, বরং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অধুনা কালবশে এবং কর্মদোষে ব্রাহ্মণ জ্ঞানহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলেও, কেবল জন্মগত অধিকারে লোক-সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন। কি জানি উপযুক্ত চেষ্টায় সুপ্ত বীজ আবার উপ্ত হইতে পারে, তাই বোধ হয় ঠাকুর বলিতেন, নেকো আমের চারাতে যে আম হয়, তাও নেকো হয় ; তবে মাটির গুণে মিষ্ট বা টক হয়ে থাকে।

শাস্ত্র বলেন, ঈশ-আরাধন জন্য যিনি ইতর বাসনা বর্জন করিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত। নতুবা আমার মতো দু'পাত পড়া যশের কাঙাল সমদৃষ্টির ধুয়ায় যাঁরা স্বেচ্ছাচারী, তাঁরা পণ্ডিত নহেন। প্রকৃত পণ্ডিত সমদর্শী হইয়া সকলকেই প্রীতি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি তাহাদের ন্যায় আচরণ করিতে পারেন ? বরং আপনি ধর্মাচরণ করিয়া সকলকে ধীরে ধীরে স্বীয় আদর্শে উপনীত করেন। হয়তো তখন লাটু বা গোপাল দাদার অন্তরে জ্ঞানের পরিপাক হয় নাই, তাই ঠাকুর তাঁদের শয্যা ত্যাগ করিতে বলেন। কিংবা বেদ-প্রসূত বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষণে যাঁহার আবির্ভাব, কি করিয়া তিনি উহার অমর্যাদা করিবেন ?

খিচুড়ি খাই

পায়স গ্রহণে রত বটে, কিন্তু ভাবরাজ্যে অবস্থান জন্য বাহ্য বিস্মৃতি, তখন কোথায় অন্ন

আর কেবা খাইবেন ? আবার চমক ভাঙিলে দুঃসহ বেদনায় গলাধঃকরণও অসম্ভব। তথাপি সেবকদিগের আগ্রহে অল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া বলেন—ভেতরে এত ক্ষিধে যে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই ; কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।

খিচুড়ি-রহস্য

আজীবন কার্যকলাপ যাঁর সবই নূতন, তাঁর খিচুড়ি খাইবার ইচ্ছাও এক নূতন ব্যাপার। অনুশীলনে দেখা যায়, অবতার পুরুষমাত্রেরই এক এক প্রকার ভোজ্য প্রিয় ছিল। অযোধ্যানাথের রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের ক্ষীরসর, অমিতাভের ফাণিত (এক প্রকার মিষ্টান্ন), শঙ্করের প্রিয় ভোজ্য কি জানা যায় না ; তবে তাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভোজে পুড়ীলাড়ুর সমাদর হয়। নিমাইচাঁদের মালসা ভোগ (মৃৎপাত্র-পূরিত চিড়া মুড়কি দধি), ভাবী কালে পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর, স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ এবং প্রভুর অন্যান্য অর্চনস্থানকে দ্বিতীয় জগন্নাথক্ষেত্রে (যথায় ভেদভাব ভুলিয়া সকল বর্ণই একসঙ্গে প্রসাদ পায়) পরিণত করিবেন ভাবিয়া দক্ষিণেশ্বর-ভূষণ প্রভু এক অভিনব সুখসাধ্য খেচরান্ন ভোজনের ইচ্ছা করিলেন। তাই প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ প্রভুর জন্মোৎসবে তাঁহারই অভীপ্সিত খেচরান্ন দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপের এরূপ বিরাট ভোগের ব্যবস্থা করেন, যাহা ভারতের কেন, জগতের কোনো প্রদেশেই দেখা যায় না।

বালকৃষ্ণ-খেলা

আহারান্তে কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করিয়া কহেন, আজ সারাদিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর, তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। ভগবান তো সর্বভূতেই বিরাজ করছেন, নরেন্দ্রনাথ বলিলে প্রভু কহেন—ওরে ! তোর বেদান্তের ঈশ্বর নয় ; তিনি চিন্ময়ও বটেন, আবার চিদ্ঘনও বটেন। লীলায় সেই চিন্ময়ের জমাট। দেখছি তিনি (ঈশ্বর) অপরূপ বালকৃষ্ণ হয়ে আপন মনে ধুলোখেলা করছেন। নবীন মেঘের মতো বরণ, জ্যোতিতে দিক আলো ; রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে—ওরে ভুবনসুন্দর ! বলিতে বলিতে পুলক। পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, তাদের গায় ধুলো দিয়ে কত আনন্দ !! কেউ গাল দিয়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার কেউ আদর করে কোলে করতে এলো, অমনই দৌড়। আবার কেউ আনমনে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়েই তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো হেতু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে কৃপা !!

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাটে হাঁড়ি ভাঙা—মহাপ্রয়াণ

অনন্তর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর প্রভু আনন্দভরে বলিলেন—যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ (আপন হৃদয় স্পর্শ করিয়া), তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ জনকল্যাণকারী সচ্চিদানন্দ, যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে রাম এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্রিয়মান ধর্মকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, কালবশে সেই সচ্চিদানন্দ তিনিই অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ ধরিয়া যাবতীয় ধর্মমত সম্মিলনে এক প্রেমপূর্ণ মহাধর্ম প্রচারে ধরাধামে শান্তি আনয়ন করিলেন। এবং তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম, গোপনে আসিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন ; এইরূপে পূর্বপ্রতিজ্ঞামত হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া অর্থাৎ আত্ম-পরিচয় দানে আমাদের চৈতন্য

আনিয়া এবং অনাগত কালের ভক্তগণকেও আশ্বস্ত করিয়া, কালী কালী রবে বরাভয় দান মানসে হস্তদ্বয় প্রসারণে শয্যায় শায়িত হইলেন ; বোধ হইল যেন তাঁহার চিরসেবিত শ্যামামায়ের চরণতলে সদাশিবের ন্যায় মহানন্দে মহাসমাধিতে নিমগন হইলেন। 'হরি ওঁ তৎ সৎ' রাত্রি আন্দাজ ১১টা।

সমাধি ভঙ্গ আশা

এতদিন কাছে থাকিয়া এবং পাছে ফিরিয়া বুঝিয়াছিলাম—মৎস্যের জল এবং বিহঙ্গমের গগন যেমন আশ্রয় ও আরামস্থল, সমাধিরাজ্যও তদ্রূপ প্রভুর স্বচ্ছন্দ বিহারভূমি। কেবল আমাদের কল্যাণ-কামনায় যেন প্রয়াস করিয়াই বাহ্য-জগতে অবস্থান করিতেন। আবার যখন যে ভাবে সমাহিত হইতেন, সেই ভাবের মন্ত্র শুনাইলে বাহ্যাবস্থায় আগমন করিতেন। সুতরাং সেই আশায় নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা প্রভুকে বেষ্টন করিয়া 'হরি ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণে প্রতি মুহূর্তেই সমাধিভঙ্গ আশায় প্রভুর প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিতে থাকিলাম।

জ্যোতির্ময় রূপ

দেখিলাম—দিব্য দেহে এমত এক জ্যোতি বিকাশ হইয়াছে, যাহাতে গৃহ পরিপূর্ণ। বোধ হইল, প্রভু যেন জ্যোতিরূপে বেষ্টিত ভক্তহৃদয়ে ও নিখিল জগতে প্রবেশ করিলেন। এমন আনন্দভাব ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো দেখি নাই। আরও দেখিলাম—পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত এবং কেশগুলিও কন্টকিত।

কেন এত আনন্দ

আজ কেন এত আনন্দ ? প্রেমপূর্ণ যুগধর্ম প্রবর্তনে জগতের কল্যাণ করিলেন এবং আপনাকে প্রকাশ করিয়া ভক্তকুলের প্রজ্ঞা উৎপাদন করিলেন, তাই কি এত আনন্দ ? অথবা জীবদায়ে যে ভাগবতী তনু ধারণ করিয়াছেন, সেই দায়-মুক্ত হইয়া নিজ মহিমায় নিমগন হইলেন, সেই হেতু কি আনন্দ ? কিংবা দক্ষিণেশ্বর অবস্থানকালে রামলীলা উপলক্ষে আমাকে যে নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায়ে বুঝি মর্ত্যধাম ছাড়িয়া অনন্তলোকে অনন্তকাল ব্যাপিয়া রামকৃষ্ণলীলা করিবেন—তাইতে কি এতই আনন্দপুলক ? অথবা অনায়াস-লভ্য প্রভুর অনুকম্পায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমরা তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিতে পারি নাই, সেই অভিমানে কি অন্তরালে থাকিয়া আমাদের ধ্যান-মঙ্গল বৃদ্ধি বাসনায় ছায়াশরীর পরিহারে অলক্ষ্যে আমাদের কৃপাদৃষ্টি করিবেন, কিংবা হৃদিগুহায় অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের জীবন-গতি নিয়মন করিবেন, এই ভাবিয়া কি এত আনন্দ ? মূঢ় আমরা কি-বা বুঝি, আর কি-বা বলিব, সর্বজ্ঞ প্রভুই জানেন, আজ তাঁর কেন এত উল্লাস ?

সন্তানদের মনোভাব

কিন্তু এভাব দর্শনে আমাদের আনন্দ নাই। কারণ যাঁহাকে লইয়া আনন্দ, তিনি এমন সমাহিত যে, আমাদের বহুক্ষণব্যাপী উচ্চ 'হরি ওঁ' রবেও বাহ্যজ্ঞান আসিল না। আবার সংশয় হইল, হয়তো আমরা বর্তমান মহাসমাধির বিষয় বুঝিতে পারি নাই, তাই অজ্ঞানজ মন্ত্রোচ্চারণ বিফল হইল। আবার নিরানন্দও নাই, বলবতী আশা দক্ষিণেশ্বরের ব্যাপার মনে আনিয়া দিল—প্রভুর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যান-মূর্তি, বলেন, 'ইহা গভীর সমাধির অবস্থা, তাই আমি ইঁহার পূজা করিলাম। দেখিবি, কালে ঘরে ঘরে ইহার পূজা হবে।

ভবনাথের জেদে ছবি তোলাতে বিষ্ণুঘরের রকে বসে এমন সমাধিস্থ হই যে, ফটো উঠালেও ধ্যানভঙ্গ হল না দেখে, আমি মরে গেছি ভেবে ফটোওয়ালা অবিনাশ যন্ত্রপাতি ফেলে পালায়।' তাই আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া, এই জাগিবেন, এই উঠিবেন, ভাবিয়া সারারাত্রি প্রভুকে ঘিরিয়া তাঁহার অপূর্ব ভাব দেখিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য ঘটনা

এই সময় এক নৈসর্গিক ঘটনা দেখা যায়। চন্দ্রবিম্ব ক্রমান্বয়ে রক্ত, পীত ও নীল বর্ণ ধারণ করে। কেন জানি না; তবে অনুমান—হয়তো (গোলকে) জগৎব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইবার কালে ধরণীর সন্নিকট চন্দ্রলোকে প্রথম পদার্পণ করায়, চন্দ্রমা কৃতার্থ হইয়া উল্লাসে বিবিধ বর্ণ ধারণ করেন। অথবা শীত-স্বভাব-ইন্দু, রামকৃষ্ণ ভগবানের ভর্গরূপ তেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া, বেদনায় বহুবর্ণ প্রকাশ করেন।

লীলাকাল

তরল সাগর শৈত্যপ্রভাবে স্থানবিশেষে জমাট বাঁধিয়া যেমন তুষারে পরিণত হয়, আশ্চর্যময় সচ্চিদানন্দও তেমনই জীবকল্যাণ-বাসনায় (আত্মরতি) ভক্তিহিমে ঘন হইয়া সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার ব্রাহ্মমুহূর্তে নবকলেবরে রামকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়া, মাধুর্য লীলা সমাপনে, সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রবিবার কৃষ্ণা প্রতিপদে রাত্রি ১১টার সময় বসুন্ধরা ও ভক্তকুলকে অনাথ করিয়া স্বীয় মহিমায় অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। হরি ওঁ তৎ সৎ।

সন্তানদের পূজা ও আশা

যে নারায়ণী তনু ধারণে অর্ধশতাব্দী কাল জগৎ ও জীবকে সনাথ করিয়াছেন, সেই দিব্যতনুর শেষ পূজা মানসে আমরা সকলে উদ্যানের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রাণ ভরিয়া শ্রীপদে অর্ঘ্য দান করিলাম; এবং দিব্য গন্ধ ও পুষ্প দিয়া শয্যাও সজ্জিত করিলাম। কিন্তু মাল্যদানকালে অনুভব হয় যে, শ্রীঅঙ্গে তখনও তাপ বিদ্যমান এবং অঙ্গজ্যোতিতে গৃহও দীপ্তিমান। তখন আবার আশা হইল যে, প্রভু অচিরে ব্যুত্থান করিবেন।

বাতাস বার্তাবহ

আলোক-আঁধার, আশা-নিরাশায় মুহ্যমান আমরা বুঝিতে পারি নাই—কিরূপে প্রভুর মহাপ্রয়াণসমাচার কলিকাতায় ভক্তমধ্যে প্রচারিত হয়। দুঃসংবাদ সহজেই আত্মপ্রকাশ করে বলিয়াই বোধ হয় বাতাসই এই দুঃখবারতা বহন করিয়াছিল, অথবা কোনো অজ্ঞাত লোক বার্তাবহ হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার সর্বপ্রথমে উদ্যানে উপস্থিত হন; এবং প্রভুর আনন্দপূর্ণ আনন, রোমাঞ্চিত তনু, এবং অঙ্গজ্যোতিতে গৃহ পূর্ণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহেন—এই দিব্যাবস্থার প্রতিকৃতি গ্রহণ আমি বাঞ্ছনীয় বোধ করি। অতএব কলিকাতায় যাইয়া আমি এখনই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।

মহাসমাধি

তৎপর নেপালরাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর যাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন, এবং যিনি নারায়ণ জ্ঞানে প্রভুকে ভক্তি পূজা করিতেন, আসিয়া প্রভুর দিব্যরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া কহেন, যোগীশ্বর আজ মহাসমাধি-মগ্ন। যোগ-শাস্ত্রে বিধি আছে, এমত অবস্থায়

ব্রাহ্মণ শরীর ভক্ত মহাযোগীর গ্রীবা, বক্ষঃ এবং গুল্‌ফদ্বয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া গব্যঘৃত প্রয়োগ করিলে সমাধি ভঙ্গ হইতেও পারে ; অতএব এখনই ইহার অনুষ্ঠান হউক। সুতরাং তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া শশীভূষণ গ্রীবা, শরৎচন্দ্র বক্ষ এবং আমি গুল্‌ফদ্বয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলাম ; কিন্তু হায় ! কোনো ফলই হইল না। তখনই ধারণা হইল যে, নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য ভাঙিয়াছে।

মাতৃদেবী

এক আলয়ে অনেক দিন থাকিয়াও দর্শন তো দূরের কথা, এমন কি, যাঁহার কণ্ঠস্বরও এতাবৎ কেহই শুনিতে পায় নাই, সেই অমানুষী হ্রী-সম্পন্না ভগবতী শ্রীমাতৃদেবী, লোক-দৃষ্টিতে অর্ধাঙ্গী হইলেও কালীমাতার মূর্ত বিগ্রহ জ্ঞানে চিরদিনই ঠাকুরের সেবার্চনা করিতেন। সারারাত্রি দারুণ উৎকণ্ঠায় নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ ভাবে থাকিয়া যখন বুঝিলেন যে, নির্দয় সমাধি আর অবসান হইবার নহে, তখন হতাশ হইয়া নদীর উচ্ছ্বাসের মতো অবরোধ ভাঙিয়া প্রাণের আবেগে 'মা কালী গো ! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো' বলিয়া ভূপতিত হইয়া উচ্চরোলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, আমাদের পূজনীয়া লক্ষ্মীদিদি ও গোলাপ মা ভগ্নহৃদয়ে পরিচর্যা করিয়া কোনোমতে প্রবোধ দিতে থাকিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তসমাবেশ

চিরদিনের মতো শ্রীমূর্তির শেষ দরশনে কৃতার্থ হইব ভাবিয়া ভক্তগণ দলে দলে সমাগত হইলেন। অপরাহ্নকালে, প্রভুর ছায়ামূর্তি নিম্নতলে আনিয়া খট্টোপরি স্থাপনে পুষ্পমাল্যে শোভিত বা পূজা করিবার পর ছায়াচিত্র (ফটো) লওয়া হয়। পরিতাপের বিষয়, অত্যধিক বিলম্ববশতঃ প্রাতঃকালের সে জ্যোতির্ময় ভাবটি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ভার বহন

অপার করুণায় যিনি এতদিন আশ্রিতগণের সর্ববিধ (ঐহিক পারত্রিক) ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আজ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কণামাত্র ভারবহনে কৃতার্থ হইতে পারি, এই আশায় ভক্তকুল ব্যগ্রভাবে কেহ বা স্কন্ধে ধরিয়া, কেহ বা খট্বাঙ্গ পরশ করিয়া, বিভু-গুণ কীর্তন সহ ধীরে ধীরে সুরধুনী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দেবগণের পূজা

সুস্থ এবং অসুস্থ অবস্থায়, ঠাকুর আমাদের বলিতেন, দেবগণ প্রায়ই সকল সময় আগমন করেন এবং তিনিও দেবভাষায় তাঁদের সঙ্গে আলাপন করেন। বহুকালের পর আপনাদের মনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার পরমধামে আসিতেছেন দেখিয়া, দেবগণ উল্লাসভরে দেবদেবের পূজাচ্ছলে ক্ষণিকের জন্য পুষ্পবৃষ্টি-তুল্য এমন বরিষণ করিলেন, যাহাতে পুষ্প-শয্যার অপচয় ঘটিল না ; এমন কি, অনুগামী ভাগ্যহীনরাও আর্দ্র হইল না। বরং সে বরিষণ যেন অভাগাদের শোকানলে শোষিত হইয়া যাইল।

গঙ্গাতীরে ঘটনা

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রতনবাবুর ঘাটের নিকট বিশ্রাম-জন্য বটতলায় দাঁড়াইলে, 'বসুমতী-পত্র'

অধিকারী উপেন্দ্রনাথ, যিনি সন্তপ্ত যাত্রীগণের একজন, বৃক্ষমূলে সর্পদষ্টে সংজ্ঞাহীন হইলে, সকলে তাঁহার জন্য চিন্তিত হন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দারুণ দুর্ভাগ্যে যখন সকলেই হতবুদ্ধি, বিনা ঔষধ বা মন্ত্র প্রয়োগে, কি জানি কোন্ অদৃষ্ট দৈব-মাহাত্ম্যে সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্তগণের জন্ম-মরণ-বিপদ-উদ্ধার হেতু যাঁর আবির্ভাব, তাঁহার প্রয়াণকালেও কি কাহারও আপদ ঘটিতে পারে?

শ্মশান

ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, সাধু বা অসাধু, ধনবান বা নির্ধন, পরিণামে সকলেরই দেহ যথায় ভস্ম বা মৃত্তিকা পরিণতিতে সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম শ্মশান। অথবা যে মহাক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিয়া কৈবল্যদায়িনী মহাকালী জীবকে যন্ত্রণামুক্ত করিয়া তাঁহার পরম পদে অগ্রসর করিয়া দেন, ঈদৃশ পুণ্যস্থান শ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই শ্মশানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর ছায়ামূর্তিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রস্তর-পুত্তলি ভক্তকুল বেষ্টন করিয়া বসিলে, ব্রাহ্মভক্ত চিরঞ্জীব শর্মা, ভগবৎ-সন্নিধানে প্রার্থনা, এবং ভাগ্যহীনদের সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে—'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে। হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে॥' এবং 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি॥' —দুটি হৃদয়গ্রাহী গীত করেন।

মহাযজ্ঞ

সৃষ্টির প্রারম্ভে ধর্ম-প্রবর্তন মানসে দেব ও ঋষিগণ বিরাট পুরুষকে বিবিধ অংশে বিভক্ত ভাবিয়া ঋতুগণকে অগ্নিআদি হবনদ্রব্য কল্পনায় যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আজ শোকতপ্ত ভক্তগণ মহা শোকযজ্ঞে অচিন্ত্যচরিত প্রভুর ছায়াশরীরকে সুরতপ্ত (চন্দনকাষ্ঠ) অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। বোধ হইল যেন নারায়ণী তনুর পঞ্চ অংশ তাঁহার পূর্বসৃষ্ট পঞ্চ তন্মাত্রায় মিলিত হইয়া তাহাদিগকে আরও পবিত্র করিল।

ভূষণের নিষ্ঠা

গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ আমাদিগকে নিষ্ঠাভক্তি শিক্ষাদান উদ্দেশে, প্রভুর সেবাকালে ব্যজন জন্য যে তালবৃন্ত ধারণ করেন, এখন তাঁহার ছায়াতনুর বহ্নিপূজাকালেও তাঁহাতে এবং অগ্নিতে অভেদ জানিয়া, ব্যজন করিতে থাকেন। অথবা অপূর্ব নিষ্ঠাযোগে আশ্চর্যময় প্রভুকে হোমাগ্নিমধ্যে বিদ্যমান দেখিয়া ব্যজন করিতে রত হন। আমার মতো বুদ্ধিমান হয়তো ভূষণকে বাতুল মনে করিতে পারেন, কিন্তু যিনি দিব্যচক্ষে সর্বকালে ও সর্বস্থানে আপন ইষ্টদেবকে দর্শন করিতেন, তিনি আমাদের মতো কামিনীকাঞ্চনে পাগল না হইয়া, শাশ্বত শান্তির উৎস রামকৃষ্ণ-ধ্যানে বিভোর হইয়া বহুলোকের কল্যাণ করিয়াছেন।

অস্থি সঞ্চয়

যজ্ঞ-সমাপনে ভক্তগণের পরমনিধি প্রভুর পবিত্র দেহাবশেষ সঞ্চয় করা হয়। জগত্তারণ-বাসনায় দ্রব হইয়া যিনি গঙ্গারূপে প্রবাহিত, সেই পুণ্যনীরে নারায়ণাস্থির কথঞ্চিৎ নিমজ্জিত করিয়া মনে হয়, স্বর্ণদী জীবমালিন্যমুক্ত হইয়া যেন পুণ্যতরা হইলেন। কিন্তু কি জানি কোন্ প্রেরণায় অথবা প্রজ্ঞান আলোকে, সন্তানশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ শুভমিশ্র অশুভ আশঙ্কায় কহেন—সমস্তই পাত্রে রক্ষা না করিয়া দিব্যাস্থির কিঞ্চিদংশ স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া অর্চনা করিও।

পরিতাপ

অযোধ্যানাথের স্বর্গারোহণে রামগতপ্রাণ অনেক অযোধ্যাবাসী রামবিরহ দুঃসহ বোধে পবিত্র সরযূতে নিমগ্ন হইয়া রামানুগমন করেন। কিন্তু কঠিনপ্রাণ আমরা প্রভুর দেহাবশেষ জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে পারিলাম না। ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস বা যুগধর্ম।

সন্তানদের মনোভাব

অবভৃথস্নানাবসানে ভক্তগণ ভগ্নহৃদয়ে উদ্যানে ফিরিয়া শিরোধৃত পুণ্যাস্থি প্রভুর শয্যায় রক্ষা করেন। যে কয়দিন দিব্যাস্থি তথায় ছিল, সন্তানগণ মনে করিতেন—যেন প্রভু প্রসন্নচিত্তে তাদের পূজা লইতেছেন ও ভজন-গীত শ্রবণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—লোকদৃষ্টিতে অন্তর্ধান হয়েছি বটে, কিন্তু তোদের পরিত্যাগ করিনি, কেবল ধ্যান-মঙ্গল বাড়াবার ইচ্ছায় অন্তরালে ডেকে কৃপাদৃষ্টি করছি।

নরেন্দ্রের সাধ

ঠাকুর চিরদিন স্বর্ণদীতীরে দিনযাপন করিয়াছেন বলিয়া নরেন্দ্রের সাধ—প্রভুর দিব্য দেহাবশেষ সময়মতো গঙ্গাতীরে কোনো স্থানে সমাহিত হয়। কিন্তু সে সাধে বাদ ঘটিল। সাধু বা ভক্ত হউক না কেন, আত্মদর্শন বিনা অহমিকা ঘুচে না। জন্মাষ্টমীর দিন দুই পূর্বে সহসা এক গভীর রাত্রে অনুচর সহ, অক্রূরের মতো ক্রূর নিত্যগোপাল আসিয়া কহেন—প্রভুর দিব্যাস্থি সমর্পণ করিতে হইবে, আমরা কাঁকুড়গাছির (গঙ্গাহীন) যোগোদ্যানে জন্মাষ্টমীদিনে সমাধি দান করিব। নরেন্দ্রনাথ আপত্তি জানাইলে নিত্যগোপাল বলেন—তর্কের উপর তর্ক আছে। মনোবেদনায় সকলেই নির্বাক। ভাগ্যে রুদ্রাবতার নিরঞ্জন নিদ্রিত, না হলে একটা কাণ্ড বাধিত। বলিয়া রাখা ভালো যে, রামদাদা ও নিত্যগোপাল দুজনে মাসতুতো ভাই, একসঙ্গে বাস করিতেন এবং ইঁহাদেরই পরামর্শে এই ব্যাপার ঘটে।

যোগোদ্যান

রামদাদার ইচ্ছা, সমারোহ করিয়া প্রভুর পবিত্র দেহাবশেষ তাঁহার কাঁকুড়গাছির বাগানে, (যথায় ঠাকুরকে একবার লইয়া যান) সমাহিত করেন ; কিন্তু একা কার্য সমাধা অসম্ভব জানিয়া গৃহী ভক্তগণকে অর্থযোজনা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রাণবন্ত সুরেন্দ্রনাথ সাশ্রুনয়নে কহেন—আমরা অর্থ দিয়াছি বটে, কিন্তু যে মহাভাগ যুবকগণ এতদিন ধরিয়া প্রভুর সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা, এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে প্রভুর চরিতামৃত আলোচনায় দিনপাত করিতে পারি, তাহারই অনুষ্ঠানে আত্মনিবেদন করিব।

দিব্যাস্থি

আশ্চর্যময়ের সবই আশ্চর্য বলিয়া, তাঁহার দিব্যাস্থি-মহিমাও আশ্চর্যময়। লীলাবিলাস-কালে শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে মন্দির যেরূপ সুবাসিত থাকিত, গৃহে অর্চিত তাঁহার পূত অস্থি হইতে পদ্ম বা চম্পক-গন্ধ নিঃসৃত হইয়া ঘর আমোদিত করিত। যে কেহ আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই এই সৌরভ পাইয়াছেন।

শাস্ত্রবিধি আছে, তপ দ্বারা অন্তর এবং স্নান দ্বারা বাহ্য শুচি না হইলে, দেব-বিগ্রহ-পরশের অধিকার হয় না। স্বামিজী কর্তৃক বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে ওলিবুল নামে এক মার্কিণ রমণী আগমন করেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি এবং স্বামিজীর প্রতি

বাৎসল্য ভাব দর্শনে সরলমতি সারদানন্দ কল্যাণকামনায় তাঁহার মস্তকে প্রভুর পবিত্রাস্থি-পাত্র স্পর্শ করান। ভক্তিমতী হইলেও পাশ্চাত্য জাতির বাহ্য শৌচ একপ্রকার অসম্ভব। সে জন্য ঠাকুর স্বামিজীকে স্বপ্নাদেশ করেন—যাকে তাকে এখন আর আমাকে স্পর্শ করাসনে। তদবধি পূতাস্থি-পাত্র বেদিকা-মধ্যে রক্ষিত হইলে, বেদিকার উপর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয় ; কেবল জন্মতিথি দিনে বাহিরে আনিয়া অর্চন হয়।

স্থান-মাহাত্ম্য

তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী ভূদেব-স্বরূপ ; কিন্তু ব্রহ্মবিৎ সকলের শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা যথায় অধিষ্ঠান করেন, তাহা পবিত্র। পরন্তু লোকোত্তর বা অবতার পুরুষের লীলাস্থল, এবং তাঁহাদের দিব্য দেহাবশেষ বা ব্যবহৃত পদার্থ যথায় প্রতিষ্ঠিত, তৎস্বরূপ বলিয়া মহাপবিত্র ও পুণ্যতম। যে ক্ষেত্রে ঈদৃশ মহানিধি বিদ্যমান, তাহা তীর্থস্থান বলিয়া পূজিত। এই মহাপীঠে আসিলে, অন্তরে ঐশীভাবের উদয় হয় বলিয়া ধর্মপ্রাণ নরনারী আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করে। বাংলাদেশে কালীক্ষেত্র কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থান, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিহারস্থান গঙ্গাতটস্থ খড়দহ, যথায় ৺শ্যামসুন্দর মন্দিরে তাঁহার ব্যবহৃত কন্থা রক্ষিত ; এবং জাহ্নবীর পশ্চিম কূলে বেলুড়—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, যথায় প্রভুর দিব্যাস্থি ও ব্যবহৃত দ্রব্য অর্চিত, তাহা পরম তীর্থ বলিয়া সর্বসাধারণ-সেবিত।

হীনপ্রভ

কিন্তু হায়! কালবশে বা আমাদের ভাগ্যদোষে সাধের বেলুড় মঠের প্রভা যেন হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে। একটা চলিত কথা 'নির্বংশ যে হয় তার আগে মরে নাতি', তাই বোধ হয় প্রথমে আত্মকলহ। পরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্থিত কবচ যাহা শ্রীমাতৃদেবী ইষ্ট-দেবতা জ্ঞানে বহুকাল অর্চন করেন, এবং স্নেহবশতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরাম মহারাজকে, আমারই সমক্ষে অর্পণ, এবং উহার পূজাবিধি উপদেশ করিয়া কহেন—ঠাকুরের স্বরূপ এই দিব্য-কবচ তুমি মঠে রাখিয়া পূজা করিও।

নিধি অপহৃত

জানা গিয়াছে—সেই পরম নিধি কবচ অপহৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গোপীভাব সাধনকালে মথুরানাথ-প্রদত্ত যে বারাণসী ওড়না অঙ্গে আবৃত করিয়া ঠাকুর প্রকৃতিবেশ ধারণ করিতেন, এবং যাহা অনেক সাধ্যসাধনার পর রামলাল দাদার কাছে পাওয়া যায়, তাহাও অপহৃত। ইহাতে শঙ্কা হয় যে, ভক্তকুলের অমূল্য নিধি প্রভুর পূতাস্থি স্বামিজী যাহাকে 'আত্মারাম' বলিয়া অর্চনা করিতেন এবং যাহা এতাবৎ বেলুড় মঠে অর্চিত হইতেছিল, ভক্তগণ-গচ্ছিত সেই অমূল্য নিধি মঠে বিদ্যমান আছে কি নাই?

আমাদের অধোগতি

গোস্বামী মহোদয়গণ প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর কন্থা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, আর অতি অপদার্থ আমরা অর্ধ শতাব্দীও নয় পরমনিধি রক্ষা করিতে পারিলাম না ; ইহা বড়ই পরিতাপ ও ধিক্কারের বিষয়!! কেন যে এমন হইল, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা কি বুঝিব? তবে মহামায়ার খেলা বলিয়া মনকে শাঠ্যপূর্ণ প্রবোধ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু জগৎ বলিবে—কামিনী-কাঞ্চন-মোহে আমাদের দুর্গতির চরম হইয়াছে।

ঠাকুরের গান

নাদই (ওঁকার) ব্রহ্ম, এই নাদেই বিশ্বসৃষ্টি, এবং নাদেই লয়। এই নাদ-সাধনে যে সকল ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, তাহাই সপ্তস্বর বা সুর। এই সুর আলাপনে অন্তরাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয় বলিয়াই, বেদমন্ত্র সপ্তস্বরে গীত হয়। তাই ঠাকুর সঙ্গীতের সমাদর করিতেন, এবং ভাবপূর্ণ সঙ্গীত-শ্রবণে সমাধিস্থ হইতেন। বোধ হয়, এই কারণেই সঙ্গীত-নায়ক ঈশানের গানে নারায়ণ দ্রব হইয়া ব্রহ্মবারি গঙ্গাধারায় মর্ত্য-সন্তাপ হরণ করিতেছেন।

কলাবিৎ না হইলেও, স্বভাবজ বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে ঠাকুর এমন সুমধুর গান করিতেন, এবং গীতসনে এমন একটি ভাবের অবতারণাও করিতেন, যাহাতে সকলেই আত্ম-হারা হইত। সময় অসময় ঠাকুর যে কত গান করিতেন, তাহা ইতি করা যায় না। পুষ্প ও তার সৌরভ যেমন অভিন্ন, তেমনি ঠাকুর ও তাঁহার গীত অভিন্ন। আবার প্রত্যেক গীতে তাঁর কৃপা এমনই অর্পণ করেছেন যে, এই গীতানুশীলনে ভক্তের অন্তর ভাবে আপ্লুত হইবে ভাবিয়া প্রভুর ইচ্ছায় গুটিকতক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত অনুশীলন শেষ করিলাম।

কালীতাণ্ডব গীত

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥ (মা)
কে গো বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
(আঁখর) কে গো ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী, উভয়ে পাগলের পারা,
লজ্জা ভয় তো রাখে না॥ (মা)

উন্মত্ত ও উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় পদবিক্ষেপ-সহ যখন এই গীতটি গান, স্বামীজী বলেন, তখন ঠাকুর টলমল, ঘরটি টলমল, আর আমিও টলমল।

কৃষ্ণকালী সোহাগ

যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি।
সে রূপ লুকালে কোথা করাল-বদনী। (গো মা)
(আঁখর) একবার নাচ গো শ্যামা, তেমনি তিমনি তেমনি করে,
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, ললিত ত্রিভঙ্গঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা গলে।
অসি ফেলে বাঁশী নিয়ে, ও তোর শিব বলরাম হোক,
হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি॥
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে (গো মা)।
কত তাথেয়া তাথেয়া তাথেয়া থেইয়া বাজত নুপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে ব্রজের রমণী॥ (গো মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুলা হইত,
বলে ধর ধর ধর রে গোপাল ক্ষীরসর-ননী।
এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী (গো মা)

বেণু বাজা গো মা, ও তোর মোহন বেণু একবার বাজা গো মা,
যে বেণুরবে ধেনু ফিরাইতে, সেই মোহনবেণু একবার বাজা গো মা,
যাতে যমুনা উজান বয়,
বাজুক তোর বেণু বলাইয়ের শিঙ্গা।
(ও মা আনন্দময়ী) বাজুক তোর বেণু বলাইয়ের শিঙ্গা ॥

কতক্ষণ ধরে আনন্দে হেলেদুলে নাচতে নাচতে তাঁর মা কালীকে আদর করে যেন আমাদের মাঝখানে নাচাচ্ছেন। এ নাচন গীত ও দৃশ্যটি ভুলিবার নয়।

আদরের গীত

(১)

আদরে হৃদয়ে রাখ, আমার আদরিণী-শ্যামা মাকে।
মাকে (ব্রহ্মময়ী মাকে) তুমি দেখ যেন মন আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো,
(জ্ঞান) নয়নকে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় রে মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন (মাঝে মাঝে) মা বলে ডাকে ॥

(২)

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যাম-সুধা-তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।
ও তোর লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা, ভয়ঙ্করা কালকামিনী ॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী (ও মা) ॥

(৩)

আমি তাই কালরূপ ভালোবাসি।
ভব (জগ) মনোমোহিনী এলোকেশী ॥
বিষয় বিষয়ানলে দহে তনু দিবানিশি,
যখন কালীরূপ অন্তরে জাগে, আনন্দ-সাগরে ভাসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের সবাই তারা একবয়সী,
তার মাঝে বিরাজ করে আমার শ্যামা মা পূর্ণিমার শশী ॥
কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালোবাসি।
মায়ের রাঙাপায়ে বিরাজ করে গয়াগঙ্গা বারাণসী ॥

(৪)

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
জপ-যজ্ঞ-পূজা-হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ-যজ্ঞ আমার ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ॥

(৫)

শ্যামাধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন বোঝে না এ কি দায়।
শিবের অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙা পায় ॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দে সুখে ভাসে (একবার) শ্যামা যদি ফিরে চায় ॥ (রে)
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় রে ॥

(৬)

এবার আমি ভালো ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥
নূপুরে মিশায়ে তাল, সেই তালের এক গীত শিখেছি।
তাদূম তাদূম বাজছে সে তাল নিমিখে ওস্তাদ করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
এবার কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ॥

গান করতে করতে আহ্লাদে আটখানা, মুখে হাসি ধরে না।

বিস্ময়ের গান

(১)

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল পদে মহাকাল তার কেন কালো রূপ হল।
অনেক বড় কালো আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো।
যারে হৃদয়মাঝে রাখলে পরে হৃদিপদ্ম করে আলো ॥
নামে কালী রূপে কালী, কালো হতেও অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
যারে না দেখে নাম শুনে কানে মন নিয়ে তায় লিপ্ত হল ॥

(২)

তোদের ক্ষ্যাপার হাট বাজার (মা তারা)।
গুণের কথা কব কার (মা)॥
ঘরের কর্তা যিনি পাগল তিনি ক্ষ্যাপার মূলাধার (মা তারা)
তোদের দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস তার ॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার ॥ (মা তারা)
আবার চাকলা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে আনিবার ॥
ও মা শ্মশানে মশানে ফিরিস, কার বা ধারিস ধার। (মা তারা)
এবার রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার ॥

বিশ্বাসের গান

বুক যেন পাঁচ হাত মুখে হাসি ধরে না।

(১)

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
মা কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।
আবার যেমন ভাবে তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয় ॥
কালীপদে সুধাহ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয় মা তারা, চিত্ত ডুবে রয়।
তবে সন্ধ্যাপূজা বলি হোম কিছুই কিছু নয় ॥

(২)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, (ও তা) জানা যাবে গো শংকরি ॥
আমি হত্যা করি ভ্রূণ, নাশি গো-ব্রাহ্মণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
আমি এ সব পাতক না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

(৩)

একবার ডাকার মতো ডাক দেখি মন,
শ্যামা কি থাকতে পারে।
কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম আলো করে ॥
(আর মনে নাই)

অভিমানের গান—মুখভার

(১)

আমি মা মা বলে আর ডাকিব না।
তারা দিয়েছ দিতেছ যতেক যন্ত্রণা।
যত ডাকি আমি মা মা বলিয়ে, আমার মা বুঝি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুখ সন্তানে, (এমন) মা বেঁচে কি তার ফল বল না।
ও মা ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা ধরিস এলোকেশী,
না হয় ঘরে ফিরে যাব, ভিক্ষে মেঙে খাব, মা বলে আর তোর কোলে যাব না ॥

(২)

দয়াময়ী তোমায় কে বলে।
(মা) রাবণ রাজা পরম ভক্ত তারে সবংশে মারিলে ॥

মাস্টার মহাশয়ের দুটি ছেলে কলেরায় মারা গেলে এই গান গেয়ে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন।

জোরের গান

তাল ঠুকে অর্ধ-বাহ্য ভাবে,
জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ রণ-বেশে কাল প্রবেশে ঘরে ॥
ভক্তি রথে-চড়ি, ধরে জ্ঞান-তূণ, রসনা-ধনুতে জুড়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম বহ্ম-অস্ত্র তায় সংযোগ কর রে ॥
আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি সব শত্রুনাশে চাইলে রথ রথী,
রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথী-তীরে ॥

এই গীতটি শুনে মণি মল্লিক বলেন, আমার পুত্রশোক ঘুচে গেল।

বিলাপ

আমি ঐ খেদে খেদ করি (মা তারা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মা মনেরে আঁখি ঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্ট বলে ঘুরে মরি ॥

কুণ্ডলিনীর জাগরণ

(ও মা) জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী।
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী।
প্রসুপ্তা ভুজগাকারা (সার্ধত্রিবলয়সমা) স্বয়ম্ভু-শিববেষ্টিনী ॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী ॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥

নেচে নেচে গান করে, ঠিক যেন আমাদেরই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগাচ্ছেন।

আকাঙ্ক্ষা

কবে সমাধি হব শ্যামা চরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে ॥
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব
সর্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব হেরি আপনে আপনে ॥
গাহিতে গাহিতে সমাধি। আবার গীত সনে সমাধি—
ভুবন ভুলাইল মা ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী ॥

প্রার্থনা

দুর্গে এবার কর মা এ দীনের উপায়।
যেন পায় স্থান পাই ॥
আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে তব প্রিয় পঞ্চস্থলে,
মম পঞ্চ ভূতাত্মা যেন মিশায় ॥
আমার এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎপ্রতিমায়
মা মোর পবন যেন চামর ব্যজনে যায়,
হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়।
শ্রীমন্দিরের অন্তরে আকাশ রয়।
আমার যায় যেন জল অর্ঘ্যজলে, ভবে জন্ম যায় বিফলে,
দাশরথির জীবনে মরণ দায় ॥

প্রার্থনা সঙ্গে যেন চারদিকে লুটে পড়ছেন।

মাকে কাপড় পরাচ্ছেন

ও মা বসন পর মা, বসন পর তুমি।
রাঙা চন্দনে মাখায়ে জবা পদে দিব আমি (গো)

দুষ্ট মেয়েকে ধরে কাপড় পরাতে সমাধি।

রঙ্গরস

(১)

কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ দোনো ছুকরি বি সাৎ,
আর এক বেটা জুলপি কাটা, বাঘটা কামড়ে নেচে টুঁটি ॥

মাকে দেখে আহ্লাদে নাচন।

(২)

একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা,
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কটি।
শিব মলে অনাথ হবে,
কার্তিক গণেশ ছেলে দুটি ॥

যেন মাকে ধরে নামাচ্ছেন।

(৩)

বাজবে গো মহেশ-হৃদে আর নাচিসনে ওলো ক্ষ্যাপা মাগি।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, মহাযোগে মগন যোগী ॥
বিষ খেয়ে যার হয়নি মরণ, সে মরবে মা কিসের কারণ।
(কেবল) লোককে দেখায় কপট মরণ (তোর) রাঙাচরণ পাবার লাগি ॥

যে দেখি তোর নাচনের জোর, (বুঝি) নেচে ভাঙলি বুড়োর পাঁজর ।
(ও কি করলি মা) (নেমে দাঁড়া মা দাঁড়া মা)
যেন হাত ধরে টানছেন
বিষ খেয়ে গিয়েছে সব জোর, সাধে তাই মুদেছে আঁখি ॥

(৪)

গালে হাত দিয়ে অবাক ও নাচ—

আই মা কি লাজের কথা মিনষের ওপর মাগী ।
বেটীর পদতলে পড়ে ভোলা অপরূপ এক যোগী ॥
নয়নে না দেখ চেয়ে, ওগো শিব আছেন শব হয়ে,
(আঁখর—ও কি করিলি মা) আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল লাজ-(লজ্জা ভয়) ত্যাগী ॥

(৫)

বলি কোন্ হিসেবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে ।
সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ, (আহা) যেন কত ন্যাকা মেয়ে ॥
বল মা তোরে সুধাই তারা, (তারা) এমনি কি তোর কাজের ধারা,
(ওগো) তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে ॥

ঠাকুর বলিতেন,—রসো বৈ সঃ যে তিনি, নানাভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো হবে । নয়তো খালি দয়াময়, প্রভু বললে কি রস হয় । তাই কেশববাবুকে যেমন করে রঙ্গরস গানে আকর্ষণ করেন, সেই গানটি গাইছেন,—

জানি ওহে জানি বঁধু তুমি কেমন রসিক সুজন ।
(বলি) আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন ।
নেচে ঘুরে ঘুরে অভিমানে মুখ ফিরায়ে,
বঁধু আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন ॥
রমণীর মন ভুলাইতে, নিতি হয় আসতে যেতে,
কেন এলে নিশি প্রভাতে (ওহে) মদনমোহন বংশীবদন ॥

আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার যে কষ্টকর বেদান্ত-সাধন, তৎপরিবর্তে রসময় প্রভু আমাদের শুষ্ক জীবভাবকে তাঁহার আনন্দ ব্রহ্মময় রসে নিমজ্জন করছেন । ইহারই নাম তাঁর অহেতুকী করুণা !

ঠাকুর যখন দেখলেন যে, ঔষধ ধরেছে, তখন ভগবানকে সর্বময় ভাবিবার জন্য গান ধরলেন—

মা ত্বং হি তারা ।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ॥
তোরে জানি মা ও দীন-দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
(ও মা) তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি সর্বমূলে গো মা ।
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা॥

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ঠাকুরের নিকট সারারাত্রি তন্ময়ভাবে এই গীত গানে প্রভুর কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেন।

যিনি এমন, তাঁর উপর ঐকান্তিক নির্ভর বিনা আর সুখ-শান্তি নাই, তাই ঠাকুর গাহিলেন—

যখন যে রূপে মা গো রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি মা তোমারে॥
ভস্ম-বিভূতিভূষণ, কিংবা মণি-কাঞ্চন,
তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসনোপরে॥

ঠাকুর বলছেন, দেখিসনে বেড়ালছানাকে তার মা ছাইগাদায় রাখলেও ম্যাও, কিনা মা, আর গেরস্তর গদি-বিছানায় রাখলেও ম্যাও, কিনা মা। এরই নাম নির্ভর। তোদের যদি এ না হল তো কি হল?

আবার জন্মতিথির দিন আমাদের নিয়ে খেতে বসে গান—

কিবা মোণ্ডা খাজা খুরুমা গজা মোদক বিপণিশোভনং।

বাকি মনে নাই, আনন্দে বিভোর হয়ে। বেদান্ত-মতে ব্রহ্মদর্শন পর যখন জগৎ মিছে (ভুল) হয়ে যায়, তেমনি প্রকারে দিব্যরূপ দর্শনে, রঙ্গরস শ্রবণে আমাদের অস্তিত্বও তেমনি ভুল হয়েছিল। আবার দৈ পরিবেশন করিতে এলে দুহাত তুলে হাসিমুখে কত আগ্রহে গান—

দে দৈ দে দৈ আমার পাতে, ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে।
বলি ওরা কি তোর বাবা খুড়ে তাই ওদের পাতে ঢালছিস্ হাঁড়ি হাঁড়ি॥

কত রঙ্গরস ও আঁখর দিয়ে কীর্তন যে, সে অভিনয়ে প্রাণধারণের মূল যে ভোজন, তাও ভুল হয়ে গিছল। তারপর বলছেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডজননী তব বিগ্রহং, এমন যে তিনি, তাঁকে কি করে বুঝিব। আমাতে প্রাণ ঢেলে দে, তোদের সর্বার্থ সিদ্ধ হবে। তোরা যে আমার।

আর এক সময় গান—

নিজের দোষ

এ কি বিকার শঙ্করী।
কৃপা-চরণতরি পেলে ধন্বন্তরি॥
অনিত্য আলাপ সদাই অঙ্গের দাহ,
আমার আমার কি ঘটিল পাপ মোহ,
তাতে ধন জন তৃষ্ণা না হয় বিরহ।
কিসে জীবন ধরি॥
মা অনিত্য আলাপ কি পাপ প্রলাপ সতত গো সর্বমঙ্গলে।
মায়ারূপী কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়ন-যুগলে।
হিংসারূপ হল সে উদরে ক্রিমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হল ভ্রমি,
রোগে বাঁচি কিনা বাঁচি, তন্নামে অরুচি দিবস শর্বরী॥

ঠাকুর বলেছেন, রুচি থাকলে কেউ মারতে পারে না, তাই রুচি আনবার জন্যে ধন্বন্তরি আগে গোলমরিচ খেতে দেন। যখন মার নামে অরুচি, তখন বাঁচবে কি করে?

এবার মার দোষ দিতেছেন

ও মা মন গরীবের কি দোষ আছে।
তারে কেন দোষী কর মিছে ॥
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, তারে যেমন নাচাও তেমনি নাচে ॥
শুনেছি দীন-দয়াময়ী লোকে বলে বেদেও আছে।
ও যে আপনাকে আপনি ভোলে, তার কি সুতের বেদন আছে ॥
তুমিই কর্ম্ম ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে।
ও মা, তুমি সুখ তুমিই দুঃখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্মসূত্র সে সুতোর কাটনা কেটেছে।
ঐ যে মায়াসূত্রে বেঁধে জীব ক্ষ্যাপাক্ষেপি খেল করিছে।

চণ্ডীর গান

বল রে শ্রীদুর্গানাম ওরে আমার আমার মন।
নম নম নম চণ্ডী নম নারায়ণী।
দুঃখীদাসে কর মা দয়া তবে গুণ জানি।
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি বা সকাল,
তোমা হতে বিধি বিষ্ণু দ্বাদশ গোপাল,
যশোদা পূজিয়াছিল জবা-বিল্বদলে।
তোমারই কৃপায় মা সে কৃষ্ণ পেলে কোলে ॥
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো মশানে।
নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙা চরণে ॥
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তিমেতে জিহ্বা যেন জয় দুর্গা বলে ডাকে ॥
শঙ্করী হইয়ে মা গো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে থাবা মেরে নেবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণি।
সেই সময় দিও রাঙা চরণ দু'খানি ॥
নখেতে লিখিতে নাম পায় আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে দিই নাম পদ দে গো তায় ॥

মাতোয়ারা হয়ে যেন রূপ বদলে যেত।

বাউলের গান

(১)

ডুব ডুব ডুব রূপ-সায়রে আমার মন।
তলাতল প্যাতাল খুঁজে পাবি রে প্রেম-রত্ন-ধন।

(২)

শ্যামের নাগাল পেলাম না রে সৈ।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥
শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল,
তারে যতন করে বাঁধতাম সখি দিয়ে বকুল ফুল,
আবার বনপোড়া হরিণীর মতো ইতি উতি চেয়ে রই ॥

রামের গান

মেরা রামকো না চিনা হায় দিল, চিনা হ্যায় তুই ক্যারে।
চিনা হ্যায় তো ঝুট রে। শান্ত ওহি যো রাম রথ চাখে।
আউর যো বিশ্বম রথ চাকা হ্যায় তু ক্যারে ॥

কোনো একচক্ষু সভ্য সুফল পাবে বলিলে, তাকে ধিক্কৃত করে গান করেন—

শ্রীরামচন্দ্র কল্পতরুমূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা করি সে ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, ও ফল প্রার্থী নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ॥
আমার কি ফলের অভাব, কেন এলি বিফল ফল যে নিয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল শ্রীরাম কল্প-বৃক্ষ রেখেছি হৃদে রোপিয়ে ॥

গৌরাঙ্গের গান

তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই—
তাই এসেছি হে প্রভু গৌর নিতাই।
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
সেই নন্দের নন্দন শচীর ঘরে ॥
আগে ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি,
এখন নদের খেলা ধুলোয় গড়াগড়ি ॥
(আঁখর—হরি হরিবোল দিয়ে) আগে ব্রজের খেলা ছিল গণ্ডগোল
সব রাখালে মিলে—(আঁখর) এখন নদের খেলা কেবল হরিবোল।
(আঁখর)—জীব উদ্ধারিতে এখন নদের খেলা কেবল হরিবোল ॥
গৌর লুকালে কি লুকানো যায় (ও হে ও গৌরাঙ্গ)
তোমায় চেনা গেছে দুটি নয়ন বাঁকায় ॥
(গৌর হও না কেন,) কালো রূপ লুকায়ে গৌর হও না কেন ?
তোমায় চেনা গেছে দুটি নয়ন বাঁকায় ॥

ঠাকুর একদিন ভাবভরে বলেন—মা বেদবেদান্তের ক, খ, আর খেউড় খিস্তির ক, খ, কি আলাদা, তুমি তো পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী ! তাই একদিন গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মা কালীর সম্মুখে লক্ষ্মী সরস্বতী—যারা পটল ভেজে হল সারা ইত্যাদি এমন খেউড় গান করেন, শুনে গিরিশবাবু বলেন যে, আমি খেউড় গানে বিখ্যাত, তা এ খেউড়েতেও আপনি আমার গুরু। দুর্গাপুঁজ-পদ্ধতিতে আছে, দিবসত্রয় মহামায়ার আরাধনায়

সাধকের মন মধুময় হওয়ায় নবনীর কর্দম-ক্রীড়ায় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ দোষাবহ নয়।

তথাপি আমার মতো অন্তরের কুরুচির পুটুলি পুরিয়া সুরুচি-প্রকাশক যদি কোনো নব্য সভ্য বলেন, ইহা দূষ্য, তাহাতে বলা যাইতে পারে, ইহা লোকোত্তরপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কিছু বলিবার পূর্বে যদি আমরা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করি, তাহলে সকল গোলই মিটিয়া যায়। শাস্ত্র বলেন—ভগবদ্দর্শন ফলে যাঁহার চিত্ত অসন্দিগ্ধ, ভেদভাব বিনষ্ট ও পাপপুণ্য বিশীর্ণ, সেই সুদুর্লভ মহাপুরুষ জাগতীয় বিধিনিষেধের পার।

পরিশিষ্ট (১)

ধর্ম-মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) খাতাতে তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই ; এবং কবচের মতো যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই, এবং তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্যভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধি নির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

সেই হেতু আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্ম-মীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।

In the begining was the word, and the word was with God, and the word was God. ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন-শরীরে আবৃত, সেইরূপ বৃহৎ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত ; শবোপরি শিবা—কল্পনা নহে। যেমন—মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনা দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব In the begining there was the word, and the word was with God and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।

অথ ধর্ম-মীমাংসা

১। দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

২। এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে।

৩। এই নিয়মের অধীনে প্রতি পত্র, শিরা ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টি-স্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা ও এবম্প্রকার বহু মনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমষ্টি-স্বরূপ এই মনুষ্য-জগৎ।

৫। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শুভ এবং অপরগুলিকে অশুভ মনে করি। (পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শুভাশুভ কি ? এবং যথার্থ বোধ কি না ?) প্রস্তাব, মনুষ্যকে হিতাহিত, শুভাশুভ, উত্তমাধম জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সিদ্ধান্ত করিয়া আরব্ধ হইয়াছে।

৬। ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টি-বোধ, পরলোক-বোধ, এবং কর্ম বোধ-জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্যে পরিণত হইয়া মনুষ্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, তাহার নাম ধর্ম।

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তুগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট দ্বারা, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা, সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা দ্বারা, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই জগতের উৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে। কত স্থানে এবং কত অবস্থায় পরলোক স্থাপিত হইয়াছে! অবশ্যম্ভাবী ফল ঈশ্বরানুগ্রহে খণ্ডিতব্য ফল, স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন, ইত্যাদি বহু প্রকারে কর্মের ফল অনুমিত হইয়াছে; এবং এই সকল বিভিন্ন অনুমানের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে।

৮। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।

৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রম মাত্র বোধ করেন। পূর্বে তরবারি দ্বারা, এক্ষণে যুক্ত্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী—এবং পণ্ডিতদিগেরও মত এই যে, মনুষ্যজাতি যে প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে—যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি তাঁর সত্যের সীমা।

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি নমো রামকৃষ্ণায়

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সমষ্টি জীবন, সেই প্রকার সর্বমনুষ্যের সমষ্টিস্বরূপ এই বিরাট মনুষ্যের অর্থাৎ মনুষ্য-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা শান্ত অথবা অনন্ত।

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থাস্বরূপ।

৩। যেমন বৃদ্ধ যদি বলে—আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে যেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোনো বিশেষ ধর্ম, অবস্থাগত মনুষ্যসমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মমতকে ভ্রান্ত বলা উন্মত্ত-প্রলাপ।

৪। কারণম্ এব কার্যমনুপ্রবিশতি—কারণই কার্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নূতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা হইলেও কারণটা তাহার মধ্যে থাকিল।

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, প্রত্যেক পূর্ব ধর্ম-মত পর ধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। অতএব যদি মনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘৃণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহাও সত্য।

৭। ধর্মপরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে, পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।

৮। যেমন আমরা কোনো পোলে (খুঁটিতে) উঠিতে গেলে, নিম্নস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্তু এই সমস্ত স্থানের সমষ্টিই পোল। সেই প্রকার এই সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম; এবং এই সকল ঈশ্বরভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।

৯। অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত হইবে, তাহাও সত্য।

১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কি তা জানি না।

১১। এই পৃথিবী-লোকে যত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনন্ত জগতে যত হইবে, এবং অন্যান্য লোকে যত আছে এবং সম্ভব ; ভূলোকে দ্যুলোকে, এবং অনন্তলোকে যতো ভাব হইয়াছে, এবং হওয়া সম্ভব ; ভূলোক, দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত রূপ আছে, এবং হওয়া সম্ভব ; ভূলোক দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত গুণ আছে এবং হওয়া সম্ভব ; এবং ভাব, রূপ, গুণ, যে প্রকার মনুষ্য জীবের মানসিক বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম চিদাত্মাজীবসমূহ যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, যদি আরও কতো প্রকারের মনুষ্যের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে ; এই সকলের সমষ্টি বিরাট পুরুষের নাম ঈশ্বর।

১২। পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরে তাহা হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি দোষ কি বর্তমান ?

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচনা কর, মনে কর—একটি শক্তি কোনো একটি বস্তুর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,—কেবল একটি, তাহা হইলে গতি অসম্ভব ; ইহা নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে (Direction) কার্য করিলেও হইবে না ; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ বাহ্যতভাবে কার্য করিলে হইবে ; (Contrary & Contradictory)। অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার প্রতিরূপ প্রতিঘাত শক্তির দ্বারা ব্যাহত হয়, ইহাও সত্য। (3rd. law of Newton)।

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান ; এবং ইহাই বিশ্বের জীবন।

১৬। জীবন কি ? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

১৭। যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা। নতুবা বহু ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়।

১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শান্তি, ক্রোধ, প্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের যুগ্ম বর্তমান নহে ?

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ কেবল পর্যালোচনা করিয়াছে। অপরগুলি করে নাই।

২০। পূর্বপক্ষ—এক শ্রেণীর কার্য যে প্রকার দয়া-ধর্ম ইত্যাদি যথার্থ সৎ, অপর শ্রেণী—অর্থাৎ পাপ ইত্যাদিই মায়িক সত্তা অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র।

২১। উত্তর—তাহা হইলে আমাদেরও উল্টাইয়া বলিবার অধিকার আছে, যথা পাপই সত্তা, পুণ্যাদি মায়িক।

২২। সত্তা উভয়েরই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব কারণও এক প্রকারের।

পরিশিষ্ট—(২)

বরাহনগর মিলন-মন্দির

তপস্যার মহিমা অপার। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, জন, গৌরব সকলই তপস্যায়ত্ত। ধর্মরাজ্যে এই তপস্যার উৎকর্ষে মানব শিবত্ব লাভও করিয়া থাকে। এই তপস্যার ধারা তিনটি—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ব্রতোপবাস দ্বারা শরীর-শোধন—কায়িক, সত্যবাক স্বাধ্যায় বা দেবার্চনায় ও মন্ত্রোচ্চারণ—বাচিক এবং প্রীতিপূর্বক সর্বভূতের মঙ্গলচিন্তায় আত্ম-বিস্তৃতিকে মানসিক তপস্যা কহে। মানবই যে কেবল তপশ্চারণ করে, এমত নহে, স্ব স্ব পদবী রক্ষণে দেবগণও তপোনিরত। পালন-তৎপর মাধব দুরূহ কর্ম-সাধন উদ্দেশ্যে গোলোক পরিহার করিয়া তুষারমণ্ডিত হিমালয়-শৃঙ্গে বদরিকাশ্রমে অনাদিকাল তপস্যা করিতেছেন; মহাযোগী মহেশ্বর জীবের সংহরণ (একত্রীকরণ) চিন্তায় শ্মশানতীর্থে ধ্যানমগ্ন। আবার সকল শক্তির উৎস পরমা প্রকৃতি ভগবতী বিশ্বপরিচালনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার বাসনায় কৈলাস-কানন পরিহার করিয়া সমুদ্রকূলে কুমারীরূপে নিত্যকাল তপঃপরায়ণা। তাঁহারই পুণ্য স্মৃতিতে এ ক্ষেত্রের নাম কন্যাকুমারী হইয়াছে। বৈরাগ্যই এই তপস্যার মূল, বিলাস-বৈভবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ইহা তপস্যার প্রতিকূল।

আতুর, বিপন্ন ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং ঠাকুরের ভাব প্রচার দ্বারা যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যশঃসৌরভ আজ বিশ্বব্যাপী এবং দেশবিদেশে যাহার কার্য দর্শনে জনসাধারণ স্তম্ভিত, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের বৈরাগ্যবান যুবক সেবকগণের তপস্যাই ইহার মূল কারণ। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, প্রভুর এই মহাবাক্য অবলম্বনে নরেন্দ্রনাথ যে মহান 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন, কালবশে ইহা বিস্মরণে, সেবাস্থানে দয়ার ভাবই যেন পরিস্ফুট। কারণ, তপস্যা ও বৈরাগ্যের অভাব।

ভগবানের কার্যধারা মানবচিন্তার অতীত। মানবতার উৎকর্ষে দেবত্বের অভ্যুদয়। ইহাই দেখাইবার জন্য নররূপী নারায়ণ ঠাকুরের জীবন তপস্যাময়। যেহেতু, তপস্যা বিনা আত্মচৈতন্য বা পূর্ণতা লাভ অসম্ভব, তাই প্রভু লীলাবসানের প্রাক্কালে অন্য উপদেশ দান না করিয়া নরেন্দ্রনাথকে কহেন—দেখিও, যেন এই ক'টা ছোঁড়া (যুবক সেবকেরা) একত্রে সাধন-ভজন করে। কিন্তু সঙ্গতিহীন নরেন্দ্রনাথ কিরূপে এই আদেশ পালন করিবেন, ভাবিয়া আকুল।

প্রীতির অভাবে পাছে বিশ্বসৃষ্টি বিশৃঙ্খল হয়, যেহেতু একে অন্যের ভার গ্রহণে কদাচিৎ তৎপর, তাই কৌশলী ভগবান জীবের অন্তরে মমতারূপ প্রেরণা দানে সুন্দরভাবে আপনারই কার্য করাইয়া লইতেছেন; রামদাদা যখন প্রভুর চিন্ময় অস্থির সমারোহে—প্রতিষ্ঠা অভিলাষে গৃহী ভক্তগণের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন, তখন এই প্রেরণারই বশে হৃদয়বান সুরেন্দ্রনাথ কহেন যে, যে মহানুভব যুবকগণ প্রভুর সেবায় প্রাণপাত করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা, সুতরাং উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তোমার সাড়ম্বর প্রচেষ্টায় আমার সহানুভূতি নাই। বরং উহাদের সহিত প্রভুর লীলামৃত অনুশীলনে জীবনের কয়টা দিন কাটাইতে পারি, ইহাই বাঞ্ছিত এবং প্রভুর ইচ্ছায় ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিব। এখন পাঠক দেখ, ভগবান কিরূপে তাঁহার কার্য করাইয়া লন।

বুড়ো গোপাল দাদার চাল-চুলো নেই, আধ বাঙালী পোনখোট্টা লাটুই বা কোথায় যায়,

হুটকো গোপাল তো অনেক দিন হতে গৃহহীন, তারকের দেশ থাকলেও কার কাছে যাবে, প্রভুর আদরের সন্তান রাখাল জমিদার-পুত্র হলেও আর ঘরে ফিরবে না বলে বৃন্দাবন গেছে, সাবর্ণ চৌধুরী যোগীন মা ঠাকুরাণীর সঙ্গে তীর্থে গেলেও ফিরে এসে বাড়ি যাবে বলে মনে তো হয় না, বাবুরাম, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, কালী ঘরে ফিরে গেছে বটে, থাকতে কি পারবে? বিশ্বাস তো হয় না, পালান পাখি (ত্যাগী পুরুষ) একবার ছাড়া পেলে, আর কি ফাঁদে পা দেয় (অর্থাৎ সংসারী হয়)? মনে তো লয় না। এরা যদি আবার কাশীপুরের বাগানের মতো একসঙ্গে থাকে, আর আমি গিয়ে মিলতে পারি, তাহলে প্রভুর লীলা-চর্চায় আবার আনন্দের জমাট বাঁধবে। বরাহনগর জায়গাটা হলেই বড়ো ভালো হয়, যাতায়াতে কাশীপুরের বাগানটা তো দেখতে পাব। দেখি প্রভু কি করেন।

ভালো কথা, ভবনাথ তো ঠাকুরগতপ্রাণ, তার বাড়িও বরাহনগরে, সে কি আর এদের ছেড়ে সুখে আছে? কখনই না। হুটকোকে তার কাছে পাঠাই, সে যদি সুবিধা করে একটা বাড়ি ঠিক করতে পারে। পারাও সম্ভব। এইরূপ কল্পনা-জল্পনায় এবং আগ্রহের আতিশয্যে মনে যখন একটি দিব্য দৃশ্যের উদ্ভব হয়, সুরেশবাবু তখন হুটকোকে ভবনাথের নিকট পাঠান। ভবনাথও বিনা আয়াসে তাঁহার আবাসের সন্নিকট মুন্সী বাবুদের ভাঙা বাড়িটি ঠিক করেন।

কাশীপুর উদ্যানের একটু উত্তরে বরাহনগরের বাজার, উহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার দিকে একটি পথ, নাম পরামাণিক ঘাট রোড। কিছুদূর যাইলে ফটকবিশিষ্ট একটি ভগ্ন বাটী। এক সময় উহা প্রবলপ্রতাপ মুন্সী বাবুদের অট্টালিকা ছিল; পূর্ব অংশটিতে উঁহাদের ঠাকুরবাড়ি। পশ্চিম ভাগটি জীর্ণ ও বসবাস বিহনে জঙ্গলপূর্ণ। নীচের তলা অপরিষ্কার ও অন্ধকার বলিয়া শিবারূপিণী শৃগাল ও মনসাদেবীর ভক্তগণের (সর্পের) বিহারস্থান; সুতরাং মানববাসের অযোগ্য বলিয়া পতিত ছিল। দেখিলে মনে স্বতঃই বৈরাগ্যের উদয় হয। দ্বিতলে দুটি সুপ্রশস্ত এবং তিনটি ছোট ঘর ছিল। বড় ঘর দুটির মধ্যভাগে যেটি ছোট, সেইটি ঠাকুরঘর, আর উত্তরদিকের ছোট ঘর রন্ধন জন্য ব্যবহৃত হয়। বড় ঘর দুটিতে যুবকদের আবাস। ভবনাথ ও হুটকো ওখানকার বন্ধুদিগের সাহায্যে কোনোরূপে উহাকে বিরক্ত ব্যক্তিদিগের বাসের মতো করেন। বাড়িটি গুণের মধ্যে নির্জন; যেহেতু সাপ-শিয়ালের ভয়ে সহসা কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, তাই অল্প ভাড়ায় উহা পাওয়া যায়। ইহাই 'মিলন-মন্দির'।

যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহে যাইয়া বিদ্যার্জনে রত হন, কেহ বা শ্রীমাতৃদেবীর তীর্থযাত্রায় তাঁহার সেবার নিমিত্ত অনুগমন করেন। পিঞ্জর-মুক্ত পক্ষী কি পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশে সুখবোধ করে? সুতরাং যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, এবং সেবাব্রতস্থলে স্বাধ্যায়ব্রত গ্রহণ করিলেও প্রত্যহই সান্ধ্য ভ্রমণচ্ছলে নরেন্দ্র-ভবন বা বলরাম-মন্দিরে আসিয়া প্রভুর চরিতামৃত আলোচনে আনন্দ লাভ করিতেন।

বাবুরাম মহারাজের মাতা ঠাকুরকে ইষ্টদেবতা জানিয়া তাঁহার সেবকগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুতরাং অনেক দিন তাঁদের না দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে পুত্রকে বলিয়া পাঠান যে, আগামী বড়দিনের ছুটিতে তুমি উঁহাদিগকে লইয়া আঁটপুর ভবনে আসবে। নিমন্ত্রণ পাইয়া সকলে খুশি হইলেন, এবং নরেন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া শরৎ, শশী, নিরঞ্জন ও

সারদা বাবুরাম সঙ্গে তাঁহার মাতার নিকট গমন করিলেন।

প্রভুর ইচ্ছায় সকল দিকেই সুযোগ হইল, কেবল বৈরাগ্য জাগিলেই মণিকাঞ্চনযোগ হয়। বড়দিনের সময় আঁটপুরে। খেলার ছলনে ধুনি জ্বালাইয়া, ঘটনাচক্রে মেরি-নন্দনের আবির্ভাব রাত্রে, প্রভুর প্রেরণায় তাঁহার-আলোচনে এতই মুগ্ধ হন যে চাঁদমুখে ছাই মাখিয়া প্রতিজ্ঞা করেন—আর তো ঘরে যাব না, বৈরাগ্যব্রতেই জীবন শেষ করিব। সুতরাং সকলে আঁটপুর হইতে 'মিলন-মন্দিরে' আসেন এবং স্থানটি নির্জন দেখিয়া মনের আনন্দে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

প্রতিদান প্রত্যাশায় যাঁহারা পালন করিয়াছেন, সে আশায় নিরাশ হইয়া মনে বড় ব্যথা পান এবং পাওয়াও সম্ভব। তাঁহারা ভাবেন—যদি কোনোমতে পুত্রদের ঘরে ফিরাইতে পারি। তাই অনেক সন্ধানের পর বরাহনগর 'মিলন-মন্দিরে' উপস্থিত হন। বিলাপ, মিষ্ট কথা, পরে ক্ষোভের তাড়নায়ও ফল হইল না দেখিয়া তাঁহারা ভগ্নহৃদয়ে গৃহগমন করেন।

অন্তরঙ্গ সেবকগণের অন্তরে প্রভু যে অনুরাগ-অগ্নি উদ্দীপন করিয়াছিলেন, কালপ্রতীক্ষায় উহা এত দিন যেন ভস্মাচ্ছাদিত ছিল। এখন বৈরাগ্য-বাতাসে ভস্ম অপনীত হইলে, পুনরায় উহা উদ্ভাসিত হইল। এত দিনের পর সুযোগ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ মনের আনন্দে একে একে রাখালরাজ, বাবুরাম, যোগীন, লাটু, কালী, সারদা, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে লইয়া প্রভুর লীলানুশীলনে এবং তাঁহার দিব্য আদর্শে জীবন-গঠনে যত্নশীল হন। তারকদাদা, হুটকো ও গোপালদাদা ইতিপূর্বেই মিলিত হইয়াছেন এবং ভবনাথ আদি বরাহনগরের ভক্তগণ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। যাঁহার উদ্যোগে এই 'মিলন-মন্দির' সেই সুরেশবাবু ব্যয়ভার বহন করিতেন, এবং বিষয়ী হইয়াও সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে প্রভুর গুণগানে আনন্দ করিতেন। বলরামবাবুও প্রত্যহ প্রাতে ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে আসিতেন এবং কি করিলে ইঁহারা স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতেন। ভক্ত অনুরোধে প্রভু-পুত্র রাখালরাজ মধ্যে মধ্যে বলরাম-মন্দিরে দু-চার দিন কাটাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথও কার্যবশতঃ কোনো কোনো দিন স্বল্পকাল জন্য কলিকাতায় যাইতেন।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধে ঐশীভাবের স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ সেবা দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার বিশেষ সুযোগ হয়। এই হেতু সেবক-চূড়ামণি শশীভূষণ ধ্যান করা অপেক্ষা সেবাব্রতে অধিক আনন্দ পাইতেন। তাই তাঁহার আগ্রহে, বলরাম-মন্দিরে রক্ষিত প্রভুর চিন্ময় অস্থি এবং তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আনিয়া স্থাপন করায় 'মিলন-মন্দির' পীঠরূপে পরিণত হইল। যে স্থানে বৈরাগ্য সহায়ে ত্রিবিধ তপস্যা, ভগবৎ উপাসনা, সেবার্চনা এবং শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা চরিত্র গঠন হয় তাহারই নাম পীঠ। ঠিক যেন প্রাচীন যুগের ঋষির আশ্রম। শশীভূষণও মনের আনন্দে, প্রভুর আরাধনা এবং অভিন্নবোধে তাঁহার সন্তানগণের সেবায় দিন যাপন বা স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সকলের পরিচর্যা করিতে থাকেন। ফলতঃ প্রাত হইতে রাত্র পর্যন্ত ভগবান ও ভক্ত-সেবায় তাঁহার বিরাম ছিল না। তীর্থ-প্রসঙ্গ হইলে বলিতেন—পরম তীর্থ প্রভুকে ছাড়িয়া কেন দুঃখ-ভ্রমণে যাব? এইরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনায় এবং অন্য ভ্রাতৃগণের তপস্যায়, বরাহ-নগর-মন্দির দিন দিন উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণকে আনন্দ দিতে লাগিল।

তখন তো আর এখনকার মতো অবস্থা ছিল না যে, ইচ্ছা করিলেই নানা পদার্থ আসিবে, যুবকগণ তখন নগণ্য; কিন্তু বৈরাগ্য-বলে ধনী বলিয়া যাচ্ঞাবিমুখ; তবে

ভক্তগণ কিছু আনিলে উপেক্ষা করিতেন না। ইঁহাদের তপস্যা-প্রভাবে, বিষয়-বৈভব-সমাগমে, অধুনা সুরাপানতুল্য অভিমান এবং রৌরব তুল্য গৌরবের অভ্যুদয় হইয়াছে।

যুবকগণের হৃদয়ই প্রভুর প্রকৃত মন্দির, তথাপি জীর্ণ কোঠায় প্রভুর দিব্য দেহাবশেষ স্থাপিত হইলে, ভক্তগণ পূজোপকরণ আনিয়া দেন। গাছের ফুল ও গঙ্গার জল দিয়ে অর্চন করিলেও শশীভূষণের আঁখিবারি ও ভক্তিপুষ্পে প্রভুর পরাপূজা হইত। পুষ্প-চয়ন হইতে নানা কার্যবশতঃ কোনো কোনো দিন বাল্যভোগের বিলম্ব আশঙ্কায় ত্বরিতে পূজার সময় কখনো ফুলে ফুলে মিশিয়া যাইলে মন দুঃখে 'এই নাও ঘোড়ার ডিম' বলিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল শ্রীপদে অর্পণ করিতেন, সে ভাবটি দেখিতে বড়ই মধুর !! ফল মিষ্টান্ন অভাবে মুষ্টিপ্রমাণ চণক, দু'চার কুচি আর্দ্রক এবং খানকতক বাতাসা নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত হইত। আড়ম্বরের মধ্যে ছোলার আগাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইত। সেটা আত্যন্তিক ভালোবাসায়,—পাছে ঠাকুরের পেটের পীড়া হয়। শশীভূষণ দেখিতেন যুগপৎ চিত্র এবং অস্থিতে বিদ্যমান প্রভু তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন। সঘৃত সোপকরণ অন্নের পরিবর্তে মাত্র ডাল ভাত ভোগ দেওয়া হইত; তবে বাবুরাম মহারাজ যেদিন ভাঙা বাড়ির তেলাকুচা পাতা বা পুকুরের কলমী শাক সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সেদিন রাজভোগ হইত। কালেভদ্রে বা রবিবারে সুরেশবাবু বা অন্য ভক্তগণ চতুর্বিধ ভোগের ব্যবস্থা করিলে সেদিন ঠাকুর মুখ বদলাইতেন।

পূজার বাসন ভিন্ন তৈজসের মধ্যে ছিল একখানা পরাত, (পিতলের কানা তোলা বড় থালা) আর দুটা পিতলের ঘটি,- রন্ধন ও জলপান জন্য। ক্ষুধা এবং জড়তা নাশ জন্য বা পূর্বাভ্যাস বশতঃ নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কেহ কেহ চা পান করিতেন। তাহা যোগাইত দাসু, বঙ্কিম ও কালীকৃষ্ণ। সরঞ্জাম একটা পুরণো কেটলি ও দুখান লোহার ডিশ। পাছে গৃহস্থকে বিব্রত করা হয়, এবং অল্পে অনেক ফল হয়, তাই কেটলিতে চা ফুটাইয়া লওয়া হইত। দুধ চিনির পরিবর্তে মিষ্ট কথাই অনুকল্প হইত। বিলাসের মধ্যে ছিল ধূম্রপান,—একটা পুরণো বিবর্ণ গড়গড়াতে দা-কাটা তামাক খাওয়া। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন—প্রসাদে সকলেরই সমান অধিকার ; তাই প্রসাদ পাবার সময়, পরাতে ভাত-ডাল ঢালিয়া বৃত্তাকারে উপবিষ্ট প্রভুর ত্যাগী ও গৃহী সকল সন্তানই একসঙ্গে ভোজন করিতেন। ঠাকুরকে শয়ান দিয়া বাতাস করিতে ও রন্ধনস্থান মার্জন করিতে শশী ও বাবুরামের বিলম্ব হইত বলিয়া উঁহাদের জন্য ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিয়া প্রসাদ রাখা হইত। ভোজ্য যাহাই হউক না কেন, ভোজনে কতই না আনন্দ ও কত বিলম্ব ! কারণ, যাঁহার কৃপায় এই অযাচিত অন্ন পাইতেছেন, তাঁহার মহিমা কীর্তনে ভোজনেচ্ছা যেন তিরোহিত। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত প্রীতি বা আনন্দ-ভোজন। এখন আমরা সাড়ম্বরে নানাবিধ মিষ্টান্ন নিবেদন করি, জানি না প্রভু কোন্ ভোজ্যে তৃপ্ত।

ভক্তবেষ্টিত ভগবানের আরাত্রিককালে, শশীভূষণ জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব ও হর হর ব্যোম রবে উন্মত্ত ভৈরবের ন্যায় তাণ্ডব-নৃত্য করিতেন ; দৃশ্যটি ভুলিবার নয়, তবে ভয় হইত, পাছে ঘরের মেঝে বা ভাঙিয়া পড়ে।

ভজন ভোজনের বিষয় তো বলা হইল, এবার শয়নের কথা ঃ—বড় বা হলঘরটিতে দুটি সপ্ (বড় মাদুর) পাতা, তাহাতেই উপবেশন ও শয়ন। বালিশ বলিয়া কোনো পদার্থই ছিল না, উপাধান যোগদণ্ড, শাস্ত্রপুস্তক, এবং দুচারখান (নরম) ইট। ভজন সাধন যাঁদের ব্যসন, তাঁদের সুখশয্যার প্রয়োজন কোথায় ? কেবল শ্রান্তিনিবারণে

অল্পকাল দেহ প্রসারণ। দশ-বারোজন একত্রে শয়ন করায়, তারক দাদা রহস্য করিয়া বলিতেন—ঠিক যেন অন্ডেলি তপ্‌সিমাছ সাজানো হয়েছে। তিতিক্ষা অসাধারণ, রৌদ্র বৃষ্টি বা শীতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মশক-কীর্তন শ্রবণে বা আপ্যায়নে আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। কিন্তু দেখিয়াছি, শয়নে বা ধ্যানে শত শত মশক ইহাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিত না। বহুদিন পরে রাত্রিবাসকালে মশকদংশনে উৎপীড়িত হইয়া সুরেশবাবু দশ-বারোজনের উপযোগী একটি প্রকাণ্ড মশারি আনিয়া দেন।

জামাইবাবুর মতো ইঁহাদের সাজগোজ ছিল না, কৌপীনই সম্বল। শীতকালে ভক্ত-প্রদত্ত কর্কশ কম্বল ব্যবহৃত হইত, তাহাও পর্যাপ্ত নয়। বলা বাহুল্য যে, ধ্যানযোগ দ্বারা ইঁহারা শীত নিবারণ করিতেন।

যে দু-পাঁচখান বহির্বাস ছিল, কেবল স্নান বা আহার্য সংগ্রহকালে আবরণ হইত। খান দুই ধুতি উড়ানি ও জোড়া দুই চটি জুতা ছিল, তাহা কেবল কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় যাইবার সময় ব্যবহৃত হইত। যেমন একত্রে ভজন, ভোজন ও শয়ন, শৌচ-ব্যবস্থাও তদ্রূপ। এককালে বড়লোকের অন্তঃপুর বলিয়া একটি শৌচাগারে তিনজনের স্থান ছিল, কিন্তু পাঁচ-ছয়জন যাইলে, দু-তিনজন উমেদার থাকিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন, এই হেতু রহস্যপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ উহার নাম রাখেন Privy Council—শৌচসভা। পাঠক বলিতে পারেন নির্লজ্জ। সত্য; পরের কাছেই লজ্জা বোধ হয়। ভিন্ন দেহ হইলেও যখন এক-প্রাণ ও অভিন্ন-হৃদয়, তখন লজ্জার স্থান কোথায়? তাই লজ্জা যেন লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিয়াছে। আপনারাই পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন, শৌচাগার মার্জন, গৃহ পরিষ্কার ও রন্ধনকার্য সম্পন্ন করিতেন; হৃদয়বান শরচ্চন্দ্র বলিষ্ঠ, তাই ভ্রাতৃগণকে সাধন-সুযোগ দিবার অভিপ্রায়ে একাকীই অনেক কর্ম করিতেন। এমন প্রীতির ভাব কোথাও তো দেখি নাই। 'প্রীতির্বৈ পরমসাধনম্' যে শাস্ত্রবাক্য, ইঁহারা যেন তাহার মূর্ত প্রতীক। একের আনন্দে সকলেরই আনন্দ, একের অবসাদে সকলেরই অবসাদ !! গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

আমরা যেমন মাত্রা রাখিয়া ধর্ম ও বিষয়কর্ম করিয়া থাকি, ইঁহাদের স্বভাব সেরূপ ছিল না। কথায় বলে—নদী এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে; ভগবান বুঝি ইঁহাদের বিষয়কুল ভাঙিয়া ধর্মকুল গড়িবেন, তাই ইঁহারা এতই উন্মত্ত যে, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্বদাই ধর্মচর্চা। আবার কোনো কোনো দিন কীর্তনানন্দে এতই বিভোর যে, উহাতে রাত্রি পোহাইয়া যাইত। এই হেতু যেখানকার অন্ন সেইখানে পড়িয়া থাকিত। প্রথম প্রথম পল্লীবাসীরা বলিত—'সারাদিন খেটে খুটে রাত্রে কোথায় একটু নিদ্রা যাইব, তা এ লক্ষ্মীছাড়াদের চিৎকারে ঘুম তো ছোট কথা, বনের বাঘও পালিয়ে যায়।' শরচ্চন্দ্রের মধুর কণ্ঠ ছিল, তিনি গান করিলে প্রতিবেশীরা বলিত—এ ন্যাংটাগুলো রাত্রিকালে স্ত্রীলোক আনিয়া আমোদ করে, নইলে পুরুষের কি এত মিষ্ট স্বর সম্ভব? আবার ব্রহ্মচর্য মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ শ্লেষ করিত—ইহারা ভিক্ষা করিয়া পাঁঠা খায়, তাই এত হৃষ্টপুষ্ট!

চরিত্রবলই প্রকৃত বল; অর্থ বা দেহবল দুদিনের। পাড়ার দু-চারজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কৌতূহলবশতঃ বিদ্রূপ করিতে আসিয়া সঙ্গগুণে—ভজনশীল হইল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য বোধ করে। তজ্জন্য ইঁহাদের সেবা করিতে গৌরব বোধ করিত। সুতরাং স্বল্পকালমধ্যেই বরাহনগরবাসীরা ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধাচক্ষে দেখিতে থাকে।

ধ্যানযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ ; ইহা দ্বারা বৃত্তি সকল নিরোধ হইলে অন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানবলে ঈশামসীর চিত্ত খড়ুলি নারিকেলের মতো হইয়াছিল অর্থাৎ দেহাদিভাবশূন্য হইয়াছিল বলিয়াই দেহ ক্রুশবিদ্ধ হইলেও অন্তর বিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বলিতেন—পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান, ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার স্থান। এই জন্য ধ্যানের প্রতি ইঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রভুর কৃপায় নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প সমাধি লাভ অবধি, বাহিরে কার্যাদি করিলেও তাঁহার চিত্ত এমন অন্তর্মুখী হইয়াছিল যে, আঁখি দুটি সদাই অর্ধ-নিমীলিত থাকিত। বালস্বভাব রাখালরাজ প্রমুখ ভ্রাতারা ধ্যানে বসিলে সময়ের মাত্রা থাকিত না। তারকদাদা শয়ন করিয়া ধ্যান করিতেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, দাদা ছাড়াচ্ছেন অর্থাৎ দেহভাব ছাড়তে চেষ্টা করছেন। কালী ভাই রুদ্ধ দ্বারে ধ্যান ও বেদান্ত-চর্চা করিতেন, এজন্য তাঁহার নাম হয় কালীতপস্বী। প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিতেন বলিয়া সারদার নাম বাবাজী। গোপালদাদা, নিরঞ্জন, বাবুরাম ঠাকুরঘরে এবং তীব্র বৈরাগ্যবান শরৎ মুক্তাকাশতলে ধ্যান করিতেন, সেইজন্য বাহিরের লোক অনেক সময় মিলিবার সুযোগ পাইত না। শশীভূষণ ধ্যানে বসিলেই সমাধি—মুখ ও বুক রক্তবর্ণ।

ভোগী আমরা শরীরপোষণে ব্যস্ত, কিন্তু ত্যাগী ইঁহারা, দেহধারণমূল ভোজনকেও ভজনের অন্তরায় জানিয়া উহাতে অনাস্থা ; আশ্রমে আহার্য অভাব ঘটিলে আনন্দের সীমা থাকিত না, বলিতেন—আজ নিশ্চিন্ত মনে ভগবচ্চিন্তা করা যাইবে। একদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বলরামবাবু (যিনি প্রত্যহ প্রাতে আসিতেন) মুগ্ধ হন এবং কলিকাতায় যাইয়া আহার্য সামগ্রী পাঠাইলে যথাকালে ইঁহাদের ক্ষুৎব্যাধির চিকিৎসা হয়। আকাশ-বৃত্তি বলিয়া ইঁহারা কখনো কাহাকে দৈহিক অভাবের বিষয় জানাইতেন না ; বলিতেন—যখন প্রভুর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি, তখন তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতেই মঙ্গল।

পর্বদিনে উপবাস, অবতারগণের জন্মতিথি, এবং দেবদেবীর পূজা ইঁহারা তপস্যার অঙ্গ বলিয়া জানিতেন, যেহেতু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না, এবং চিত্ত শুদ্ধ না হইলে শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানমার্গে অধিকার হয় না। প্রভুর দিব্যাস্থিপাত্রে, চিত্রপট এবং শ্রীপাদুকায় সকল পূজাই সম্পন্ন হইত ; প্রভুর কৃপায় পূজাদ্রব্যও জুটিয়া যাইত। এইরূপে ইঁহাদের বারোমাসে তেরো পার্বণ হইত।

খোল বাজাইয়া কীর্তনে নৃত্য করা আমরা অসভ্যতা বলিয়া জানি ; কিন্তু এ ন্যাংটাদের সে ভাব ছিল না। ঠাকুরের পুত্র বলিয়া, রাখালরাজের নৃত্যভঙ্গী অনেকটা ঠাকুরের অনুরূপ ছিল। কিন্তু শশী ও নিরঞ্জন এমন উদ্দাম নৃত্য করিতেন, ভয় হইত—পাছে ঘরের মেঝে বা ভাঙিয়া যায়। তত্ত্ব না বুঝিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে কুরুচি বলিয়া অবজ্ঞা করি ; কিন্তু গোপীগণের ত্যাগ ও ধ্যানের মহিমা অনুধ্যান করিয়া গোপী-গীতা-গানে ইঁহারা বিভোর হইতেন।

যোগসাধনে রত হইলেও দাস্যভাব পালনে ইঁহারা সিদ্ধ ছিলেন। আপনাকে অতি হীন ভাবিয়া নিরাশ্রয় আর্তগণকে এবং ঠাকুরের ভক্তগণকে দাসের মতো সেবা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ এই শ্লোকটি রচনা করেনঃ—অব্রাহ্মস্তম্বপর্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ পরিদৃশ্যতে। নারায়ণস্য রূপং তৎ একোঽহং দাসসংজ্ঞকঃ॥ কামিনীকাঞ্চনমোহটি মানবের স্বভাবজাত, কিরূপে ইহা হইতে নিস্তার পাইবেন, সে বিষয়ে সতত যত্নশীল। নারী জ্ঞেয়া মহামায়া মাতৃস্থানীয়া সর্বতঃ। কাঞ্চনং মৃত্তিকাতুল্যং জ্ঞেয়ঞ্চ সিদ্ধিলুব্ধকৈঃ॥

নরেন্দ্রনাথ-কৃত এই শ্লোকটি সকলে বর্ণে বর্ণে পালন করিতে প্রয়াস পাইতেন ; বলা বাহুল্য, কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।

বরাহনগর আশ্রমে থাকিলেও, পরম তীর্থ বলরামমন্দির এবং গিরিশবাবুর ভবন—ঠাকুর যথায় বহুবার পদার্পণ করিতেন, তাহা উপেক্ষা করেন নাই, বিশেষতঃ বলরামবাবুর স্নেহ এবং গিরিশবাবুর ভালোবাসা কখনো ভুলিবার নহে। তাই কলিকাতায় আসিলে নরেন্দ্রনাথ বাগবাজারে আসিতেন এবং তীর্থ-সেবন এবং ইঁহাদের দর্শনে আনন্দবোধ করিতেন। এই সঙ্গে বাগবাজার পল্লীতে ঠাকুরের যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও সহিত মিলন হইত। তাঁহার আকর্ষণে বালব্রহ্মচারী গম্ভীর হরিভাই এবং প্রগল্‌ভ গঙ্গাধর ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। তবে অতিশয় আচারী বলিয়া গঙ্গাধর গৃহে আসিয়া হবিষ্য করিতেন। তুলসীদের বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা হইত বলিয়া সঙ্গীতপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ এখানেও প্রবেশ করিতেন। তাঁহার মনোমুগ্ধকর গীত ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তুলসীও তাঁহার অনুগমন করেন। কিন্তু কঠিন পীড়ামুক্ত হইবার পর স্বাস্থ্যলাভেচ্ছায় কাশীধামে গমন করেন, তথায় বিশেষভাবে শাস্ত্রচর্চা করিয়া কিছুদিন পরে আশ্রমে প্রত্যাগত হন।

আপন অন্তরঙ্গ বোধে যদিচ প্রভু ইঁহাদের কয়েকজনকে ধর্মরাজ্যে অভিষেক করেন, এবং ত্যাগ ও তপস্যা-প্রভাবে ইঁহারা গুপ্তাবধূত অর্থাৎ গুপ্ত-সন্ন্যাসী, তথাপি লিঙ্গ অর্থাৎ ভেকবিহীন সন্ন্যাস বা তপস্যা সাধারণপক্ষে শুভপ্রদ হয় না এবং বাঙালী সন্ন্যাসী এদেশে বড়ো একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই আচার্যপাদ নরেন্দ্রনাথ ইঁহাদিগকে বিধিবৎ সন্ন্যাসমার্গে দীক্ষিত করিয়া বাঙলায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইঁহাদের নাম হইল—নরেন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ, রাখালরাজ—ব্রহ্মানন্দ, যোগীন—যোগানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, শশীভূষণ—রামকৃষ্ণানন্দ, শরৎ—সারদানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, তারকদাদা—শিবানন্দ, সারদা—ত্রিগুণাতীতানন্দ, গোপালদা—অদ্বৈতানন্দ, লাটু—অদ্ভুতানন্দ, হরিপ্রসন্ন—বিজ্ঞানানন্দ, হরিভাই—তুরীয়ানন্দ, গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ, খোকা—সুবোধানন্দ, কালী—অভেদানন্দ, তুলসী—নির্মলানন্দ। গেরুয়া-লালকাপড় পরিধানে বাহিরে লাল, এবং বৈরাগ্যযোগে অন্তরে লাল ; সুতরাং লালে লাল লইয়া বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করতঃ ভারত ও ভারতের বাহিরেও বহুলোকের কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শে এখন অনেক সন্ন্যাসী ; তবে সে একদিন, আর এ একদিন।

চিত্তের উপর পরিচ্ছদের একটা প্রভাব আছে। ঠাকুর বলিতেন, হ্যাট-কোট পরলে মনে সাহেবী ভাব আসে, আবার স্নানের পর পাটের কাপড় পরলে একটা উপাসনার ভাবও আসে। কৌপীনবাস, ভস্মভূষণ, জটাজুট এবং কাষায়বাস ও রুদ্রাক্ষমালা সন্ন্যাসীর পক্ষে যেমন বৈরাগ্য ও আত্মচিন্তার উদ্দীপক, তেমনই শুভ্রবাস, তুলসীমালা ও তিলকধারণ বৈষ্ণব-পক্ষে অনুরাগের অনুকূল। 'যত মত তত পথ' প্রভুর মহাবাক্য অনুধ্যানে নরেন্দ্রনাথ ভাবেন যে, বৈষ্ণব ভেক ধারণে শ্রীনাম কীর্তন করিলে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাই সকলে অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত করিয়া করতাল সহ 'আমার গোরা নাচে' বলিয়া ভজন করিতে থাকেন. তখন কীর্তনে নয়নাশ্রু দেখিয়া মনে হয় যে, উপাসনার উদ্দেশ্যে বহুরূপী ইঁহারা যখন যে ভেক ধারণ করেন, তাহাই শোভনীয়।

প্রতিনিয়ত একস্থানে থাকিয়া উদরান্নের জন্য গৃহস্থকে উদ্ব্যস্ত করা সাধুর আচরণ-বিরুদ্ধ। বরং নামকীর্তন সঙ্গে মাধুকরী বৃত্তিতে যথেচ্ছ গমনে ভগবানে আত্মনির্ভর বৃদ্ধি পাইবে ; ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া একদিন স্ব স্ব আবশ্যকীয় দ্রব্য যথা—পুস্তক,

যোগদণ্ড, কমণ্ডলু ও কম্বল লইয়া 'কে রে হরিবোল বলিয়ে যায়, যা রে মাধাই জেনে আয়।' নাম গাহিতে গাহিতে যখন প্রস্থানোদ্যত, দেখিয়া মনে হইল, যেন বৈরাগ্য মূর্তিমান হইয়া শান্তিরাজ্যে যাত্রা করিতেছে। দৃশ্যটি বড়োই মুগ্ধকর। যজ্ঞসূত্রধারী সদ্য ব্রহ্মচারী গুরুগৃহবাসে গমনোদ্যত হইলে জননী যেমন ক্রোড়ে লইয়া তাহার যাত্রা ভঙ্গ করেন, তেমনই ইঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে সেদিন বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। প্রাণপাত সেবা দ্বারা প্রভুর স্নেহভাজন হইলেও দেখা যায়, নির্বিকল্প অবস্থা লাভে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানসিদ্ধ। পিতার গুণ পুত্রে বর্তায় বলিয়া গুরুপুত্র গুণধর রাখালরাজ সিদ্ধের সিদ্ধ। শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরাম প্রেমসিদ্ধ। শশী নিষ্ঠা-ভক্তির এবং শরৎ বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। যোগীন ও কালী তপঃসিদ্ধ, সারদা জপসিদ্ধ, নিরঞ্জন শিষ্টাচার এবং জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে লাটু সরলতার আদর্শ। মমতানাশে অদ্বিতীয় বলিয়া তারকদাদা মহাপুরুষবাচ্য। গঙ্গাধর বাল্যাবধি আচারী ও কঠোর। হরিপ্রসন্ন চিরদিনই বালস্বভাব। তিনপ্রস্থ বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ ও গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র কণ্ঠস্থ থাকায় হরিভাই শাস্ত্রসিদ্ধ। প্রাচীন হলেও গোপালদাদার স্বভাবটি বালকের মতো হইয়াছিল। তাই নরেন্দ্রনাথ রহস্য করিয়া বলিতেন—দাদা শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছে।

পুরাকালে ঋষির আশ্রমই তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ যুগে বিহার এবং শংকরের অভ্যুদয়ে ইহা মঠরূপে পরিণত হয়। তৎপরে অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী, নবদ্বীপে গদাধর, বুনো রামনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক অধ্যাপক ত্যাগ ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনে প্রাচীন ধারাটি বজায় রাখিয়াছিলেন। ঐশ্বর্যবাদ প্রভাবে পূর্বকালের টোল এখন অনেকটা বেদের টোল এবং তপস্যা ও চরিত্র গঠন অভাবে অনেক মঠ কর্পূরশূন্য পাত্র হইয়া যেন চিনির মঠ হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন—অট্টালিকায় মঠ হয় না, বৈভবেও নয়; বিরক্ত তপোনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-জীবন যথায় প্রকাশ পায়, তাহাই প্রকৃত মঠ।

উৎসব

প্রীতিই পরম সাধন—ঋষিবাক্য। এই প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই উৎসব। ইহা প্রাণস্পন্দন ও চিত্তপ্রসারক, সুতরাং অশেষ কল্যাণকর। যে ভাগ্যবান-অন্তরে ভগবানের প্রকাশ, তাঁহার চিরদিনই উৎসব। মানবের তো কথাই নাই, উৎসবানন্দে দেবতারাও মর্ত্যের শুভকামনা করিয়াছেন। শ্রীচণ্ডীতে তাহার বর্ণনা আছে।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে (পাঞ্জাবে) অবস্থানহেতু বিদেশীয়গণ (অনুমান গ্রীকরাই) আর্যদিগের হিন্দু নাম রাখেন। অধুনা নির্জীবপ্রায় হইলেও পূর্ব পূর্ব যুগে এই হিন্দুরাই উৎসবের প্রেরণায়, আনন্দবিতরণ মানসে জগতের নানা স্থানে আর্যধর্ম প্রচারে অসংখ্য লোকের কল্যাণ করিয়াছেন। ভাগ্যদোষে দারিদ্র্যপীড়িত, সুতরাং আত্মসবস্ব হইলেও, আজও এদেশীয়গণ উৎসব আনন্দে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য স্বার্থপরতা ভুলিয়া পরস্পর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

অগণিত হইলেও হিন্দুদিগের ভবানী, শংকর ও নারায়ণের দশদিনব্যাপী রথোৎসব, নবরাত্র, ঝুলন, রাস, রামলীলা, শিবচতুর্দশী, গ্রহণ ও কুম্ভস্নান, শিখভ্রাতাদের গ্রন্থ সাহেবোৎসব, বাঙলাদেশে ষড়দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব, বৈষ্ণবগণের শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব (ধুলট), বৈশাখী-পূর্ণিমায় বুদ্ধোৎসব—বিশিষ্ট। ঈশামসীয়দের মেরী-

নন্দনের জন্ম ও ব্যুত্থান উৎসব, এবং ইসলামীয় ভ্রাতাগণের আত্মসংযম ও নিবেদনসূচক রমজান পর্ব প্রধান ; এই সমস্ত উৎসবে প্রীতি ও পদার্থদানে যে কত লোকের মঙ্গলসাধন হয়, তাহা বর্ণনাতীত। মায়াবাদী-শংকরসংপ্রদায়ের তেমন কোনো উৎসব না থাকিলেও ইদানীং আষাঢ়ীয় গুরুপূর্ণিমায় ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পর্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বেদান্তবাদ মতে জগৎ যখন 'তিনই কালমে হ্যায়ই নাই', তখন পরম পুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র মতে নিজ অংশ-সম্ভূত মানব-কল্যাণকল্পে ভগবানের ভাগবতী তনুধারণ সম্ভব। ঠাকুর বলেন—একই জল, একই সময়ে যেমন তরল ও ঘন হয়, সচ্চিদানন্দও সেইরূপ ভক্তিহিমে (আত্মরতিতে) জমাট বাঁধিয়া আপনাকে প্রকট করেন। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সচ্চিদানন্দের ঘন বিগ্রহ, শ্রদ্ধাবান ইহাই অবধারণ কর।

যিনি অসীম হইয়াও সসীম, এবং আমাদের জন্য মর্ত্যের অশেষবিধ ক্লেশও বরণ করিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এবং তাঁহার রাতুল চরণে ভক্তি-প্রীতির অর্ঘ্যদান-রূপ উৎসব ভক্তগণ পক্ষে সুবর্ণযোগ। যেহেতু ইহাতে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, এবং মহিমা কীর্তন ও সত্তাগ্রহণে (প্রসাদ ধারণে) অন্তরে ভগবদ্‌ভাবের বিকাশ হয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বা বেলুড় রামকৃষ্ণমঠে মহোৎসবকালে যাঁহারা অগণিতশীর্ষ, হস্তপদবিশিষ্ট বিরাট রূপের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য, নচেৎ লোকের চাপে গলদঘর্ম ও পরিশ্রান্ত।

ঠাকুরের লীলাকালে দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে শতাধিক ভক্তসঙ্গে রামদাদা কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎসব সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পুণ্যদিনে দিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর ভক্তচিত্ত এমনই অধিকার করেন, যাহাতে বোধ হইয়াছিল যে, প্রভু যেন প্রত্যেক ভক্ত-অন্তরে বা বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। ভাগ্যক্রমে যদি এ দৃশ্যটি উপভোগ না করিতাম, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা রূপকথা হইত।

প্রদীপ-আলোকে সূর্যদর্শন যেমন বাতুলতা, ঠাকুরের প্রচার-প্রচেষ্টা তেমনই আমাদের ধৃষ্টতা। আমাদের বুঝা উচিত যে, ঠাকুর আপনাকে আপনিই প্রচার করেন, তা না হলে কাহার আকর্ষণে অগণিত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, ভদ্র, নরনারী উৎসব দরশনে সমাগত হয়, এবং আভিজাত্য ভুলিয়া দীন ও ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণে আনন্দবোধ করে ? অনুরুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের বিষয় কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, বহু লোক প্রভুর গুণকীর্তন করিতে করিতে উপস্থিত হইলে স্বামীজী কহেন—আজ রামকৃষ্ণ-সাগরে আমি তলাইয়া গেলাম। আবার বিরাট রূপের উচ্ছিষ্ট সানন্দে মুখে দিয়া বলেন—আমি কৃতার্থ। —আর আমরা ?

একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল যে, স্বামীজী যদি সাহেব মেম শিষ্যসহ মন্দির আঙিনায় প্রবেশোদ্যত না হইতেন, তাহলে বাধাও পাইতেন না, বা লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে উৎসব পর্বও বন্ধ হইত না। ইহা অমূলক। বহুকাল পূর্বে যিনি ঠাকুরের পুণ্যদর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে চার পাঁচ দিনও অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি কি এতই অপদার্থ যে, দেবালয়ের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন ? বিধর্মী বা পাদুকাধারীদের মন্দিরাঙ্গনে প্রবেশ নিষেধ থাকিলেও নগ্নপদে উত্তরের বারান্দা দিয়া ঠাকুরের কক্ষ-প্রবেশে কোনো প্রকৃত বিধর্মী ভক্তের প্রভুর দর্শনে ও তাঁহার উপদেশামৃত-পানে কোনো দিনই বাধা ছিল না ; এবং এই কারণেই উইলিয়ম নামে জনৈক খৃষ্টভক্ত অন্য ভক্তসহ প্রভুকে দেখিয়াই মোহিত হন, এবং নতজানু হইয়া 'এই আমার জীবন্ত যিশু' বলিয়া বন্দনা করেন।

যত দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইত, শতাধিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবর্ধমানে লক্ষপ্রমাণ ভক্ত-সমাগম হয়। ইহার মধ্যে বিশিষ্ট রাজকর্মচারী (জজ ম্যাজিস্ট্রেট), কলিকাতায় ও বাঙলার, এমন কি পশ্চিমেরও, সুধী ও ধনিমণ্ডলী (রাজা উপাধিধারী) সমাগত হইতেন, সেকারণ মন্দিরের স্বত্বাধিকারী কর্তৃপক্ষগণও আনন্দে যোগদান করিতেন। বস্তুতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দেবালয়ে এত লোক সমাগত হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

তখনকার দিনের রায়বাহাদুর, সুতরাং মহামান্য স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—ঠাকুরের উৎসব সম্পন্ন হয় বলিয়াই ১। দেবালয়-সংক্রান্ত ভূসম্পত্তির টেক্স বৃদ্ধি হয় নাই ; ২। অগণিত মান্যমান ব্যক্তির সমাগম ; ৩। তদুপরি জগৎমান্য স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা-সাহেব মেমসহ উৎসবে যোগদান করায় মন্দিরাধীশদের আশঙ্কা হয় যে, পাছে এই সকল কারণে এবং ইঁহাদের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি পরস্ব অর্থাৎ সাধারণের হয়। তজ্জন্য এই উৎসব-স্রোতে বাঁধ দিবার প্রয়োজন, যাহাতে ভবিষ্যতে ইহা নানা স্থানেও বিস্তার লাভ করিতে পারে। যদি উৎসব বন্ধ করা অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা রামদয়ালবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে উৎসব করিতে কেন অনুমতি দিলেন ?

পরিশিষ্ট (৩)

সন্তান-চরিত

ঠাকুর এক দিন কহেন—গাছপালা পাহাড়পর্বত নিয়ে ভগবানের লীলা নয়, লীলা ভক্ত নিয়ে। রসো বৈ সঃ যে তিনি, ভক্ত ভিন্ন কে উহার আস্বাদ গ্রহণ করিবে বা তাঁহার মহিমা প্রচার করিবে ? দেখা যায়, সাধারণ মানব বহির্বিষয়ে ব্যস্ত, সুতরাং অন্তররাজ্যে যে সুধা আছে, তাহা জানিতে চাহে না, পারেও না। আর একদিন বলেন—ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, দেবতারা তাঁর লীলা আস্বাদ করতে মর্ত্যলোকে আসেন। ইহাতে বোঝা যায় যে, ঠাকুরের লীলাসহচরগণ সাধারণ মানব নহেন, দেবপ্রতিম বা দেবতা।

আবার একদিন বলেন—নরেন্দ্র যে সে নয়, নরনারায়ণ ঋষিদের নর-ঋষির অংশ, আমাকে মহামায়ার গুণগান শোনাবার জন্য তাঁরই ইচ্ছায় কায়স্থঘরে জন্মেছে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, অনাড়ম্বর দাতা, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া দান করিতেন, নেশাখোর বা দুশ্চরিত্র বলিয়া প্রতিবাদ করিলে কহিতেন—দুঃখপূর্ণ সংসার, যদি এই পয়সায় ক্ষণিক আনন্দ পায়, তাতে বাধা দিও না। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীদ্বিজে ভক্তিমতী ব্রতপরায়ণা এবং বহুজনপালিনী।

নরেন্দ্র যে মহৎ হইবেন, সূচনাতেই আভাস পাওয়া যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন—কাশীধামে ৺বীরেশ্বর মহাদেব অপুত্রকের পুত্রদাতা বলিয়া পূজিত। পুত্রমুখ না দেখিয়া মাতা এক আত্মীয়ার উপদেশে শত কলস গঙ্গাজলে ৺বীরেশ্বরের অভিষেক করেন। পরে পুত্রলাভ হয়। অনুমান, তাই বীরেশ্বরপ্রসাদপ্রাপ্ত পুত্রকে বীরেশ্বর, বীরে বা বিলে বলিয়া ডাকিলেও, অন্নপ্রাশনে নরেন্দ্রনাথ নাম রাখা হয়।

চারি কন্যার পর পুত্র, তাই অতি আদরের ; সুতরাং এতই আবদেরে হন যে, বাঞ্ছামতো দ্রব্যাদি না পাইলেই দৌরাত্ম্য করিতেন, কিন্তু প্রিয়দর্শন হওয়ায় কেহ কিছু বলিত না। মাতা কিন্তু বীরেশ্বরের ভূত বলিয়া মাথায় বা পায়ে জল ঢালিয়া দিলেই শান্ত হইতেন। মাতৃ-অঙ্গপুষ্ট বলিয়া মায়ের কথা ছোট ছেলেদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ আপনাকে বীরেশ্বরের ভূত বলিয়া গর্ব করিতেন, এবং অপর কাহারও ঘাড়ে না চাপিয়া বাপের, ঘোড়ার সইসের কাঁধে চড়িয়া বেড়াইতেন।

বাড়ির সন্নিকট ছাতুবাবুর মাঠে চড়ক দেখিতে গিয়া রাম-সীতা পুতুল কিনিয়া আনেন, কিন্তু উঁহাদের সন্তান হইয়াছে শুনিয়া ভগিনীকে কহেন—এমন ঠাকুরের নাম কর, যাঁর ছেলে হয় নাই। শিবের সন্তান হয় নাই জানিয়া একটি মহাদেব আনিয়া সানন্দে পূজা করেন, ইহাতে জানা যায়, ব্রহ্মচর্যই তাঁহার কাম্য ছিল।

শিব-অংশ কি না, তাই শিবের পুতুলটির সম্মুখে ধ্যান করিবার মতো বসিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন ; বিলম্ব দেখিলে কোনো কোনো দিন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ধরিয়া আনিয়া খাওয়াইতে বসাইতেন। মহাদেব গাঁজা খান শুনিয়া একটা খড় পোড়াইয়া ধূম পান করিতেন।

উকিলের পুত্র বিদ্বান হইবে আশায় যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হয় ; কিন্তু বড় ঘরের ছেলে বলিয়া ইতর সঙ্গী সম্ভাবনায় বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষককে বলিতেন—আমি শুইয়া থাকি, আপনি পড়িয়া যান, দুবার শুনিলেই মনে থাকিবে। ইহাতে আভাস পাওয়া যায়, নরেন্দ্রনাথ যেন দ্বিতীয় শ্রুতিধর। কিছুদিন

পরে বিদ্যাসাগর (মেট্রোপলিটন) স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বোধ হয়, এই সময়েই ধূমপান (তামাক খাওয়া) অভ্যাস হয় ; পাঠাগার-দ্বার আবদ্ধ থাকিত, অর্থাৎ যখন তখন তামাক খাইতেন বলিয়া পিতা কহিতেন—বাবাজী বুঝি ঠাকুরকে ধূপধুনা দিতেছেন, তাই দ্বার বন্ধ। কিন্তু লেখাপড়ায় উন্নতি দেখিয়া কিছু বলিতেন না। সকল পাঠ্যই সহজে আয়ত্ত হইত, কিন্তু জ্যামিতি অরুচিকর বলিয়া কোনোদিনও উহাতে মন দেন নাই। অসাধারণ একাগ্রতাবলে, একরাত্রে ইউক্লিডের চারিবুক কণ্ঠস্থ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জিজ্ঞাসায় বলেন, একাগ্রতা আনয়ন সহজ ব্যাপার, সারাদিন যাহা করিয়াছি, বলিয়াছি বা ভাবিয়াছি, চিন্তা করিলে মনে এমন একটা লজ্জা আসে, যাহাতে সকল দিকে উপেক্ষা আসিয়া ঈপ্সিত বিষয়ে মনঃসংযোগ হয়। এই একাগ্রতার অসাধ্য কিছুই নাই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গড় গড় বলিতেন। ব্রাহ্ম সমাজে ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় বলিয়া প্রায়ই তথায় যাইতেন।

এই সময় হইতেই ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তাঁহার আত্মীয় রামদাদা তাঁহাকে একদিন ঠাকুরের নিকট লইয়া যান ; ঠাকুরও তাঁহাকে কতকালের আপনার জানিয়া বড়ই আদর করেন। গান করতে পারো কহিলে বলেন—একটি গান শিখেছি, আপনাকে শুনাইতেছি—'মন চল নিজ নিকেতনে' ইত্যাদি। গান শুনিয়া ঠাকুর অতিশয় প্রীত হন এবং আপন আসনে বসাইয়া তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করেন। নরেন্দ্রনাথ কহেন—দেখি, যেন ঘরের ছাদ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। আর আমার মনটা জগৎ-টগৎ ছেড়ে কোন্ এক অজানিত রাজ্যে ছুটেছে, ভয়ে কাঁদিয়ে ফেলি ও বলি—ওগো ! আমার বাপ মা আছে। তখন থাক্ থাক্ বলিয়া পুনঃ স্পর্শ করায় সহজ অবস্থায় আসি। তারপর জলযোগ করিয়া রামদাদার সঙ্গে ঘরে ফিরি। ঠাকুরের সহিত এই প্রথম পরিচয়। সত্যের উপর এত নিষ্ঠা যে, বাড়িতে কেহ শিশুকে জুজুর ভয় দেখাইলে কহিতেন, কেন মিথ্যা বলছ ? ঠাকুর বলিতেন—নরেন্দ্র সত্যসংকল্প, উহার সত্যস্বরূপ ভগবান লাভ হবে।

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণের পর পীড়িত হইয়া যথাসময়ে এল. এ. পড়িতে পারেন নাই। অন্তরে যার অদম্য উৎসাহ, সে কি অলস থাকিতে পারে ? তাই বেণী ওস্তাদজীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। যে সময়ে আলাপ্য যে সুর অর্থাৎ রাগ-রাগিণী, সেই সময়ে সাধনা করিলে সুখসাধ্য হইবে, তাই বিষয়ান্তর উপেক্ষা করিয়া সযতনে আয়ত্ত করিতেন। অসামান্য একাগ্রতাবলে ছয় মাসের মধ্যে এতই গীতবিশারদ হন যে, ওস্তাদজী বলেন, আমার যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল, সবই তুমি ঝুলি ঝেড়ে নিয়েছ। কণ্ঠ হইতে ঠিক ঠিক সুরগ্রাম প্রকাশ বড় সহজ ব্যাপার নয়, এমন কি, উহাতে জীবন কাটাইলেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ। যেমন নাদপূর্ণ সুকণ্ঠ, তাতে অদম্য উৎসাহে গমক মূর্চ্ছনা সহ সুর আলাপনে একাদিক্রমে পাঁচ ছয় ঘণ্টা ভজন গানে সকলকে মোহিত করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—নরেন্দ্রের গান শুনলে আমার ভিতর যিনি—ফোঁস করে উঠেন (অর্থাৎ সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি পরমশিবে সহস্রারে মিলিত হন) আর আমি অমনই সমাধিস্থ হই।

ভাবী কালে ধর্মাচার্য হইবেন, বোধ হয়., সেই জন্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ। রেভারেণ্ড হেস্টি সাহেব পাশ্চাত্য দর্শন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জানিয়া জেনারেল এসেমব্লীতে তাঁহার অধ্যাপনায় এল. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। প্রতিভায় প্রীত হইয়া অধ্যাপক নিজ

কক্ষেও প্রাণ ভরিয়া শিক্ষা দিতেন। ভালোবাসায় দোষ দেখিতে পায় না, তাই নরেন্দ্রনাথের ধূমপানের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মহাকবি এমার্সন বড়ই ভাবুক ছিলেন, ভগবৎপ্রসঙ্গে ভাবাবেশ হইত। (বিভু-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পুলকবশে মনের যে অবস্থা হয়, তাহার নাম ভাব) ইংরেজিতে ইহাকে ট্রান্স কহে। অধ্যাপনকালে হেস্টি সাহেব বলেন—ট্রান্স অন্তররাজ্যের ব্যাপার, সুতরাং ভাষাতে ব্যাখ্যা অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস আছেন। ঈশ্বরীয় কথায় ও চিন্তায় সেই মহাত্মার দিব্য ভাবাবেশ হয়, তোমরা যদি তাঁহাকে দেখিবার প্রয়াস পাও, তাহা হইলে ট্রান্সের—ভাবরাজ্যের বিষয় কতকটা বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ছাত্রবৃন্দকে দক্ষিণেশ্বর পাঠাইয়া দেন।

কেবল দর্শন-শাস্ত্র কেন ? তর্ক-শাস্ত্রে (লজিক) এতই বিশারদ যে, হয়কে নয় করিতে এবং নয়কে হয় করিতে অদ্বিতীয়। আবার নাস্তিকতায় (শূন্যবাদে) এমন সুদক্ষ যে, নাই নাই করিতে করিতে নিজ অস্তিত্বেও সন্দিহান হইতেন। দেখিয়াছি—কত বন্ধ নাস্তিক তাঁহার যুক্তিতে পরাভূত হইয়া আস্তিক্যভাবাপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছে।

আনন্দই সারবস্তু। দয়া ও চরিত্রবান হইয়া বন্ধুসনে আনন্দ করা নরেন্দ্রের স্বভাব, কলেজের ছুটির পর সহপাঠীদের লইয়া সঙ্গীত-চর্চায় ও ধূমপানে আনন্দ করিতেন। তাঁহার এক সতীর্থ কহেন—আনন্দোল্লাসে আমাদের অবনতি হয়, কিন্তু দেখি—নরেন্দ্র দিন দিন উন্নতি করিতেছে।

ঠাকুর বলিতেন,—কেবল চুম্বক যে লোহাকে টানে, তা নয় ; লোহাও চুম্বককে টানে, তাই মিলন হয়। প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রনাথ প্রভুর ভালোবাসায় আকৃষ্ট এবং তাঁহার জীবনবেদের ভাবী ভাষ্যকার জানিয়া ঠাকুরও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই হেতু সিমলা অঞ্চলে ভক্তভবনে আসিলেই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন এবং ভগবৎকথা-প্রসঙ্গে তাঁহার ধর্মভাবের উদ্দীপন করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজে যাইলেও কেবল আচার্য-গাথা শুনিয়া নিরস্ত হইতেন না, বরং উপদেশ-গুলি আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইতেন। বিষয়ান্তর পরিহার-পূর্বক অভীষ্ট পাদর্থে পুনঃ পুনঃ মনঃসংযোগের নাম ধ্যান ; তাই আত্মোন্নতি বাসনায় অধিকতর ধ্যান ও ও অধ্যয়নে এমন শিরঃপীড়া হয় যে, তাহা ঔষধে উপশম না হইলে, প্রভুর করুণা-পরশে শান্তি হয়।

বার বার দরশ পরশে ও অমিয় উপদেশে ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্ধিত হয়। ভাবেন—দেখিতে পাগলের মতো হইলেও, ঐশী শক্তিতে মানবকে দেবতা করিতে পারেন। এই সিদ্ধান্তে তখন তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যান। ঈশ্বর-দর্শন কি সম্ভব, একদিন জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলেন—যেমন তোকে দেখছি, ঈশ্বরকেও ঠিক এইরূপ দেখা যায় ; তবে সাধন-সাপেক্ষ, কিন্তু তাঁর কৃপাতেও হয়। এই বলিয়া ভাবাবেশে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিলে নরেন্দ্রনাথ আবিষ্ট হইয়া—কি জন্য আগমন, কার্যধারাই বা কি, ঠাকুরের প্রশ্নে সমুদয়ই ব্যক্ত করেন।

মৎস্যের জীবন ও বিহগের গমন যেমন আশ্রয় ও আরামস্থল, ধ্যান ধারণা, নরেন্দ্রের পক্ষে ঠিক সেই মতো ছিল। প্রভুর কথামতো সারারাত্রি ধ্যান করিতেন এবং যাহা অনুভূত হইত, সমস্তই নিবেদন করিতেন। ধ্যানযোগে এক রাত্রে দেখেন, যেন

আর এক নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই অনুরূপ আচরণ করিতেছে, ঠিক যেন দর্পণে প্রতিবিম্ব। আশ্চর্যজনক এই ব্যাপারটি জানাইলে ঠাকুর আনন্দ করিয়া কহেন—ইহা ধ্যানসিদ্ধির লক্ষণ। অতঃপর কিছুদিনের জন্য ধ্যান করা নিষিদ্ধ রহিল। আমাদের বলিতেন—পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান, ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান। যেমন নরেন্দ্র।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতৃবিয়োগের পর মাতা ও ভ্রাতার পালন-ভার তাঁহারই উপর পড়ে। বিধাতা যাঁহাকে উচ্চ কার্যে মনন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কি অন্য বৃত্তি সম্ভবে? তথাপি কিছুদিনের জন্য শিক্ষকের কার্য করিলেন, তাহাতে মন বসিল না, অপর যত চেষ্টা করেন সবই বিফল হয়। কত প্রলোভনে পড়েন, তাহাতেও অটল, অভিমানে কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। দেশান্তরগত পুত্রের জন্য মাতার যেমন ব্যাকুলতা, নরেন্দ্রের জন্য ঠাকুর সেইরূপ ব্যাকুল হন। লোক দিয়া অনুসন্ধান করেন, কেহই সঠিক সমাচার দিতে পারে না। দৈবযোগে একদিন উপস্থিত হইলে, প্রভু করুণভাবে গান করেন—'কথা কইতে ডরাই, না কইতেও ডরাই। মনে সন্দ হয় পাছে তোমায় হারাই হারাই।' ব্যাপারটা কি জানিতে কৌতূহলী হইলে বলেন—ও আমাদের একটা হয়ে গেল। ঠাকুর বলেন—প্রতীক উপাসক যত একভাগে, আর অখণ্ডের উপাসক অন্য ভাগে, সেও মাত্র চারজন, ধ্যানমগ্ন। নরেন্দ্র সেই চারজনের একজন, তাই ওকে দেখলে আমার অখণ্ডের ভাব আসে। জগদম্বা দেখালেন, স্বর্গ হতে যেন একটা জ্যোতি কলকাতার দিকে পড়েছে, নরেন্দ্রের জন্ম সেই জ্যোতি হতে। মাড়োয়ারীদের খাবার কামনা-মাখানো, নিজে তো খেতে পারিনি, তোদেরও দিইনি, পাছে ভক্তির উচ্ছেদ হয়। নরেন্দ্রকে দেই, ওর জ্ঞানাগ্নিতে কামনা-টামনা সব দগ্ধ হয়ে যাবে। নরেন্দ্র হচ্ছে নরের ইন্দ্র—শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের আবেশে চোখের মণি ওপর দিকেই উঠে আছে। ঘুমালেও দেখছি—চোখ একেবারে বোজে না। ওর সব লক্ষণ মহাযোগীর মতো, তাই এত আদর করি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে বলেন—জগদম্বা একটি শক্তি (বক্তৃতা শক্তি) দেছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্রের ভিতর আঠারোটা শক্তি আছে। নরেন্দ্র অপ্রতিভ হইলেও, গুণগ্রাহী কেশব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁর নব বৃন্দাবন নাটকে সন্ন্যাসীর অভিনয় করিবার অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী বেশ দর্শন আগ্রহে ঠাকুর কেশব বাবুর আলয়ে যান এবং অভিনয় দেখিয়া আনন্দে কহেন—নরেনদর যেন ঐ বেশে আর একবার আমার কাছে আসে।

ঠাকুর একদিন কহেন—খানদানি চাষা বারো বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না; নরেন্দ্র খানদানি চাষা। মা-ভাইয়ের কষ্ট শুনে বলি—কালী-ঘরে যা, যা চাবি মা তাই দেবে। তা টাকাকড়ি না চেয়ে, চাইলে কি না মা আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও। আবার—মা ত্বং হি তারা—গানটি শিখে নিয়ে সারারাত্রি গান করে এখন ঘুমাচ্ছে।

বৃত্তি বা পদকসহ উপাধি না পাইলেও ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দার্শনিক মনীষী হারবার্ট স্পেন্সারের কোনো গ্রন্থের অনুবাদ প্রার্থনা জানাইলে তিনি লেখেনঃ—আপনার মতো ইংরাজী রচনা আমি ইতিপূর্বে তো দেখি নাই, সুতরাং আপনার অনুবাদে আনন্দিত হইব। সন্ন্যাসী টমাস কেম্পিসের 'ইমিটেসন অব ক্রাইস্ট,—ঈশানুসরণ নাম দিয়া এত সুন্দর অনুবাদ করেন যে, পাঠকালে মনে হইত যেন মূল

গ্রন্থই পড়িতেছি। সঙ্গীত-কলা বিষয়ে এমন এক তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন, যাহা সকলেরই আদরণীয় হয়। পঠদ্দশায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার হয়, তদ্দ্বারা শাস্ত্রাদি অতি সুখদ ও অভিনবভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, ঠাকুরের এই কথাটির ভাব প্রকাশ করিতে তিন দিন অতিপাত করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনে আশ্চর্যকর অনুভূতি ছিল। প্রভুর লীলাবসানে কাশীধামে অবস্থান-কালে অসি-তীরে দ্বারকাদাস বাবাজীর আশ্রমে মহামনস্বী ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় বিস্মিত হইয়া বলেন—বিদ্যাগৌরবে সরকার বাহাদুরের শিক্ষা-নিয়ামক পদ লাভ করি, কিন্তু আমার অনধীত শাস্ত্রও তুমি বিশদভাবে আলোচনা করায় গর্ব খর্ব হইলেও প্রীত হইলাম। আশীর্বাদ করি, দীর্ঘায়ু ও সর্বশ্রেষ্ঠ হও। অল্প বয়সে বহু অধ্যয়ন কিরূপে সম্ভব হইল, জিজ্ঞাসায় বলেন—গ্রন্থ-সমুদয়ের প্রতি পত্রের প্রথম ও শেষ দু-ছত্র পড়িলেই ভগবৎকৃপায় তাহার মর্ম অবধারণ হয়। কেবল আমি নই, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেরও এই শক্তি ছিল। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে অধিকার না হইলে বৈদিক ভাষা বোধগম্য হয় না, তাই প্রব্রজ্যাকালে মহারাষ্ট্রে কোনো অধ্যাপকের নিকট শিক্ষাকালে পণ্ডিতজী বিদ্রূপ করেন—সাধু হইলেই কেমন একটা অহমিকা হয়। যে ফণীভাষ্য আয়ত্ত করিতে আমার যুগ যুগ কাটিয়াছে, আপনি কেমন করিয়া উহা এখন শিক্ষা করিবেন? নরেন্দ্রনাথ কহেন—যখন ছাত্র হইয়াছি, যত ইচ্ছা পাঠ দিন, অভ্যাস করিতে না পারিলে শাস্তি দিবেন। অসাধারণ মেধাবলে মাত্র একমাস মধ্যে সমগ্র পাণিনি আয়ত্ত করায় পণ্ডিতজী কহেন—আপনি সাধারণ মানব নহেন। প্রসিদ্ধ রবিবর্মার চিত্র-কলাকে তখন সকলেই প্রশংসা করে, কিন্তু তাঁহার ত্রুটি দেখাইলে শিল্পী বলেন—এ পর্যন্ত কেহই দোষ ধরিতে পারে নাই। বোধ হয় আপনি এক সময় ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে নরেন্দ্রনাথ কহেন—দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী, তেনাহং জানামি সর্বং ভানুমত্যাস্তিলং যথা।

শাস্ত্র বলেন—যাঁহাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয়ই জ্ঞাত হওয়া যায়, কেবল ইচ্ছা-সাপেক্ষ। প্রভুর কৃপায় নরেন্দ্রনাথ সেই পরাৎপরকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ হন; সুতরাং শাস্ত্র বল, শিল্পকলা বল, আর যা কিছু বল, সকলই স্বল্পায়াসে আয়ত্ত করেন। প্রভুর লীলামৃত অনুশীলনে যখন তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তখন পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুর একদিন বলেন—দ্যাখ, চারটে দর্শনের পণ্ডিত, পাঁচটা দর্শনের পণ্ডিত, সব দু-চার কথায় চুপ; কিন্তু এই ছোঁড়াটা (নরেন্দ্র) আজ দু বৎসর ধরে আমার সঙ্গে খটাখটি (তর্কবিতর্ক) করছে। কেন জানিস—এখানকার (তাঁহার) কাজ করবেক বলে তাই এমনি করে গড়ছি। পুত্রের কাছে পরাজয়ে পিতারই গৌরব। আরও বলেন —ও যদি দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়, একটা নতুন মত চালিয়ে যেতে পারে। কেবল এখানকার জন্য মহামায়া ওকে দাবিয়ে রেখেছেন। কথা-প্রসঙ্গে যোগিশ্রেষ্ঠ গাজীপুরের পওহারী বাবাও বলেন—নরেন্দ্রবাবা এক অবতার পুরুষ। আমার কাছে নরেন্দ্রের সবই গুণ এমন কি তাঁহার প্রীতিপূর্ণ কুভাষণও তৃপ্তিকর।

দারিদ্র্যলালিত না হইলে পরদুঃখে সমবেদনা জাগে না। পিতৃবিয়োগে দুঃখক্লিষ্ট হন বলিয়াই লোকের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিতেন। হিমালয় ভ্রমণে সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি —পাহাড়ীদের দারিদ্র্য দর্শনে অশ্রুপাত করিতেন এবং ভগবৎ-সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেন,

যাহাতে তাহাদের দুঃখকষ্ট নিবারণ হয়। এই সময় কহেন, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় যে ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে পৌরুষ, ভোগ, ও মোক্ষ সকলই শুভকর হইয়া এককালে ভারতকে সর্বোচ্চ করিয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধদেব যে বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেশ নির্বীর্য ও দৈন্যযুক্ত হয়েছে।

এরূপ অমানুষিক গুরুভক্তি সহসা তো দেখা যায় না। হিমালয়ে তপস্যাকালে গঙ্গাধরের পীড়াতে এতই বিচলিত হন যে, তাঁহার বৈরাগ্যভাব কোথায় উড়িয়া যায়, বলেন—নিজ জীবনদানে যদি গুরুভ্রাতার একগাছি কেশও রক্ষা করিতে পারি, তাহা কোটি তপস্যা বলে মনে করি; তোরা আমার সাধনার কণ্টক, তোদের সঙ্গে থাকলে তোদের ভাবনা ছাড়া আর কিছু হবে না বলিয়া—আমাদের মায়া কাটাইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বনে পদব্রজে সারা ভারত ভ্রমণ করেন; শীত, বাত, রৌদ্র, বৃষ্টি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। অবসন্ন হইলে যথা তথা শয়ন, তাহা বৃক্ষতলে হউক বা দেবমন্দির হউক। সম্বলের মধ্যে ছিল এই গীতটি—'দরদ না জানে কৈ, মীরা আপনা রাম দেওয়ানী।' যেন মূর্তিমান বৈরাগ্য। কেহ যদি যাচিয়া ভিক্ষা দিল তবে গ্রহণ, নইলে অনশন।

এইরূপে ঠাকুরের বার্তা প্রচার করিতে করিতে ক্রমে রাজপুতানার ক্ষেতড়ী রাজ্যে উপনীত হন। এক প্রিয়দর্শন সাধু আসিয়াছে শুনিয়া রাজা আদর করিয়া নিজ প্রাসাদে লইয়া যান এবং তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন মানসে দুইজন প্রসিদ্ধা গায়িকাকে আনয়ন করেন। বৈরাগ্যদীপ্ত সন্ন্যাসী বারাঙ্গনা-মুখে ভজন শুনিতে অবজ্ঞা করায় কি জানি কোন্ প্রেরণায় তাহারা গীতারম্ভ করে। (১) প্রভুজী! অব্ গুণ চিতে না ধরো। সমদরশী তুহি হ্যায়॥ এক লোহে মুরতি পুজাওয়ে, আউর ঘর বধি করে। পরশ কি মনমে দ্বিধা নেহি হায় দুহু সোনে কার॥ অর্থ—হে সমদর্শী প্রভো! আমার দোষ ধরিও না। বিগ্রহ মূর্তি ধারণে একখণ্ড লৌহ পূজা পাইতেছে, অপর খণ্ড কসাইয়ের হাতে অস্ত্ররূপে হনন-নিরত। পরশমণির অন্তরে দ্বিধা নাই বলিয়া স্পর্শ-মাত্রেই উভয়কে কাঞ্চন করে। (২) দয়ানিধে! তেরি গতি লখি না পড়ে। পিতাকো বচন যো টারে সো পাপী, ওহি পাপ প্রহ্লাদ করে। তাকে লিয়ে স্ফটিক থাম্বাসে নরসিং রূপ প্রকট করে॥ অর্থ—হে দয়ানিধে! তোমার ভাব বোঝা ভার। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ, প্রহ্লাদ কিন্তু উহাই করে। তবু তার জন্য স্ফটিক-স্তম্ভ হইতে আপনাকে নৃসিংহরূপে প্রকট করিয়াছ। জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, নরেন্দ্রনাথ বলেন তাঁহার ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। কহেন, জীবনে এই প্রথম পরাভব।

যাঁহার ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ আত্মদর্শন হইয়াছে, দেবতা কিন্নর ও প্রেতযোনি দর্শন তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়। হিমালয় ভ্রমণে কিম্পুরুষ দর্শন হয়, দেবদর্শন যখন তখন হইত। কোনো গুরুভ্রাতার আরোগ্য-কামনায় প্রার্থনা করিলে, আদ্যাশক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করায় কহেন—কেলে মেয়েটা আমাকে ভোগা দিয়ে পালালো। আবার দক্ষিণাপথ ভ্রমণ-কালে দুটি প্রেতযোনির দুর্দশা-দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্তে—যদি আমি জীবনে কোনো পুণ্যকার্য করিয়া থাকি, তাহার ফলে তোদের সদ্‌গতি হউক—বলিবামাত্র তাহারা তাঁহার জয় দিয়া দিব্যলোকে প্রয়াণ করে।

পূর্ব তপস্যাকেন্দ্র দর্শনে আবার যদি চিরসমাধিস্থ হন, তাহা হইলে তো আর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-বেদের ভাষ্যরচনা হইবে না, বোধ হয় এই কারণেই মহামায়া তাঁহাকে

বদরিকাশ্রম যাইতে দেন নাই; তবে হৃষীকেশ তীর্থে অবস্থানকালে চির-অভীপ্সিত নির্বিকল্প সমাধিতে মৃতবৎ দর্শনে আমরা বিহ্বল হইলে পরদিন ব্যুত্থান করিয়া কহেন—প্রভুর কৃপায় এই দ্বিতীয়বার নির্বিকল্পের রসাস্বাদ পাইলাম। প্রভুর বার্তা প্রচার করিতে করিতে অবশেষে ভগবতীর নিত্য তপঃক্ষেত্র কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। উত্তর মেরুর চিরতুষার হিমাচল হইতে বিচরণ করিয়া দক্ষিণাপথের সমুদ্র-মেখলামণ্ডিত ভারতের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া অসীম ও অতল সাগর দর্শনে ভাব-বিভোর হইয়া, কি জানি কোন্ প্রেরণায় অন্তরে এমন এক ভাবের উদয় হয়, যাহাতে ভারতকে তাঁহার বিরাট দেহ ধারণে অপরিসর ভাবিয়া উত্তাল তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে ঝম্প দান করেন। তীরস্থ লোকে ত্রাসিত হইলেও ভাবাবেশে অন্তরে শংকা সঞ্চার হয় নাই; তাই প্রায় দ্বিশত হস্ত সন্তরণ করিয়া প্রবালময় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে উপনীত হন; সেবকগণ বলেন—ইহাই কন্যারূপী ভগবতীর আদিম তপস্যা স্থান, সমুদ্রগর্ভে বিলীনপ্রায় হইলে পূর্বকালের রামরাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় বহুক্ষণ ধ্যান সমাধির পর, বোধ হয় কোনো আদেশ পাইয়া আশ্বস্ত বোধ করিলে, মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত সন্তর্পণে কূলে আনয়ন করে। যিনি কন্যাকুমারী দর্শন করেন নাই, তাঁহার এই প্রাণান্তক প্রচেষ্টার ধারণা অসম্ভব, কুমারিকা-ক্ষেত্র ত্রিবাংকুর রাজ্যের অন্তর্গত; প্রকৃষ্টরূপে প্রজারঞ্জন এবং অধিকারস্থ ব্রাহ্মণকুলকে অন্ন-বস্ত্র দানে পালন করায় রাজ্যেশ্বরের নাম রামরাজ্য। সমগ্র রাজ্য ভগবান পদ্মনাথ-সেবায় অর্পিত বলিয়া, রাজা আপনাকে শ্রীপদ্মনাভদাস বলিয়া গৌরব করেন এবং যাবতীয় রাজকার্যে এই উপাধি প্রয়োগ করেন।

এই সময়ে মার্কিন দেশে চিকাগো নগরীতে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হয়, উদ্দেশ্য স্বধর্মের (খ্রীষ্টধর্মের) বিজয়-নিশান উড্ডীন করা। ভারতের বহুবিধ ধর্ম-বক্তাদের আমন্ত্রণ হইলেও, সনাতন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানে কাহারও আহ্বান হয় নাই। এইজন্য মাদ্রাজবাসীরা তাঁহাকে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে দিল্লী-নিবাসী ভক্ত শামলচাঁদ তাঁহার গুণগ্রামে মোহিত হইয়া ধর্মপ্রচার জন্য বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে, কহেন—যখন প্রভুর আদেশ পাইব, যাইব, অন্যথা নহে। বোধ হয় কুমারী-ক্ষেত্রে প্রভুর অনুজ্ঞা পাইয়া থাকিবেন, তাই এখন সম্মত হন।

উষ্ণ দেশবাসী কড়ম্বভোজী দক্ষিণাপথীদের ধারণা ছিল না যে, কাঞ্চনসেবীদের দেশ ভারত অপেক্ষা কত অধিক শীতল এবং জীবিকা কত মহার্ঘ্য; সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা অভাবে দুর্দান্ত শীতে একরকম অনাহারেই থাকিতে হয়। অধুনা অস্মদ্দেশে অস্পৃশ্য আন্দোলন বলিয়া এক তরঙ্গ উঠিয়াছে কিন্তু কাঞ্চনকুলীন শ্বেতাঙ্গ দেশে তাম্র বা কৃষ্ণকায় বিদেশী স্বদেশী চিরদিনই অস্পৃশ্য; তবে হরিজন আখ্যা না পাইয়া বর্বর অভিধা লভিয়াছে; এই হেতু হোটেল প্রভৃতি সকল স্থানেই প্রবেশ নিষেধ। অগত্যা মাত্র জল ও রুটি খাইয়া কম্পিত কলেবরে অট্টালিকার অলিন্দতলে কাটাইতে হয়। এইরূপ বিষাদ ও নৈরাশ্যে বিচলিত হইলে প্রভু দরশন দানে আশ্বস্ত করেন।

ভক্তকে কিভাবে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ভগবানই জানেন। যে দিন রুটি জলও জোটে নাই, ক্ষুধায় ও শীতে অবসন্নপ্রায়, এমত সময় পথচারিণী এক প্রৌঢ়া তাঁহার বিচিত্র বর্ণ ও বেশ দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ নিকটে আসেন এবং কথাবার্তায় জানিতে পারেন—ইনি ভারতের সন্ন্যাসী, ঘটনাচক্রে এদেশে সমাগত। তখন তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া অন্নবস্ত্র দানে সৎকার করেন। পরে কথাবার্তায় জানিতে পারেন, ইনি

একজন মহামনস্বী এবং ইঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যা আশ্চর্য ও অভিনব ; তাই তাঁহার বন্ধু হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেন সাহেবকে লিখেন—যদি তোমরা সাম্যবাদ-প্রচারক এই ভারত-সন্ন্যাসীকে মহাসভায় লইয়া না যাও, জানিব তোমাদের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল। অধ্যাপকবর স্বামীজীর সহিত ধর্মালোচনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে মহা-সভায় লইয়া যান। কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না প্রবাদটি নরেন্দ্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মামুলী মহোদয়া মহোদয়ের পরিবর্তে আমার পাশ্চাত্য ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বোধনটি সভামধ্যে যেন তড়িৎ সঞ্চার করে। অভিভাষণে কহেন—তোমাদের প্রচেষ্টা নূতন নয়, বহুপূর্বে ভারতে ইহার সূচনা হয় এবং পর পর দুইজন মহাপ্রাণ সম্রাট ইহাতে কৃতকার্য হন, তবে তোমরাই ইহা প্রথম প্রচার করিলে, শুনিয়া সভাস্থ সকলে নতশির হন। পরে তাঁহার আশ্চর্যময় ও অভিনব ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া সশ্রদ্ধ শ্রোতৃগণের ধারণা হয়—একমাত্র বেদই যাবতীয় ধর্মমতের উৎস এবং ভারতীয়রা বর্বর নহে। তাঁহারা বলেন, এই সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়া আর কাহারও বাণী শুনিতে অভিরুচি হয় না। ফলে খ্রীষ্টধর্মের পরিবর্তে হিন্দুধর্মেরই গৌরব হইল। যাঁহার মাত্র একটি অভিভাষণে একদিনে সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রদ্ধাবান হয়, এমনটি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি ? সুতরাং নরেন্দ্রনাথ—এক অদ্বিতীয় মহামানব। পাঠক ! ইহাই অবধারণ কর।

কাঞ্চনসেবী সম্পদ-উপাসক যাহাতে সত্যধর্মের সন্ধান পায়, এই অভিপ্রায়ে তথায় সপ্তাহে দশ পনেরটি বক্তৃতা দিয়া নানা শহর ভ্রমণ করেন। এক আধটি বক্তৃতা দিতে আমরা কতই না প্রয়াস পাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ দৈবশক্তিবলে বহু স্থানে বহু বাণী প্রদান করিয়াছেন, ইহা অতীব বিস্ময়কর। স্বচ্ছন্দপ্রিয় ওদেশের লোক স্থানান্তর গমনে কতই না দ্রব্যজাত লইয়া যায় এবং কত স্থানে আহারের ব্যবস্থা করে, কিন্তু বৈরাগ্যমূর্তি বিবেকানন্দের এ সব আড়ম্বর ছিল না। বলিতেন,—প্রভুর কৃপায় প্রতি গৃহেই যখন মাতাপিতা বর্তমান, তখন অন্নবস্ত্রের জন্য কেন উদ্বিগ্ন হইব ? তাঁহার ত্যাগ, ঈশ্বর-নির্ভরতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সর্বসাধারণে বলে—এই হিন্দু সন্ন্যাসী অদ্বিতীয় মানব। ঈদৃশ মহাপুরুষের দেশকে সভ্য করিবার অভিপ্রায়ে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ নিরর্থক। ফলে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকগণের অর্থাগম হ্রাস হয়। এইরূপে 'যত মত তত পথ' প্রভুর এই অভিনব মহাবাক্য প্রচারে এক নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তনে বহু নরনারী তাঁহাকে আদর্শরূপে বরণ করে ; যাহার ফলে বেলুড় মঠের আধুনিক সন্ন্যাসীরা অদ্যাপি তাঁহারই ভাবধারার অনুবর্তন করিতেছে। ইহার পূর্বে যে সমস্ত ভারতবাসী পাশ্চাত্যে গিয়াছেন, জড়বিজ্ঞানের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া পাশ্চাত্যেরই পূজা করিয়া আসিয়াছেন। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই (বিবেকানন্দ) পাশ্চাত্যের পূজা লইয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন—ভারতবাসী বর্বর নহে, জগতের অন্য কোনো স্থানে যখন ধর্মের বিকাশ হয় নাই, সেই অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই পুণ্য ভারত ধর্মচর্চায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং বাহিরের অনেক ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া সমগ্র জগৎকে ধর্মদান করিবার কারণে জগদ্‌গুরুরূপে ভারত নিজ মহিমায় সমাসীন। পুরাকাল হইতে যে সমস্ত পূজ্যপাদ ধর্মাচার্য অবতার পুরুষগণ যুগোপযোগী যে সমস্ত ধর্মমত প্রচারে মানবের কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কৃত বা পূর্ণ প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ, আশ্চর্যকর অধ্যাত্মবলে সকল ধর্মকে সম্মিলিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—অনুষ্ঠান সহ সকল ধর্মই সত্য, যেহেতু সকল ধর্মই সেই সর্বব্যাপী ও সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট একেশ্বরের সন্ধান বলিয়া দেয়।

অমিতাভের হৃদয় এবং তীক্ষ্ণধী শঙ্করের মস্তিষ্ক-সংমিশ্রণে বিধাতা যে অপূর্ব নরেন্দ্র গঠন করতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় প্রাণবন্ত করিয়াছেন, প্রভুর বার্তাবহ সেই নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের সম্মান অর্জন করিয়া দেশের (ভারতের)—বিশেষ করিয়া বাঙলার গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। বিশ্ববিজয়ী হইয়াও মনোদুঃখে কহিয়াছেন—পাশ্চাত্য শিক্ষার অধীনে সংশয়াপন্ন আমরা ধর্মতত্ত্ব অবধারণে সহজে সমর্থ হই না। বালকের মতো সরলপ্রাণ ঠাকুর কিন্তু নিরক্ষর হইয়াও শ্রদ্ধাবলে ভগবদ্দর্শন করিয়া জীবন-রহস্য ভেদের পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

আবির্ভাব যাঁর মহিমায়, প্রয়াণও তদনুরূপ বা ততোধিক। প্রভু বলিতেন—নরেন্দ্র যে দণ্ডে স্ব-স্বরূপ জানবে, সেই দণ্ডেই পালাবে। মেরুদণ্ডে অতিসূক্ষ্ম সুষুম্না মার্গ অবলম্বনে মহাযোগীর প্রাণশক্তি (কুণ্ডলিনী) উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমি অতিক্রমণে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিলে পরা নির্বাণ হয়, একাদশী পারণে জনৈক শিষ্যকে তাহাই বুঝাইয়া দেন। আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-সভ্যতা জাহ্নবীপ্রবাহ ন্যায় যেরূপে দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসারিত হইয়া জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছে, সান্ধ্যভ্রমণ সময়ে গুরুভ্রাতা বাবুরাম মহারাজকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

শুদ্ধমন অনায়াসেই শুভাশুভ ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ, তাই বোধ হয় অনুভব করেন—আহ্বান আসিয়াছে, অদ্যই যাইতে হইবে। অন্যান্য দিন নিজকক্ষেই ধ্যান করেন, কিন্তু জানি না কোন্ প্রেরণায় সেইদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে ধ্যান করিতে যান। হইতে পারে স্ব-স্বরূপের অভিজ্ঞান। তাই বোধ হয় সিদ্ধকাম হইয়া নিজকক্ষে প্রত্যাগত হন। আমাদেরও যখন-তখন বলিতেন—যখন যাব তোদের জানিতে দিব না। তাই বুঝি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাযোগী এমন গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন, যাহা হইতে আর ব্যুত্থান হইল না। বস্তুতঃ নিম্নতলে অতি নিকটে থাকিয়াও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, কি সর্বনাশ উপস্থিত। পরে নাসারন্ধ্রে রক্তধারা দেখিয়া মনে হয়—যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পিঞ্জরস্থ আত্মা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছে। এরূপ আশ্চর্য ইচ্ছামৃত্যু এ পর্যন্ত কেহ তো কোথায়ও দেখেন নাই বা শুনেন নাই !! পাঠক ! এখন অবধারণ কর—নরেন্দ্রনাথ কে ? নর, না, নর-নারায়ণ।

(২) রাখালচন্দ্র—ব্রহ্মানন্দ

বিবাহ করিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা বালস্বভাব রাখালচন্দ্রের পূত-চরিত আলোচনা করুন। পিতামাতা বা গুরুজন নিয়োগে বাল্যবিবাহ দোষাবহ নহে। বস্তুতঃ এই বিবাহই তাঁহার ঠাকুরের সহিত যোগসূত্র।

ঠাকুর কহেন—রাখাল ব্রজের রাখাল ; ভাবাবেশে একদিন দেখি, গঙ্গাগর্ভে দুটি কমল প্রস্ফুটিত, একটির উপর কৃষ্ণ, অপরটির উপর তাঁর সখা নৃত্য করছেন। এমন সময় জগদম্বা ঐ কৃষ্ণ-সখাটিকে কোলে বসায়ে দিয়ে কহিলেন—এইটি তোমার পুত্র। ঠাকুর বিস্মিত হইয়া বলেন—তোমার কৃপায় মা ! যখন অঙ্গে বসনখানিও থাকে না, তখন কেমন করে পুত্র পালন করব ? তবে নহবৎখানায় জানাই (শ্রীমাকে উদ্দেশ করিয়া), সে যদি তোমার দত্ত পুত্রটি পালে। ঠাকুর শ্রীমাকে কহেন—দেখছ তো আমার অবস্থা, তোমার তো ছেলে হল না যে তোমায় দেখবে, তাই মহামায়া কৃষ্ণসখা রাখালকে কোলে বসিয়ে বললেন—এইটি তোমার পুত্র। শ্রীমাও শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

প্রভুর দিব্যদর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণে আমরা এতই বিভোর যে, তাঁহার সন্তানকুলের পরিচয় অভিরুচি বা অবসর আসিত না, তবে ইঁনি প্রভুর, এইটুকু জানিয়াই পরস্পর অনুরক্ত। পরে জানা যায়—ইঁহার নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ, বসিরহাট অঞ্চলের কোনো জমিদারের পুত্র; কলিকাতায় সিমলা পল্লীতে অবস্থান করিয়া লেখাপড়া করিতেন। মেধাবী হইলেও ব্যায়ামপ্রিয় ছিলেন এবং ব্যায়ামক্ষেত্রেই নরেন্দ্রনাথ সনে ঘনিষ্ঠতা হয়।

এই সময়ে কোন্নগর নিবাসী ভক্ত মনোমোহন মিত্রের ভগিনীর সহিত পরিণয় হয়। মনোমোহন বাবুর মাতা ঠাকুরকে ইষ্টদেব জ্ঞানে ভক্তি করিতেন, তাই স্বামী-বিয়োগের পর হস্তস্থিত মূল্যবান বলয়দ্বয় প্রভুর জন্মোৎসব-ব্যয়ার্থে অর্পণ করেন। তখনকার ধর্মপ্রাণ নরনারীর স্বভাব ছিল যে, নূতন উৎকৃষ্ট এবং প্রিয় দ্রব্য ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করা এবং নব পরিণীত পুত্র, কন্যা, বধূ, জামাতাকে শ্রীপদে অর্পণ করিয়া স্নেহাশিষ প্রার্থনা করা। এই প্রাচীন প্রথামতো রাখালের শ্বশ্রূ, কন্যা-জামাতা লইয়া প্রভুর সন্নিধানে আগমন করেন। রাখালকে দেখিয়াই ঠাকুর চিনিতে পারেন—এই সেই ব্রজের রাখাল, জগদম্বা যাহাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া প্রদান করিয়াছেন। তখন বাৎসল্যভাবে তাহাকে মিষ্টান্ন খাওয়ান, এবং তাহার নববধূকে পুত্রবধূ বলিয়া সম্ভাষণ করেন; এবং শ্রীমাতৃদেবীকেও বলিয়া পাঠান যেন যৌতুক দিয়া পুত্রবধূ দর্শন করেন। ইহাতে মনোমোহন বাবু ও তাঁহার মাতা আনন্দিত হন বটে, কিন্তু জানিতে পারেন নাই, কেন এত আদর। প্রবাসী পুত্র বহুদিন পরে স্নেহময় জনক-জননীকে দেখিয়া যেরূপ আনন্দবোধ করে, রাখালের অন্তরে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবার বাসনা না থাকিলেও, শ্বশুর আগ্রহে ও সৌজন্যতাবশে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়।

ঠাকুর বলিতেন—আমি কর্মনাশা, এখানকে এলে কর্মনাশ হয়, রাখালের তাহাই হয়েছিল। অনুরাগের আবেগে ভাবিতেন—কতক্ষণে তাঁহার সেই প্রাণারামকে দেখিবেন, এবং কথাবার্তার আনন্দে ভাসিবেন। এই কারণে প্রায়শই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতেন। তাই তখন হইতে পুঁথিগত বিদ্যার অবসান হইলেও প্রভুর কৃপায় তাঁহার অন্তরে সকল তত্ত্বেরই স্ফূরণ হয়; যথা—ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বিষয়তত্ত্ব, এমন কি, শুভাশুভ লক্ষণ সহ ভূমিতত্ত্ব।

রাখালের পিতা হিসাবী লোক, ভাবিলেন, পুত্র যখন সাধুর নিকট সুখে আছে, আর যখন লেখাপড়া শিখিয়া ধনার্জন করিতে হইবে না, তখন ব্যয় করিয়া কলিকাতায় বাসা রাখা অনাবশ্যক, বরং সাধুসঙ্গে সৎস্বভাব হইলে, ভবিষ্যতে অযথা অর্থ নষ্ট করিবে না। এও একটা বিশেষ লাভ। পুত্রকে দেখিতে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন এবং দেবালয়ের বিবিধ প্রসাদে পরিতোষ করিতেন; অভিপ্রায় যাহাতে তিনি রাখালকে না লইয়া যান। পুত্রের আনন্দভাব দেখিয়া বলেন—আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, এখানে থাকিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না; সুতরাং লইয়া যাওয়া অনাবশ্যক ভাবিয়া চলিয়া যান।

ঠাকুর বলেন—রাখালের কি সুন্দর বালকভাব, খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে আমার কোলে বসে মাই খায়! দাঁড়িয়ে থাকলে জাপটে ধরে আহ্লাদে হো হো করে। আলাদা শুলে ভয় পাবে বলে আমার বিছানাতে রাখি, ঘুমের ঘোরে এক দিন আমার গায়ে মুতে ফেলেছিল। সকাল-সন্ধ্যায় হরি বলে হাত তুলে এমন সুন্দর নৃত্য করে—দেখে বোধ হয়, যেন ব্রজের রাখাল ব্রজের ভাবে মাতোয়ারা। নিজের জন্যে কিছুই নিতে পারিনে, রাখালের জন্যে কিন্তু কালীঘর হতে মাখনপাতাটা নিয়ে আসি। খেতে দিয়ে দেখি,

গোপাল যেন খাচ্ছে। ব্রজের রাখাল হলে কি হয় রে! মানুষ তো বটে, অন্তরে একটু ঈর্ষা আছে। মা কালীকে জানাই, যাতে প্রকৃত ব্রজের রাখাল হয়। এক দিন ভাবছি, এখন তো বেশ বালকভাব, স্ত্রীসঙ্গ হলে হয়তো এমনটি থাকবে না; এমন সময় দেখি, তার স্ত্রী মার সঙ্গে এসেছে আমাকে প্রণাম করতে; বেশ করে দেখলাম—মেয়েটি বিদ্যাশক্তি, এর দ্বারা রাখালের অপকার হবে না, তখন নিশ্চিন্ত।

বলরামের সঙ্গে বৃন্দাবন গেলে, অসুখ শুনে বড়ো ভাবনা হয়, পাছে পূর্বের ভাব উদ্দীপন হলে শরীরটে ছেড়ে দেয়, মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করি, যেন রাখালকে বাঁচিয়ে রাখেন। বৃন্দাবন হতে প্রত্যাগত হইলে আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া কহেন—এর নাম রাখাল—আমার গোপাল, এর কথাই বলতাম। রাখালচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। নবকুমারকে প্রভুর শ্রীপদে অর্পণ করিতে আনিলে ঠাকুর শিশুটিকে বক্ষে রাখিয়া বলেন—এটি পৌত্র। আবার শ্রীমাতৃদেবীকেও বলিয়া পাঠান টাকা দিয়ে পৌত্রমুখ দেখিতে হয়।

ভক্তসঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন কতিপয় রেখাপাত করিয়া কহেন—এইটি আমি, আর ছোটো-বড়ো এইগুলি নরেন্দ্র আদি ভক্তবৃন্দ। রাখালের নাম না করায়, জিজ্ঞাসিলে নিজ রেখা অপেক্ষা একটি বৃহত্তর রেখা টানিয়া কহেন—এইটি রাখাল। সকলে বিস্মিত হইলে বলেন—তোমরা শিষ্য, রাখাল পুত্র, তাই আমার চেয়ে বড়ো। পরে সকলেই দেখিয়াছেন প্রভুর কৃপায় রাখালরাজ সকল বিষয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

প্রভুর নিকট অবস্থান এবং তাঁহার বাৎসল্যে লালিত রাখালের অন্তরে ও বাহিরে ঠাকুরের প্রতিবিম্ব (ছাপ) পড়িয়াছিল। গুরুপুত্র গুরুতুল্য, বাস্তবিক এই প্রবাদটি রাখালরাজে প্রতিফলিত। ব্যায়ামশীল হইলেও কোমলের সন্নিধানে, কোমল পরশে ও কোমল চিন্তায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সকলই ঠাকুরের মতো কোমল হইয়াছিল। আবার কীর্তনানন্দে বিভোর হইলে তাঁহার নৃত্যকলাদি ঠাকুরের অনুরূপ দেখিয়া মনে হইত—যেন প্রভুই নৃত্য করিতেছেন।

এমন জপসিদ্ধ মহাপুরুষ সহসা দেখা যায় না। জপযজ্ঞ যেন তাঁহার স্বভাবজ হইয়াছিল, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, অন্তর্মুখী চিত্তে করপর্বে অবিরাম জপ। প্রভুর লীলাবসানে ব্রজধামে অবস্থানকালে দিবারাত্র জপনিরত থাকিতেন। বলেন—দৈবযোগে যদি কোনো রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িতাম, যেন কে একজন অশরীরী জাগ্রত করিয়া বলিত—জপে অবহেলা করিলে নিপাত করিব। আবার ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইলে মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইত।

কোনো এক ভক্ত ভূমি ক্রয় করিয়া জানাইলে কহেন—যেরূপ শুনিলাম, বোধ হয়, উহা তোমার কল্যাণকর হইবে; এই এই লক্ষণ থাকিলে ভূমিদেবী প্রসন্ন হন বলিয়া ভূমির শুভাশুভ লক্ষণ বিবৃত করেন। ধর্মতত্ত্ব ও নৃচরিত্র অবধারণে তোমার অভিজ্ঞতা জানি, কিন্তু ভূমিতত্ত্বে কিরূপে পণ্ডিত হইলে? তখন সহাস্যে কহেন—সর্বজ্ঞ প্রভুর কৃপায় সকল তত্ত্বই অল্পবিস্তর জানিতে পারিয়াছি। বালকভাবে থাকিলেও লোক চরিত্র অবধারণে অদ্বিতীয়; দেখিবামাত্রই বলিতে পারিতেন—ইহার এই গুণ ও এই দোষ; কিন্তু এইরূপ আচরণ করিলে দোষ গুণে পরিণত হবে। অনেক সময় দেখিয়াছি—ঠাকুরের ভক্তগণের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিতেন, তবে প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না, পাছে তাদের মনঃকষ্ট হয়, বরং প্রার্থনা করিতেন—যাহাতে কল্যাণ হয়।

বাক্যবিস্তারে বক্তৃতাদান ভালোবাসিতেন না; বরং দু-পাঁচজন আগন্তুক দেখিলেই

ভয়ে জড়সড় হইতেন ; কিন্তু রহস্যচ্ছলে এমন সারগর্ভ কথা কহিতেন, যাহাতে শ্রোতারা চিরদিনের মতো আকৃষ্ট হইত। বলিতেন, ধর্ম কথার কথা নয়, আচরণের বিষয়, আচরণ-শীল ব্যক্তি কদাচিৎ মিলে। অসাধারণ দীনভাব। বলিতেন, ভগবান কত মহান, আর অতি ক্ষুদ্র আমি কেমনে বলিব যে তাঁকে লাভ করিব ? তিনি যদি দয়া করে দেখা দেন, তবেই জন্ম সার্থক হবে।

শিরোমণি হইয়াও অহমিকাহীন। আবাল-বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে সমভাব, ও ক্রীড়া-কৌতুকে আনন্দ। সাত আট বৎসর বালকদের মুখে শুনিয়াছি, রাখাল মহারাজ বেশ লোক, আমাদের সঙ্গে কত খেলা করেন। এত রহস্যপ্রিয় কেন ? বলিতেন—আনন্দই ব্রহ্ম, রহস্যতেও তাঁহার আনন্দকণার স্বাদ পাই। ভগবানকে কয়জন বা চায় ! আর আমিই যখন বুঝি না, তখন অপরকে কি বুঝাব। বালস্বভাব বশতঃ ক্ষণিকে ভয় ক্ষণিকে আনন্দ। অল্পেই তুষ্টি এবং সহজেই বিস্মৃতি, কেবল কৌতুকপ্রিয়। লোকনিন্দার ভয় কখনও মনে জাগে নাই, কেবল আনন্দ ও তৎপ্রকাশক মৃদু মধুর হাসি ; রাগ হইলেই গম্ভীরপ্রকৃতি। এই সমস্ত দেখিয়া এক ভাবুক পণ্ডিত বলেন—বহু দেশ ভ্রমেছি এবং বহু সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু এমন পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতো মহাপুরুষ কোথায়ও তো দেখি নাই।

যজ্ঞেশ্বর বলিয়া বড় যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন—দু বেলা যজ্ঞ, হালুয়া-যজ্ঞ, সন্দেশ-যজ্ঞ ইত্যাদি।—ভক্ত, অভক্ত, সাধু, অসাধু, সকলকে আবাহন করিয়া আনন্দ ; বলিতেন, শুকনা কথায় ধর্ম হয় না, যজ্ঞেতে ভগবানের সত্তা আছে, তাই প্রসাদ লইয়া আনন্দ করুক। যখন যে স্থানে থাকিতেন, এই যজ্ঞচ্ছলে বহু লোকের অন্তরে ভগবদ্ভাবের উদ্দীপন করিতেন। দুর্গাপূজায় বিশেষ উৎসাহ ; সুদূর হরিদ্বার বা দাক্ষিণাত্য যেখানে থাকিতেন, কলিকাতা হইতে প্রতিমাদি আনাইয়া দেবীযজ্ঞে সকলের অন্তরে দুর্গাভক্তির উদ্বোধন করিতেন।

যেমন অপূর্ব যোগী, ত্যাগীও তেমনই। তবে রাজা বলিয়া বা বালক বলিয়া কখনো কখনো বাহ্যাড়ম্বর ভালোবাসিতেন। গুরুপুত্রকে গুরুবৎ জ্ঞানে নরেন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ সমগ্র মঠ ও মিশন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেও কোনো দিনও উহার কপর্দক মাত্র নিজ অভিপ্রায়ে গ্রহণ করেন নাই ; বলিতেন, এ সমস্তই দেবোত্তর, ভগবান, ভক্ত ও শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্পিত। প্রভুর কৃপায় যখন অচ্যুত গোত্র অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়াছি, তখন বৈভব ভোগ রৌরব তুল্য। অধিপতি হইয়াও সদাই সন্ত্রস্ত, পাছে প্রভুর সন্তানরা কোনো রকমে ক্ষুব্ধ হয়।

প্রেমস্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল বলিয়াই জীবে প্রেম অর্থাৎ সকলকে ভালোবাসাই তাঁহার স্বভাব ছিল : এবং এই ভালোবাসাতেই মঠ, মিশন ও ঠাকুরের ভক্তগণ অন্তরে স্নেহের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লোকদৃষ্টিতে যদি কেহ দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত, তাড়নার পরিবর্তে প্রেমের শাসনে অর্থাৎ রঙ্গরস-কৌতুকে মহারাজ তাহাকে সংশোধন করিতেন।

নিয়তির খেলা বুঝা ভার। যে পরমান্ন অমিতাভের প্রাণদায়ক হয়, তাহাই রাখাল-রাজের প্রাণনাশক হইল। প্রাতঃভ্রমণচ্ছলে ভক্তগণের সংবাদ লইয়া বলরাম মন্দিরে ফিরিলে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন। ঠাকুর বলেন, মুলো খেলেই মুলোর ঢেঁকুর উঠে, তাই বিষয়ী লোক বিকার অবস্থায় বিষয় সম্বন্ধে যে আবোল-তাবোল বলে, তাহাই

প্রলাপ। নির্বিকার রাখালরাজ আজীবন যে ব্রহ্মবস্তুর আলোচনা করিয়াছেন, প্রাণান্ত-কালে প্রসন্ন চিত্তে তাই বলিতেছেন—ব্রহ্মবস্তুই প্রকৃত বস্তু আর সব অবস্তু, যৎশ্রবণে চিকিৎসক, সেবক ও দর্শক সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া বলে—ব্রহ্মানন্দ নামের সার্থকতা হইল। আবার চিরাচরিত তিতিক্ষা-প্রভাবে বলিতেছেন—সহনং সর্বদুঃখানাং অপ্রতিকার-পূর্বকম্। চিন্তা-বিলাপরাহিত্যং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ পাঠক! এখন চিন্তা কর—কেহ কি ঈদৃশ মহাপুরুষের দর্শন বা তাঁহার মতো চরিত-গাথা শ্রবণ করিয়াছ? প্রভু বলিতেন—রাখাল কৃষ্ণসখা! তাই প্রাণসখাদর্শনে, উল্লাসে বার বার বলিতেছেন—আহা কৃষ্ণ গোবিন্দ কি সুন্দর! তোমাদের চোখ থাকে তো দেখ। বলিতে বলিতে তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দে সেই পরাৎপর কৃষ্ণ গোবিন্দে বিলীন হইল। বোধ হইল মোহন মূরতিখানি যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

(৩) বাবুরাম—প্রেমানন্দ

পশ্চিমাঞ্চলের কোনো কোনো গরীব গৃহস্থ অভ্যুদয় কামনায় একটি পুত্র সন্ন্যাসীকে অর্পণ করে; এই হেতু ঐ দেশে অনেক সন্ন্যাসী। কিন্তু দেখা যায়, বাবুরাম ভায়ার জননী (এমন ভক্তিমতী নারী সংসারে বিরল) ঠাকুরের ভিতর ইষ্টদেবতার দর্শনে কৃতার্থা হইয়া, তাঁহার সেবার জন্য মধ্যম পুত্রকে সমর্পণ করেন।

মহাপ্রভুর পার্শ্বদ অভিরাম গোস্বামী মহাশয়ের জন্মভূমি বলিয়া হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রাম শ্রীপাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই আঁটপুরেই বাবুরামের জন্ম। অনেক প্রাচীন মন্দির এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনে পূর্বকালের এক বৃহৎ নদী (যাহার গর্ভ হইতে জাহাজের মাস্তুলাদি পাওয়া গিয়াছে) বর্তমানে কাণা নদী হইয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। এক সময় ইহা সমৃদ্ধিশালী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল; অদ্যাপিও এখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও বহু তন্তুবায়ের বাস। বড় ঘোষ বংশে জন্মিয়া এবং জননীর গুণগ্রামের অধিকারী হইয়া বাবুরাম হৃদিবান, দাতা ও মহাভক্তিমান ছিলেন।

যখন বৃন্দাবন বসাকের গলিতে থাকিয়া বাঙালীর অক্ষয় কীর্তি ও আদিম ইংরেজি স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে এনট্রান্স পড়েন, তখন ভগিনীপতি ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর ভবনে ঠাকুরের পুণ্য দরশন পান। ঠাকুর বলিতেন, পূর্বদিকে যাইলে পশ্চিমদিক যেমন পিছনে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ পরাবিদ্যা-প্রদাতা প্রভুর করুণায় তাঁর অর্থকরী বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—আমার মুখে শুনে, অতিশয় বিমর্ষ হইলে প্রভু কহেন—পাশ একটা বন্ধন, আশীর্বাদ করি, তুই পাশ-মুক্ত হয়ে যা।

আমরা তামাক খাইতাম জানিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেন—কলিযুগে একটা নেশা করতে হয়; বাবুরামের কিন্তু একটা নূতন রকমের নেশা ছিল—সেটা খবরের কাগজ পড়া; আহারান্তে প্রত্যহ চাই, তবে মধুরতা এই যে, অল্পক্ষণ পড়িয়াই ফেলে দিয়ে বলিতেন—ঠাকুর কহিতেন এসব আধুনিক।

স্কুল ছাড়িবার পর আর কোনো দিনও লেখাপড়ার চর্চা করেন নাই; বলিতেন—এতে সময় নষ্ট না করে প্রভুর আরাধনাই শ্রেয়ঃ। সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ এতই চিত্তাকর্ষক হইত যে, সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিত বলিতেন—জানো তো, আমি তোমাদের মূর্খ ভাই, তবে প্রভু যেমন বলান, তাই বলিয় কৃতার্থ হই।

প্রভুর মঙ্গল আরাত্রিক সমাপনে প্রত্যূষে ধ্যানে নিমগন হইতেন, এবং নবীন সন্ন্যাসীরাও যাহাতে ধ্যাননিরত হয়, এজন্য তাদেরও ডাকিতেন ; তৎপর ঠাকুরের পূজার্চন ও ভক্ত-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। নবীনেরা যাহাতে অযথা কালক্ষেপ না করে, এজন্য সকলকে লইয়া শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন ; কিন্তু বৈকালে প্রভুর জলপানীয় প্রদানান্তে গোকুলের সেবা ও মঠের অন্যান্য কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। আবার সন্ধ্যাসমাগমে সকলকে লইয়া প্রভুর নীরাজন ও স্তোত্র পাঠান্তে ধ্যানে বসিতেন। সময়নিরূপক যন্ত্র (ঘড়ি) একবার পরিচালিত হইলে, যেমন অবাধে চলিতে থাকে, তাঁহার তত্ত্বাবধানে মঠের যাবতীয় ব্যাপার সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইত। সুতরাং বাবুরামই মঠ—এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভক্তসেবা অর্থাৎ ভক্তগণকে প্রভুর সত্তা বিতরণ বাবুরাম-চরিত্রের বিশেষত্ব। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আমাদের প্রসাদ দিয়া বলিতেন—শুকনা কথায় ধর্ম হয় না, এখানকার সত্তা অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণে চিত্তপ্রসাদ হবে। বাবুরামের অন্তরে প্রভুর এই মহাবাক্য এমন বদ্ধমূল হয় যে, সময়ে বা অসময়ে ভক্তসমাগম হইলে আনন্দে প্রভুর সত্তা—প্রসাদ বিতরণে তাদের কল্যাণ করিতেন ; নিষেধ মানিতেন না, বলিতেন—ভক্তসেবায় প্রাণাত্যয়ও সুখকর। কিন্তু হায় ! বাবুরামের অন্তর্ধানে, প্রসাদ-বিতরণে পরাঙ্মুখ মঠ আজ নির্জীবপ্রায়।

নাচে হরিবোল দিয়া কীর্তনানন্দে যখন মাতিতেন, তখন তাঁর কাঞ্চনসম ভাব-বিভোর রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইত। পূর্ববঙ্গে প্রভুর সত্তা বিতরণ করিতে গিয়া প্রাণের আবেগে নিজ সত্তাও (প্রাণ) বিলাইয়া দেওয়ায় প্রাণান্তকর কালাজ্বরে আক্রান্ত হন।

যেমন প্রেমিক যোগী, তেমনি অপূর্ব ত্যাগী। ঠাকুর বলিতেন,—ভোগ না হলে ত্যাগ আসে না, তাই বিত্তবান গেহে সুখপালিত হইয়াও, গৃহত্যাগ সঙ্গে পরিচ্ছদ, পাদুকাও পরিত্যাগ করেন। ধনবান আত্মীয় বিদ্যমানেও কখনো কাহারও নিকট হস্ত প্রসার করেন নাই। কিন্তু মঠে যাইবার সময় ভক্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া (তাদের কল্যাণ-জন্য) ঠাকুরের নিমিত্ত মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেন, বলিতেন, শুধু হাতে গেলে ঠাকুর কি মনে করিবেন ? তিনি তো আর আমাদের মতো ছবি দেখতেন না, প্রত্যক্ষই দেখতেন। তবে বিসূচিকা রোগমুক্তির পর আমাদের অনুরোধে চটি-জুতা ও হাতকাটা জামা পরিতে রাজী হন। সেও প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে। তাঁহার জীবন অভিধানে সঞ্চয় বলিয়া কোনো পদ ছিল না, ভক্ত কর্তৃক ফল মিষ্টান্ন আনীত হইলে বলিতেন—প্রভুর ভোগ দাও, আর ভক্ত সেবা কর। ঠাকুর কহিতেন—আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকের গোবিন্দ আছে। অতএব সঞ্চয়ে আত্মবঞ্চন করিও না।

গোপালদাদার (অদ্বৈতানন্দের) তিরোভাবে মহোৎসব অর্থাৎ প্রভুর ভোগ দিয়া ভক্তসেবা উদ্দেশ্যে ভিক্ষায় উপস্থিত হইলে, মনে হয়েছিল—ঠিক যেন মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাসের মহোৎসব জন্য ভিক্ষায় আসিয়াছেন। দৃশ্যটি ভুলিবার নহে।

প্রভু বলিতেন—বাবুরাম ঈশ্বর কোটি অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, শুদ্ধ সত্তা, নিকষ কুলীন, শ্রীমতীর অংশ। ভাবের আবেগে অঙ্গবৈকল্য ঘটিলে, অপর কেহ স্পর্শ করিতে গেলে হুঙ্কার করে উঠতেন, কিন্তু বাবুরাম অঙ্গসংস্থানে সমুদ্যত হইলে প্রভুর ভাব ভঙ্গ হইত না। পাঠক এখন ভাব, বাবুরাম [illegible] মানব না দেবতা।

(৪) যোগীন্দ্রনাথ—যোগানন্দ

নামে তালপুকুর কিন্তু ঘটি ডোবে না, এমন এক সাবর্ণচৌধুরী বংশ-সম্ভূত, অবস্থান দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। পড়াশুনা তেমন না থাকায় নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা করিলেও সরল ও সত্যনিষ্ঠ। পুষ্প চয়ন ও গঙ্গাস্নান জন্য নিত্য দেবালয়ে আসিতেন। তাঁহার উদাসভাব, ঊর্ধ্বদৃষ্টি ও সন্ধ্যাপূজায় নিষ্ঠা দর্শনে ঠাকুর বড়ই প্রীত হন, এবং আত্মজন বলিয়া গ্রহণ করেন।

বুদ্ধির দৌড়ে মনে ভাবেন, সারাদিন দেবভাবে থাকিলেও রাত্রিকালে পত্নীকে স্থান-দান অসম্ভব নয়। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ঠাকুর কহেন—সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। যোগীন বলেন—সেই দিন হতে আমি যে বুদ্ধিমান, এ ভাবটা ঘুচে যায়। মাতার আগ্রহে বিবাহ করিয়া, লজ্জায় অনেক দিন ঠাকুরের নিকট আসেন নাই। পুনঃ পুনঃ আহ্বানে একদিন আসিয়া ম্লানমুখে বসিয়া থাকিলে প্রভু কহেন—বিবাহ করেছিস, দোষ কি ? দশবিধ সংস্কার মধ্যে বিবাহও একটি সংস্কার ; আচার্য হতে গেলে দশবিধ সংস্কার আবশ্যক।

ইতস্ততঃ অবস্থিত সন্তানদের সংঘবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে প্রভুর দিব্য দেহে রোগের অবতারণা ; তাই ইষ্টদেবের সেবাকল্পে গৃহ ত্যাগ করেন। বিশেষতঃ মাতৃদেবীর সেবায় প্রাণপাত করায় শ্রীমা ইঁহাকে সর্মাধক স্নেহ করিতেন।

যেমন কঠোর তপস্বী, তেমনই অসাধারণ সংযমী। ৺কাশীধামে তপস্যাকালে প্রায় ছয় মাস কাল জলপান করেন নাই ; ভিক্ষান্নে ক্ষুৎনিবারণ করিয়া একটি গুম্ফায় জপ-ধ্যানে কাল কাটাইতেন। প্রভুর শ্রীনাম জপ কেবলই যে মুক্তিপ্রদ, এমত নহে, উহাতে আধিভৌতিক বিপদও নাশ হয়। বলেন, দণ্ডীবাড়ায় অবস্থানকালে এক অশরীরী জীব (প্রেত) এক রাত্রে বুকে বসিয়া প্রাণনাশের প্রয়াস পাইলে, জয় রামকৃষ্ণ নাম করায়, প্রেত সন্ত্রস্ত হইয়া বলে,—আর তোর কাছে আসব না ; আজ হতে এ স্থান তোরেই হইল।

উগ্র তপস্যায় এক দিকে অন্তরে যেমন ভগবৎপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে রক্তমাংসের দেহ ভাবাবেশ ধারণে অসমর্থ হওয়ায় রসাভাবে উদরস্থ নাড়ীতে ক্ষত হইলে উহাতেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

(৫) নিত্যনিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ

সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের ভাগিনেয়, বারাসত অঞ্চলে কোনো ঘোষবংশজাত। সরলতা ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তি, কিন্তু ক্রোধ হইলে রুদ্রসম। ঠাকুর বলিতেন—সতের রাগ জলের দাগ। তখনকার শিক্ষিত সমাজে (spiritualism) ভূত নামানো ধর্মাঙ্গ বলিয়া আদৃত ছিল, নিরঞ্জন ইহাতে সিদ্ধ। উহা পরিত্যাগের পর প্রভুর কৃপা লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—নিরঞ্জনকে দেখলে রামচন্দ্রকে মনে পড়ে।

নীলকুঠীতে কর্ম করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর দুঃখিত হন। অনেক দিনের পর আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলে প্রভু অভিমানে কহেন—যাও সাঁখ ! গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। মার সেবার জন্য চাকরি করতে গেছ শুনে খুশি হলাম ; যদি নিজের জন্য যেতিস, তোর মুখ দেখতে পারতাম না।

কাশীপুর বাগানে জল গরম করিতে অনেক কাষ্ঠ অপচয় করিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর বিরক্তি বোধ করেন। নিরঞ্জন নাছোড়বান্দা ; বড় এক হাণ্ডা জল গরম করিয়া সম্মুখে

ধরিয়া দিয়া বলেন—আমার এত বুদ্ধি নাই যে, কতটা জল আপনার দরকার বুঝিব; যখন আপনার জন্য আনিয়াছি, লইতেই হইবে। তাঁহার এই সরলতায় ও নির্ভীকতায় প্রভু বড়ই প্রীত হন।

দাক্ষায়ণীর জন্মস্থান মায়াপুরীতে (কনখলে) বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন।

(৬) সারদাপ্রসন্ন—ত্রিগুণাতীত

বাল্যস্বভাব মেধাবী সারদার জন্ম কলিকাতায়। এনট্রান্স পাশের পর শ্যামপুকুর ভবনে প্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হন। এল্.এ. পড়িবার সময় কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করায়, পিতৃপীড়নে গৃহত্যাগে বাধ্য হন। যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবদোপাসনা করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে ঠাকুর তাহাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠায়ে দেন। তপস্যায় সিদ্ধকাম হইয়া কাশীপুরে প্রত্যাগত হন এবং মাত্র তিন মাস কাল পড়িয়া এল. এ. পাশ করে পিতাকে কহেন—পড়িবার ভয়ে গৃহত্যাগ করি নাই।

বরাহনগর মিলনমন্দিরে অবস্থানকালে একটি কদলী খাইয়া নিত্য লক্ষ মন্ত্র জপ করিতেন। নানা তীর্থ পর্যটনান্তে তিব্বতে মানস সরোবর ও শ্রীকৈলাস দর্শন করিয়া আলমবাজারে প্রত্যাগমন করেন। স্বামীজীর আদেশে প্রভুর ভাব প্রচার জন্য উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং অমানুষিক অধ্যবসায়ে অল্পকালমধ্যেই ইহাকে শ্রেষ্ঠ মাসিকে পরিণত করেন।

সারদাচরিত আশ্চর্যময়। পাছে ভক্তকে বিব্রত করা হয়, এজন্য ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষের ভবনে মাত্র দুইখানি রুটি খাইয়া বৎসর যাবৎ ১৫।১৬ ঘণ্টা লেখাপড়া ও ছাপাখানার কার্য পরিচালনা করিতেন; আবার ইচ্ছা হইলেই চার পাঁচজনের ভোজ্য ভক্ষণে অস্বস্তি বোধ করিতেন না। পৌষমাসের শীতে একখানি পাতলা উড়ানী আবরণে আনন্দে থাকিতেন; আবার কখনো বা দু'তিনখান কম্বল আচ্ছাদনেও শীত ঘুচিত না, বলিতেন, আরও চাপা দাও। রক্ত আমাশয়ে বার্লির ব্যবস্থা হইলে, ভক্তভবনে প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজনান্তে ডাক্তারকে বলেন—অতি ভোজনেই রোগ ভালো হয়েছে। আবার কম্পজ্বরে স্নান করিয়া প্রচুর খাইয়া কহেন—এখন সুস্থ হইলাম। মনোবিজয়ে এরূপ অদ্ভুত শক্তি সহসা দেখা যায় কি না সন্দেহ। নামে ত্রিগুণাতীত, কাজেও তাই, যেন বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। বিদ্যালয় ছাড়ার পর কবে যে শাস্ত্র চর্চা করেন, তাহা কেহ জানে না, কিন্তু তাঁর মুখে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত হন; আবার বিস্মৃতির উদয়ে ইংরেজি বাংলা সব ভুলিয়া গিয়া যেন একটি আকাট মূর্খ; ঢং নয় স্বাভাবিক। সময়ে সর্ববিদ্যার স্ফুরণ, সময়ে বিস্মরণ। ইহারই নাম সম ও বিষমভাবের আশ্চর্য মিলন।

মার্কিন দেশে ইনিই প্রথমে প্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভূমিকম্পে পার্শ্বস্থ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইলেও মন্দিরের অনিষ্ট ঘটে নাই দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হয়। ইহার পূত চরিতে সকলেই আকৃষ্ট। জীবন যেমন আশ্চর্যময়, মরণও তদ্রূপ। ভগবৎমহিমা কীর্তন শ্রবণে যখন সকলে মুগ্ধ, তখন কি জানি, কাহার প্রেরণায় এক বাতুলের গুলীতে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। উন্মাদ ধৃত হইয়া বলে—মহাপুরুষনিধনে স্বর্গলাভ ধারণায় এ কার্য করিয়াছে।

(৭) তারকদাদা—শিবানন্দ—মহাপুরুষ

আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, সুতরাং নমস্য। পিতা ৺রামকানাই ঘোষাল, বারাসত আদালতের মোক্তার হইলেও সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ও দানশীল ছিলেন। ঠাকুরকে ভালোবাসিতেন বলিয়া মহাভাবাবস্থায় গাত্রদাহ হইলে নিরাময় বাসনায় একখানি কবচ ধারণ করায়ে দেন।

দাদা বিবাহিত ছিলেন এবং এক জাহাজ কোম্পানির অফিসে কর্ম করিতেন; কখন স্ত্রীবিয়োগ হয় বা কখন অফিস ছাড়িয়া দেন, বলিতে পারি না, যেহেতু আমাদের বহু পূর্বে প্রভুর কৃপা লাভ করেন। যিনি সকল ভক্তকেই স্নেহ করিতেন, তিনি যে বন্ধুপুত্রকে আদর করিবেন না, ইহা কি সম্ভবে? তবে কপালদোষে বা যে কারণে হউক, রামদাদার মাসতুতো ভাই নিত্যগোপালের (ঠাকুর যাকে বলিতেন—এখানকার নয়) এতই অনুরক্ত হন যে, ছায়ার মতো তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেন। দেখেছি নিত্যগোপালের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আসিতেন, দাঁড়ালে দাঁড়ান, বসিলে বসিতেন এবং নিত্যগোপাল ঠাকুরকে প্রণাম করিলে তবে প্রণাম করিতেন। বস্তুতঃ নিজ অস্তিত্ব লোপ করিতে ইঁহার মতো সহসা অন্য কাহাকেও দেখা যায় না।

ঠাকুর যখন কাশীপুরে, তখন একদিন আসিয়া আবার নিত্যগোপাল সঙ্গে গমনোদ্যত হইলে, নরেন্দ্রনাথ কহেন কি মশাই? এখনও সোনা ফেলে আঁচলে গেরো? অগত্যা কাশীপুরে রহিয়া যান ও এই আচরণে নরেন্দ্রনাথ মহাপুরুষ নাম দেন। যদিও কোনো দিনই ইঁহাকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখি নাই, কিন্তু সেবকগণকে আনন্দদান মানসে তাদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন এবং সুকণ্ঠে গীত করিতেন।

বহির্বিষয়ে ব্যস্তভাব দেখাইলেও, দাদা অন্তরে ধ্যাননিরত: তবে উপবেশন না করিয়া শায়িতভাবে, যেন কালিমাতার পদতলে শবশিব। বিদ্রুপচ্ছলে নরেন্দ্রনাথ বলিতেন—দাদা ছাড়াচ্ছেন অর্থাৎ দেহাদিভাব পরিহার করছেন। দাদা গিয়ে শিবানন্দ নাম গ্রহণ করেন বলিয়াই, বরানগর মিলনমন্দির ছাড়িয়া যখন তখন কাশী যাইতেন তাতে নরেন্দ্র বলিতেন—দাদার যে কটা টাকা ছিল, রেল কোম্পানির পেট ভরালেন।

এক দিন যাঁর কঠোর তপস্যায় অসম্ভব সম্ভব, অর্থাৎ কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। কালবশে তাঁর বিকারজনিত বার্ধক্যে অসম্ভবও সম্ভব হইল। অর্থাৎ ভেদ সূত্রে সাধের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে ভাঙ্গন ধরিল, এবং মাতৃদেবীর মন্দিরেরও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইল। আবার বেলুড় মঠে তাঁহারই অবস্থানকালে প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্থিত অর্চিত কবচ, এবং প্রকৃতিভাব সাধনে ভক্তপ্রদত্ত প্রভুর ব্যবহৃত বারাণসী ওড়নাও অপহৃত হইল। এ দুর্ভাগ্য কেবল মহান্তের নয় সমগ্র ভক্তকুলের।

শিবানন্দ হৃদয় স্বচ্ছ হইলেও প্রাকৃতিক বর্ণসম্পাতে সময়ে সময়ে রঞ্জিত হইত। দাদা একটা বিষম ভুল করেছেন বলে মনে হয়—বঞ্চাসূত্রেই অমানী ও অকর্তা হইয়া যদি মঠ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন, হয়তো সকল দিক বজায় হতে পারিত; এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মহত্ত্বও শতগুণ বর্ধিত হইত; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাবে?

শেষ দশায় অবাঞ্ছিত ঘাত-প্রতিঘাতে মানসিক উত্তেজনায় অর্ধসন্ন্যাস আক্রমণেও (mild appoplexy) বৎসরকাল বহু লোককল্যাণ করিয়া সান্নিপাত রোগে প্রভুর জন্মমহোৎসবের এক দিন পরে অর্থাৎ ১৩৪০ এর ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বিশ্রামযাত্রা করিয়াছেন।

(৮) গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ

এবার যাঁর কথা বলিব, তিনি মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ, নাম গঙ্গাধর, ধাম বলরাম মন্দির সন্নিকট, বাল্যাবধিই বৈরাগ্যবান, অল্প বয়সেই প্রভুর কৃপা লাভ করেন। প্রাচীন কুলাচার্য-বংশোদ্ভব গুণে অল্পাধিক প্রগল্ভ হইলেও নিষ্ঠা ও সরলতা জন্য সকলেরই প্রিয়। যখন তখন দক্ষিণেশ্বর, এবং ঠাকুরের অসুখের সময় কাশীপুর উদ্যানে যাইলেও, আচার-ব্যাধিতে কোনো দিনও তথায় অবস্থান করিয়া সেবা বা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, আচারীর আচার ভগবান রক্ষা করেন।

প্রভুর লীলাবসানে সন্ন্যাস গ্রহণে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে দুর্গম মানস সরোবর ও শ্রীকৈলাস দর্শনে ইঁনিই সর্বপ্রথম তিব্বতে যান, এবং অনেককাল তথায় অবস্থান করেন। সংবাদাদি না পাওয়ায় আমরা ভাবি, গঙ্গাধর হয়তো মারা পড়িয়াছে। বেশভূষা ও ভাষাবৈচিত্র্যে তিব্বতীয়দের এবং সরকার বাহাদুরেরও সন্দেহভাজন হন। পরে বাঙালী সন্ন্যাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে অব্যাহতি পান।

দারিদ্রপালিত বলিয়াই পরদুঃখ দর্শনে হৃদয় ব্যথিত হইত, এ জন্য অনেক সময় আত্মকল্যাণ উপেক্ষা করিয়া দুঃখার্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন; তাই ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাথ বালক পালনে মুর্শিদাবাদ—সারগাছী গ্রামে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারই আদর্শে অধুনা কলিকাতায় ও অন্যত্র অনাথালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যদি পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অনুকরণে পদগৌরব রক্ষা করিতে পারেন, তবেই সুখের, নতুবা বিড়ম্বনা।

(৯) হরিপ্রসন্ন—বিজ্ঞানানন্দ

কাঠামো বাঁকা হলে কিছুতেই শোধরায় না, তার সাক্ষ্য হরিপ্রসন্ন। বিজ্ঞান পড়লেন, ইঞ্জিনিয়ার হলেন, আবার আকাশের তারা গুণতে ওস্তাদ হলেন, তবু বালক-স্বভাব ঘুচিল না; আর ঘুচবেও না। অনেক দিন না আসায়, ঠাকুর এক দিন জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁ রে! বেলঘরে হতে যে ক্ষয়াক্ষয়া কালো রঙের টগরা বামনের ছেলেটা আসত, তার খবর জানিস? শরৎ বলেন—সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বোম্বাই গেছে, উদ্দেশ্য মায়ের খাওয়া পরার একটা ব্যবস্থা। মাতৃসেবায় কৃতসংকল্প শুনিয়া ঠাকুর খুশি হন।

যখন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হইয়া এটোয়াতে থাকেন, তখন দৈবযোগে অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে দিনকতক আটকায়ে রাখেন, অভিপ্রায়—প্রভুর লীলানুশীলন, এবং তাঁহার সন্তানদের সংবাদ গ্রহণ। অতুলবাবু বলেন, যদি কেউ ঠাকুরের খেই পেয়ে থাকে, অর্থাৎ ঠাকুরকে বুঝিয়া থাকে, সে হরিপ্রসন্ন। অর্থার্জন করেও অনাসক্ত, মাকে অর্ধেক পাঠিয়ে, বাকি অর্ধেকের বেশীর ভাগ জীবশিবসেবায় ব্যয় করে। অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। কামিনীকুলকে এতই শ্রদ্ধা যে, মাথরাণীকে দিয়ে ময়লা ঘাটায় না; উচ্চপদস্থ হয়েও সকলের সঙ্গে সমান ও সদয় ব্যবহার।

আমরা ভেবেছিলাম—হরিপ্রসন্ন হয়তো ঠাকুরকে ভুলে গেছে; এখন তার কীর্তিকলাপ শুনে হুঁশ হল—প্রভু যাকে কৃপা করেছেন, সে কি তাঁকে ভুলতে পারে? ঠাকুর বলিতেন—ঢোঁড়া সাপে কাটলে মরে না, কিন্তু জাত সাপ কেউটে গোখরায় কাটলে নিস্তার নেই। তাই দেখি, কত কালের পর সর্বত্যাগী হয়ে বেলুড়মঠে উপস্থিত।

মঠ-ভবন এবং স্বামীজীর মন্দির গঠন—তাঁর কার্যপটুতার পরিচয়। এলাহাবাদে

আশ্রম স্থাপনে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রকাশে অনেকের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছেন। চোখ বুজে মিটমিটে হাসি আর তার ছেলেমানুষি কথাগুলি যেন প্রাণে গাঁথা আছে। প্রভু চিরদিনই তাকে বালক রাখুন। এখন তুমি মঠের সহকারী মহান্ত, পদ পেয়ে স্বভাবটি না বদলায় ইহাই প্রার্থনা।

(১০) কালী—অভেদানন্দ

অর্থ জোযণায় সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করা বৈশ্য বর্ণের সারধর্ম। পরমার্থ অর্জন তৎপর বুদ্ধিমান কালী এই বৈশ্যকুলের মুকুটমণি। নিমু গোস্বামীর গলিতে ৺রসিকচন্দ্র আলয়ে জন্ম। অতি প্রাচীন ইংরেজি বিদ্যালয় গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িবার সময় প্রভুর কৃপালাভ করেন।

ঠাকুর বলিতেন—কালীর ভুরুদুটি কেষ্টঠাকুরের মতো, তাই ওকে দেখলে কেষ্ট মনে পড়ে। ছোঁড়াটা খুব ভাগ্যবান, ...া দেবদেবী দর্শনের পর বৈকুণ্ঠ দর্শন পর্যন্ত হয়ে গেছে ; অর্থাৎ পূর্বজ অবতারগণকে এখানকে (তাঁর দিব্য দেহ) বিলীন হতে দেখেছে।

ইঁহার সেবায় ও সুশৃঙ্খল কার্যধারায় ঠাকুর বড়ই প্রীত। এখন বয়সধর্মে যাই হোক, যৌবনে ইঁহাকে তিতিক্ষার মূর্তি বলিলেও দোষ হয় না ; যে হেতু রোদ বাত ঝঞ্ঝায় অবিচলিত হইয়া প্রাপ্তব্য লভ্য অশনবসনে পরিতুষ্ট। বেদান্ত বিচার ও ধ্যানধারণায় চারি পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত করায়, বরানগর মিলনমন্দিরে সকলে ইঁহাকে কালী তপস্বী বলিত। মেধা ও পাণ্ডিত্য- মণিকাঞ্চনযোগে, ধর্মতত্ত্ব অবধারণে সুদক্ষ, তজ্জন্য ইঁহার ধর্মব্যাখ্যা চিত্তাকর্ষক। গৃহে অবস্থান করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিত হইতে পারিতেন বটে, কিন্তু প্রভুর কৃপায় উপাধিবর্জিত হইয়া গৌরবভাজন হইয়াছেন। তবে অত্যধিক বেদান্তচর্চায় যেন অল্পবিস্তর আত্মসর্বস্ব ও নির্লিপ্ত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হইলেও, লোকদৃষ্টিতে যেন—গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়।

ধর্মপ্রচারকল্পে শতাব্দীপাদ মার্কিণে অবস্থান হেতু, পাশ্চাত্য রীতিতে অভ্যস্ত হইয়া আপনাকে বিকাইতে কার্পণ্য করায় আমাদের সাধের আশায় নিরাশ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রভুর এবং শ্রীমাতৃদেবীর স্তোত্র রচনায় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ধর্মপ্রাণ ভারতে দেবালয় ব্যতীত আর যত সব আলয় অর্থাৎ শিক্ষালয়, পুস্তকালয়, চিকিৎসালয়াদি পাশ্চাত্য প্রথা তেমন সুখজনক নয় ; বরং নাচে হরিবোলা, অর্থাৎ মুনিবৃত্তিতে শ্রীনামকীর্তন ও ভগবৎমহিমা প্রচার বিশেষ কল্যাণকর, যদি প্রভুর মহাবাক্য শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অনুষ্ঠিত হয় ; অন্যথা ততঃ কিম্ ? প্রভু কালীর কল্যাণ করুন।

(১১) লাটু—অদ্ভুতানন্দ

পরশমণি পরশে কৃষ্ণকায় লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়, শুনিয়াই আসিতেছি ; কিন্তু দেখিয়াছি প্রভুর কৃপা-পরশে গাড়োয়ারী (মেষপালক)-পুত্র লাটু সাধুশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। জন্ম ছাপরা জেলায়, অনাথ অবস্থায় কলিকাতায় আসিলে বদান্য রামদাদা ইঁহাকে পালন করেন, পরে ঠাকুরের পরিচারক আবশ্যক হওয়ায় দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া দেন। বালক দেখিয়া শ্রীমাতৃদেবী ইঁহাকে স্নেহ করিতেন।

পাশ্চাত্য বিদ্যা আবিলে আমরা যেরূপ বিড়ম্বিত, সৌভাগ্যবশতঃ লাটুর সে দশা ঘটে নাই। সুতরাং সরল স্বভাবে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ ভগবান জানিয়া অকৈতবভাবে তাঁহার সেবা করিতেন, এবং তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া ধারণা করিতেন। অগ্নির

সান্নিধ্যে অঙ্গ যেমন উত্তপ্ত হয়, প্রভুর আশ্রয়ে দিন দিন তাঁহার ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি পায়।

ঠাকুর বলিতেন—মূর্খের আর (ভোগলোলুপ) দরিদ্রের ধর্ম হয় না ; কিন্তু লাটু সম্বন্ধে এ বিধান খণ্ডন করেন। অসুখের সময় অভিজাত সেবক দিয়া মলমূত্র মার্জন করানো অনুচিত ভাবিয়া লাটুকে কহেন, লাটু সানন্দে বলেন—আজ্ঞা হাম্‌নি তো আপনার মেস্তর আছি।

শিক্ষিত ব্যক্তিমধ্যে নিরক্ষরের সহজেই একটা সংকোচ সম্ভব ; তাই ঠাকুর লাটুকে প্রথমভাগ পড়াচ্ছেন, বল ক, খ, কিন্তু জন্মগুণে জিহ্বা আড়ষ্ট থাকায় লাটু বলিল, কা, খা। ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—তোর লেখাপড়া হইবে না। প্রভুর কৃপায় লাটুর দিব্যজ্ঞান হয়, এবং তাঁহার সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণে মহাপণ্ডিতগণের শাস্ত্রের জটিল তর্ক সমাধান হইত। সন্ন্যাসদানে স্বামীজী যে অদ্ভুতানন্দ নাম রাখেন, তাহা সার্থক।

যখন আমাদের দিবা, লাটুর তখন রাত্রি ; আর আমাদের যখন রাত্রি, লাটুর তখন দিবা। বসুমতী ছাপাখানার কতিপয় কার্যকরক (কম্পোজিটার আদি) লাটুকে বড়ই শ্রদ্ধা করিত, তাই কর্মাবসানে তাঁহার কাছে আসিলে তাদের ধর্মলাভ জন্য ব্যস্ত হইতেন। শুকনা কথায় ধর্ম হয় না—ঠাকুরের মুখে শুনেছেন বলিয়া, তাদের ছোলা সিদ্ধ ও চা খাওয়াইয়া বলিতেন—ধেন্ কর্ গীতে পড়। এ কারণে তাদের সঙ্গে অধিক রাত্রি পর্যন্ত সদালাপে, ভোরবেলা নিদ্রা যাইতেন।

এমন খেয়ালী মানুষ কেহ দেখেছেন কিনা সন্দেহ। যে পরমারাধ্য মাতাঠাকুরাণীকে চিরদিন পূজা করে এসেছেন, সেই মাতৃদেবী স্নেহবশতঃ তাঁহাকে বলরাম মন্দিরের বাহিরের ঘরে দেখিতে আসিলে, অগ্নিশর্মা হয়ে কহেন—তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, কেন অন্দর বাড়িতে এলে ? হুকুম হলেই তো হাম্‌নি তোমার পাশে হাজির হতাম ; যাও অন্দরে যাও, হাম্‌নি তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। ভাব দেখিয়া শ্রীমা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আবার দেশে ফিরিবার সময় লাটুর কাছে আসিলে, তাঁহাকে সজল-নয়ন দেখিয়া, সাশ্রু-লোচনে শ্রীমার আঁখিবারি মুছায়ে বলেন—বাপ-ঘরে যাচ্চ, কেন্দো না, আবার শোরোৎ রাখাল শীগগির আনবে। দৃশ্যটি বড়ই মধুর !! সরলপ্রাণ বলিয়াই লাটু পেরেছিলেন, আমাদের সম্ভবে না।

বড় দাতা ছিলেন, দীন দুঃখী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলে, যা দু-চার পয়সা হাতে থাকিত, দিয়া দিতেন। একদিন কোনো পণ্ডিত (তর্করত্ন) বলেন—নিরক্ষর লাটু মহারাজের সাধুভাব দর্শনে এবং আধ বাঙালী পোনখোট্টা ভাষায় তাঁর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণে, পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছি।

কাশীধামে অবস্থানকালে ভক্তপ্রদত্ত অর্থ অপহৃত হইলে, পুলিসে খবর দেবার কথা উঠিলে, ক্রোধভরে কহেন—গুরু বিশ্বনাথ তার প্রাপ্য তারে দেছেন, তখন পুলিস ডাকবি কেন ? যদি না মানিস, হাম্‌নি এখানসে চলে যাবে। বহুদিন কাশীবাস ও বহু লোকের কল্যাণ করিয়া প্রভু বিশ্বনাথ কৃপায় পরানির্বাণ লইয়াছেন। ভক্ত-প্রচেষ্টায় অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(১২) শশীভূষণ—রামকৃষ্ণানন্দ

গুরুভক্তির মূর্ত প্রতীক শশীভূষণের জন্মস্থান হাওড়া জেলার ময়ালগ্রাম। ভৈরবতুল্য পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন—শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে দেবী-প্রসাদে শশীকে

পাইয়াছি। এ জন্য শশীভূষণ বাল্যাবধি দৈবী গুণসম্পন্ন। জ্যেষ্ঠতাত (শরতের পিতার) স্নেহপালিত হইয়া বি. এ. পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। প্রাণের টানে যখন-তখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ; এক আলয়ে অবস্থান করিয়াও কে কখন (শরৎশশী) ঠাকুরের নিকট আসিবেন, তাহা পরস্পর জানিতে পারেন নাই।

ঠাকুর বলেন--শশী ঋষি কৃষ্ণের পার্শ্বদ। একদিন তাঁর মুখে বাইবেল ব্যাখ্যা শুনিয়া ঠাকুর কহেন—সখি! যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে আসিলে, তাঁহার আরক্তিম মুখ দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে স্বহস্তে ব্যজন করেন এবং আমাদেরও বাতাস করিতে বলেন। ইহাই বোধ হয়—সেবাকল্পে তালবৃন্ত ধারণের সূত্রপাত। স্বস্তিবোধ করিয়া উড়ানীপ্রান্ত হইতে একখণ্ড বরফ বাহির করিয়া বলেন—বরানগর বাজার হতে আপনার নিমিত্ত আনিয়াছি। প্রভু তাহাতে সানন্দে কহেন—এই গরমে মানুষ গলে যায়, কিন্তু শশীর ভক্তি-হিমে বরফ গলে নাই।

বি. এ. পরীক্ষার ফি-র টাকা জমা দিবার পর যেমন শুনিলেন—ঠাকুর অসুস্থ, অমনই পরীক্ষা বিসর্জন দিয়া প্রভুর সেবায় আত্মনিবেদন করেন। কাশীপুর উদ্যানে যদিও অনেকগুলি মহামনা যুবক পর্যায়ক্রমে পরিচর্যা করিতেন, শশীভূষণের সে ভাব ছিল না ; ছায়ার মতো পার্শ্বে থাকিয়া অবিরাম ব্যজন করিতেন, এ জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্নানাহার সারিয়া লইতেন। সঙ্গীদের অবসর মতো সাধনে রত দেখিলে বলিতেন -প্রত্যক্ষ দেবতা ছাড়িয়া অদৃশ্য দেবতা ধ্যানে কি ফল ?

ছায়া-শরীর পরিহারে বিশ্ব চৈতন্যে মিলাইলেও তদ্গতপ্রাণ ভূষণ প্রভুর লীলা দেহকে জীবন্ত জাগ্রতবোধে তখনও ব্যজন করিতে থাকেন ; এমন কি, বহ্নিহোমকালেও নিষ্ঠা-ভক্তিপ্রভাবে ইষ্ট দেবতাকে বহ্নিমধ্যে বিদ্যমান দেখিয়া শীতলতা সম্পাদনে ব্যজননিরত। তবে শশী কি বাতুল ? না, না ! পাণ্ডুরোগে যাবতীয় পদার্থ যেমন পীতবর্ণ দেখায়, তেমনই একনিষ্ঠ ভূষণ প্রভুকে সদা-সর্বত্র বিদ্যমান দেখিতেন। অথবা তাঁহার অক্ষি-মণিতে অনিমিষে বিরাজ করায় শশী সকল ক্ষেত্রেই প্রভুর সন্দর্শন করিতেন।

ঠাকুর বলিতেন, কোথাও কিছু নাই রে প্যালা শাঁক বাজিয়ে করলি গোল ; দেখা যায়, শশী তাহাই করিলেন—জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব বলে ঘণ্টা নেড়ে শশী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বলরাম-মন্দির হতে প্রভুর চিন্ময় অস্থিপাত্র আনীত হইল, সেই সঙ্গে কোশাকুশি আদি পূজার দ্রব্য সবই জুটিয়া গেল। বস্তুতঃ শশী যদি মিলনমন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহলে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ও গৃহী ভক্তরা সঙ্ঘবদ্ধ হইত এবং উত্তরকালে বেলুড়ে ও নানা স্থানে কি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত ? সুতরাং শশীভূষণকে মঠ-প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আকাশবৃত্তির উপর যাহাদের নির্ভর, তাদের পূজোপকরণের যত ঘটা সহজেই অনুমিত হয় ; সুতরাং গাছের ফুল ও গঙ্গার জল দিয়াই পূজা হইত। বিশেষত্ব এই যে, প্রভু যে ফুলগুলি ভালোবাসিতেন, কষ্টসাধ্য হইলেও শশীর সংগ্রহে তাহাতে ত্রুটি ছিল না ; এ জন্য দূর সাতপুকুরের বাগান হতে নাগকেশর চাঁপা আনয়ন, আবার গোলাপ ও গুড়ৃচি ফুল চয়নকালে কুকুরে কামড়ালেও ভ্রুক্ষেপ নাই। নৈবেদ্যের মধ্যে আদা, ছোলা ও বাতাসা, তবে ভক্তগণ মিষ্টান্নাদি আনিলে সেদিন ঠাকুরের মুখ বদলানো হইত। কি করে উপযুক্ত সময়ে প্রভুকে জলযোগ করাব এবং তাঁর সন্তানদেরও প্রসাদ দিব, এ জন্য সকল দিকেই ত্বরান্বিত। সাধ বটে—বিভিন্ন বর্ণের এক একটি ফুল দিয়া ঠাকুরকে সাজানো, কিন্তু জলপানীয় দানে

পাছে বিলম্ব হয়, তাই দৈবযোগে একদিন বিজড়িত ইয়ারিং জবাফুলকে পৃথক্‌করণে কালহরণ ভাবিয়া 'এই ন্যাও ঘোড়ার ডিম' বলিয়া এমন ব্যাকুলভাবে ফুল দেন, যাহাতে মনে হইল—প্রাণের আবেগে শশী আজ যেন প্রভুর পরাপূজা করিল এবং ভাবগ্রাহী জনার্দন যেন সানন্দে পূজা লইলেন, দৃশ্যটি জীবনে ভুলিব না। আবার সন্ধ্যারতিকালে জয় গুরু জয় গুরু বলে এমন উদ্দাম নৃত্য করিতেন, ভয় হইত, পাছে বা ঘরের মেঝে ভেঙে পড়ে।

সেবাকার্যে ব্যস্ত কর্মবীরের ধ্যানধারণার অবসর হইত না; কিন্তু দৈবযোগে ধ্যানে বসিলে আর নিস্তার নাই—একেবারেই সমাধি। অগ্নিপার্শ্বে উপবেশনে দেহ যেমন তাপমান হয়, ভূষণের সঙ্গে ধ্যানকালে তাঁহার অধ্যাত্মপ্রভাবে চঞ্চলমতি আমাদেরও চিত্ত স্থির হইত। শাস্ত্রচর্চায় তাদৃশী অনুরাগ ছিল না, বলিতেন—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা প্রভুরই কৃপায় স্ফুরণ হইবে। তীর্থযাত্রায় স্পৃহা ছিল না, কহিতেন—প্রত্যক্ষ দেবতা ছাড়িয়া কেন দুঃখভ্রমণ করিব? এ জন্য কখনো তীর্থদর্শনে যান নাই। কঠোর যোগীর অন্তরে কোনো দিনও বাসনা জাগে নাই যে, কেহ তাঁহার সেবা করে, বলিতেন, প্রভুর সেবা কর, কৃতার্থ হবে। বিষম কম্পজ্বরে অভিভূত হইলে-প্রলাপের মতো বলিতেন--হতভাগারা এখনো প্রভুর পূজারতি করিল না ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাগ্যবলে রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকে, সে একমাত্র শশীভূষণ। একারণে তাঁহার রামকৃষ্ণ নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে।

প্রভুর প্রতিনিধি জ্ঞানে স্বামীজীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি, তাই তাঁহার অনুরোধে মাদ্রাজ যাইতে হয়, উদ্দেশ্য দক্ষিণাপথে প্রভুর ভাব প্রচার। অপরিচিত দেশে কোনো সংস্থান না থাকিলেও, তাঁহার নিষ্ঠাপ্রভাবে অল্পকালমধ্যে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মাণদোষে মন্দিরটি ভূমিসাৎ হইলে, অনুযোগ করায় কহেন, প্রভুর মহিমা প্রচারে এ দেশে আসিয়াছি, মন্দির বা মান-যশের জন্য তো আসি নাই। বাহিরে মন্দির তুলিলে কি ফল--যদি লোক-হৃদয়ে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা না হয়। ছুত্‌মার্গী হইলেও মদ্রবাসীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই মঠ-প্রাঙ্গণে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই।

প্রস্ফুটিত পুষ্প-সৌরভ যেমন চারিদিকে বিস্তার পায়, শশীভূষণের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি-সৌরভ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। তীর্থোপলক্ষে মাসত্রয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে দেখিয়াছি, মাদ্রাজ শহরে তো কথাই নাই, ভিজিগপাটাম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং মালাবারের কুইলন শহর পর্যন্ত শিক্ষিতমাত্রেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

এইরূপে গুরুগতপ্রাণ শশীভূষণ বহু লোকের ইতর বাসনা ক্ষয়কল্পে, দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ক্ষয়রোগে মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্মে বিশ্রাম লভিয়াছেন।

(১৩) হরিনাথ--তুরীয়ানন্দ

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হরিনাথ তাঁর জন্মস্থান বোসপাড়ার সকলেরই প্রিয়। প্রভুর কৃপালাভের পর প্রায়শই দক্ষিণেশ্বর যাইতেন, তবে সাধন-পর্যায় শাস্ত্রসহ মিলাইবার ইচ্ছায় কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনে ঠাকুর অনেক সময় ভক্তদের অনুসন্ধান লইতেন, তাই বাগবাজার হইতে কোনো ভক্ত উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করেন—সেই যে ঝাঁকড়াচুল বলিষ্ঠ যুবাটি আসত, তার খবর জানো?

ভগবান যখন ব্যাকুল, ভক্ত কি আর উপেক্ষা করিতে পারে ? একদিন উপস্থিত হইলে প্রভু কহেন, এত ঘন ঘন আসতে, তারপর একেবারে চুপ ? লজ্জাবনত দর্শনে কহেন, লোকে মদ খায়, রাঁড় করে, টাকা করে, তুমি না হয় শাস্ত্র করেছ, তাতে লজ্জা কি ? তখন ভাবাবেশে গীত করেন, ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে পারো কি ধরতে। প্রভুর ভাব দর্শন এবং অভয়বাণী শ্রবণে আত্মসমর্পণচ্ছলে হরিনাথ শ্রীপদে পতিত হন।

বড়োই মেধাবী, গীতা উপনিষদাদি কণ্ঠস্থ, বলিতেন, পুঁথিগত বিদ্যা কার্যকরী নয়। আত্মপ্রসাদ লাভে শাস্ত্র প্রসন্নতা হয় বলিয়াই ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলি সহজভাবে সমাধান করিতেন। শাস্ত্রে বিশারদ এবং সাধনায় সমুন্নত হইলেও সেবাধিকার সৌভাগ্য ঘটে নাই, যেহেতু, ঠাকুরের অসুস্থাবস্থায় কোনো দিনও সেবা করিতে দেখি নাই। প্রভু গান করিতেন—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, শ্রদ্ধা-ভক্তি দিতে কাতর হই। আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, সে যে ত্রিলোকজয়ী। ইহাতে ধারণা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সেবকই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসগ্রহণে তুরীয়ানন্দ নাম হইলেও আমরা হরিবাবু বলিলে কহেন, প্রভুর কৃপায় সব ছেড়ে তোমাদের দাস হয়েছি, তবুও হরিবাবু !

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা লইয়াই মানবের জীবন ; কিন্তু ইহার পর এমন এক দিব্য ভাব আছে, যথায় আমি তুমি ও দ্বন্দ্বভাবের অবসানে নির্বাপিত দীপশিখার ন্যায় চিত্তে যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোদয় হয়, তাহাকেই তুরীয়াবস্থা কহে। কাঞ্চনসেবী মার্কিণরা যাহাতে এই দিব্যভাবের আভাষ পায়, এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যান, এবং বলা বাহুল্য, হরিভাই ইহাতে কৃতকার্য হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ; এবং মায়াক্ষেত্রে কঠোর তপস্যায় তুরীয়ভাব উপভোগে নামের সার্থকতা করেন।

ঠাকুর বলিতেন, ভগবদ্‌ভজনে মন তো আনন্দ পায়, কিন্তু শরীর যে টেক্স আদায় করে কি না, কঠোরতায় অবসন্ন হয়। তাই স্বাস্থ্যভঙ্গে মহারাজের আবাহনে পুরীতে যান ; কিন্তু স্বভাব তো ঘুচে না, সুস্থ হইলে পূর্ববৎ আচরণ অর্থাৎ উগ্র তপস্যা। কুক্ষণে সমুদ্রস্নানে কর্ণে লবণাম্বু প্রবিষ্ট হইলে, এমন বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, অঙ্গচালনেও অসমর্থ। অস্ত্রোপচার জন্য ক্লোরোফর্ম করিতে চাহিলে কহেন, প্রভুর কৃপায় যখন চৈতন্য লাভ হয়েছে, আর কেন অচৈতন্য করিবেন ? আমি ভগবানের নাম করিতে থাকি, আপনি অস্ত্রোপচার করুন। ডাক্তার সাহেব বলেন ভগবানের গুণগানে দেহকে উপেক্ষা, জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। কলিকাতায়ও ঐরূপ ঘটনায় ডাক্তারবাবু অতীব আশ্চর্য হন।

পরিশেষে বিশ্বনাথ ধামে বিশ্বনাথ ধ্যানে তুরীয়াবস্থায় বিলীন হইলে, প্রাক্তনদেহ কাষ্ঠপুত্তলি মতো পড়িয়া রহিল।

(১৪) গোপালদাদা—অদ্বৈতানন্দ

বরাহনগরের পূর্বদিকে সিতিগ্রাম—যেখানে ঠাকুর ব্রাহ্মভক্ত বেণী পালের বাগানে উৎসব করিতে আসিতেন ; সেইখানে গোপালদাদা প্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হন। জাতিতে সদ্গোপ, বয়সে প্রবীণ হইলেও স্বভাবে বালকের মতো, বন্ধুত্ব-সূত্রে বেণীবাবুর আলয়ে অবস্থান। ঠাকুর বলেন, তিনি এমনই কর্মনাশা যে, তাঁর কৃপায় দাদার দোকানপাট ঘুচিয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বরে আমরা তাঁকে বুড়ো গোপাল বলে ডাকলে কোমল প্রকৃতি বশতঃ বিরক্ত না হইলেও, নীতি শিক্ষাদান মানসে ঠাকুর কহেন, তোমরা হয় মুরুব্বি, নয় দাদা বলে ডাকবে। রহস্যপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ কহিতেন, আশ্চর্যময় ঠাকুরের আশ্চর্য কাণ্ড, তাই বাপের বয়সী

বুড়োকেও শিষ্য করেছেন। প্রাচীন বলিয়া পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ইঁহার সঙ্গে কথা কহিতেন, এবং ইঁহার সেবায় তুষ্ট হইতেন।

শেষ জীবন পর্যন্ত ইনি ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। বেলুড় মঠে একদিন দশ সের দুধে অভিষেক করিয়া নরেন্দ্রনাথ কহেন, দাদা, আজ হতে তুমি মহান্ত হলে, মঠের সকল ভার তোমার উপর। ভালোবাসায় ভক্তকুলকে বশীভূত করিয়া শ্রীগদাধর দর্শনে দেহত্যাগ করিলে, বাবুরাম ভায়া ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পরমপদপ্রাপ্তির মহোৎসব করেন।

(১৫) খোকা—সুবোধানন্দ

ঠনঠনিয়ার ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা শংকর ঘোষের বংশধর। লেখাপড়ায় মনোযোগ না থাকায়, এদিক-ওদিক বেড়াবার সময় প্রভুর পুণ্যদর্শনে ধন্য হন। বয়সে সকলের ছোটো বলিয়া নরেন্দ্রনাথ নাম রাখেন খোকা, স্বভাবে সরল ও স্পষ্টবক্তা—(যেহেতু মনোভাব গোপনের বিদ্যা ছিল না)। বালক বলিয়া এবং ভগবৎধ্যানে অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুর স্নেহ করিতেন।

কাশীপুর বাগানে একটি গান লিখিবার সময় বানান জিজ্ঞাসায় ঠাকুর কহেন, ছেলেবেলা বুঝি দাঁড়াগুলি খেলে বেড়িয়েছিলে ? কুমার বৈরাগ্যে ইনি বিপৎসংকুল ঝাড়খণ্ড পথে কাশী যান। অশন-বসনে অনাস্থাপ্রযুক্ত শরীর অপটু থাকায় নানা রোগে ভুগিয়া পরিশেষে রাজযক্ষ্মায় সেদিন বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

(১৬) বিজয় গোস্বামী

অদ্বৈতবংশসম্ভূত গোস্বামীজী চিরদিনই সত্যান্বেষী। আশ্বিনে ঝড়ে কোমর-জল ভাঙিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগদান করেন ; পরে কেশববাবুর সমাজে ও শেষে সাধারণ সমাজের প্রচারক ছিলেন। ঠাকুর ইঁহাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন। ঢাকা অবস্থানকালে প্রভুকে প্রত্যক্ষ ও স্পর্শ করিবার পর সমাজবন্ধন ছিন্ন হয়। কাশীপুর বাগানে প্রভু স্তব করিয়া বলেন—আপনি অবতারী, আপনা হইতেই অবতার প্রকট। ভক্তপ্রবর ও সাধুত্তম বলিয়া অনেক পিপাসু ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যত্বলাভে ধন্য হইয়াছেন। পুরীধামে নরেন্দ্র সরোবরতীরে ইঁহার সমাধি মন্দির।

(১৭) নাগ মহাশয় দুর্গাচরণ

এমন ঈশ্বর-প্রেমিক লোক সুদুর্লভ, জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের দেওভোগ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া গঙ্গার ধারে রথতলা ঘাটের উপর এক কুঁড়েঘরে থাকতেন। দীনতার জন্য এমন কতিপয় সুহৃদ লাভ হয়, যাঁরা ইঁহাকে সাহায্য করিতেন এবং আদর করে মামা বলে ডাকতেন। বোধ হয়, ইঁহাদেরই সঙ্গে প্রভুর পুণ্য দর্শন পান। করতালি দিয়া হরিনাম এবং প্রভুর চরণ বন্ধন করা ইঁহার সাধনা ছিল।

যেদিন ঠাকুরের মুখে শুনেন যে, লোকের রোগ কামনা করে বলে ডাক্তারের ধর্ম হয় না, সেইদিনই চিকিৎসা-পুস্তক ও ঔষধগুলি গঙ্গায় ভাসায়ে দেন। ভাবভরে গঙ্গাতীরে হরিনামকালে আমার প্রেম হৈল না বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলে বন্ধুরা তীরে উঠান ; আবার রন্ধনকালে নাম করিতে করিতে আমার প্রেম হৈল না বলিয়া রন্ধনপাত্র যখন-তখন ভাঙিয়া দিতেন ; তাই এই ভাবে ভোলার জন্য বন্ধুদের অনেক সময় বিব্রত হইতে হইত।

দেখিয়াছি, প্রভুর নিকট কোনো দিনও আমাদের সঙ্গে একাসনে বসিতেন না, দূরে দাঁড়ায়ে থাকতেন আর বলতেন, প্রেমবিহীন আমি কি করে এদের সঙ্গে বসব? পাতায় করিয়া প্রসাদ দিলে পাতাখানিও খাইয়া ফেলিতেন—বলিতেন, প্রসাদ স্পর্শে পাতাও প্রসাদ হৈচে, এ কারণ তাঁহার হাতে প্রসাদ দেওয়া হইত। দয়া করুন, দয়া করুন বলে যখন আমাদেরও পায়ে পড়িতেন, তখন প্রভুর প্রতি কীদৃশ ভক্তি, তাহা বর্ণনাতীত। এই দীনভাব জন্য প্রভু তাঁহাকে বড়োই স্নেহ করিতেন। কবিবর গিরিশচন্দ্র বলিতেন, দীনতা বশতঃ নাগমহাশয় এতই ক্ষুদ্র হইয়াছেন যে, মহামায়া তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না। এবং অতি বৃহৎ হওয়ায় স্বামীজীও মায়ার বন্ধনের অতীত।

(১৮) হুটকো গোপাল

রামলাল দাদা ভিন্ন যখন ঠাকুরের দ্বিতীয় পরিচারক ছিল না, তখন কৃপাবিভোর গোপাল (ঘোষ) প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু বালকস্বভাব বশতঃ মাঝে মাঝে পলায়ন করায় ঠাকুর ইঁহাকে হুটকো গোপাল বলিতেন। স্বভাবে সরল এবং প্রভুর অনুগত দেখিয়া, শ্রীমাতৃদেবী ইঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং ইঁহার আবদার সহিতেন। ইঁহার প্রাণপাত শ্রমে বরাহনগর মিলন-মন্দির স্থাপন হয়, এবং পুরাতন সেবক বলিয়া প্রভুর সন্তানদের উপর আধিপত্যও ছিল। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর বিবাহিত হন, এবং একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া প্রভুর ধামে গিয়াছেন।

(১৯) হরিশদাদা

ঠাকুর বলিতেন, মানুষ যারা জ্যান্তে মরা ; যেমন হরিশ। ইনি জাতিতে তিলি, বাড়ি গড়পাড়, এবং বৃত্তিতে ব্যায়াম-শিক্ষক ; আকৃতি লৌহসম হইলেও, প্রকৃতি অতি কোমল। বিবাহিত হইয়াও মায়া কাটায়ে প্রভুর সেবায় প্রাণার্পণ করেন। প্রভুর প্রসাদে আনন্দলাভ রসাস্বাদনে মৌনীর মতো থাকিতেন।

হরিশদাদার ধারণা ছিল, ষোল আনা মন না দিলে কিছুই হয় না। তাই এই ষোল আনার ঝোঁকে দু-চারটে ফল বা সন্দেশ না দিয়ে, এককাঁদি কলা, এক কলসী গুড় বা এক জোড়া আম দিয়ে ঠাকুরকে বলিতেন, ষোল আনা না দিয়ে মন তৃপ্ত হয় না।

মন বুঝবার জন্য ঠাকুর এক দিন কহেন, স্ত্রী তোর জন্য কাতর, তাকে একবার দেখা দিলে দোষ কি? তাতে হরিশদা দীনভাবে বলেন, মহাশয়! ওস্থান দয়ার নয়, মায়ার ; কৃপা করুন, যেন মায়ামুক্ত হই। ঠাকুর আনন্দ করে আমাদের এই কথাগুলি বলিতেন।

(২০) তারক বেলঘোরের

এমন ভক্তিমান ও নিরভিমানী ছেলে সহসা দেখা যায় না। ঠাকুর ইঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন ; বলিতেন, যদি জীবন্ত শিবদুর্গার পূজা করতে চাস, ঘরে বাপমার সেবা কর গে। পিতা ৺উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যাঁর জিনিস, তারক তাঁর কাছেই গেছে।

(২১) পল্টু

রূপবান হাস্যমুখ পলটু যখন এল. এ. পড়েন, তখন ইহাকে ঠাকুরের কাছে দেখি ; প্রভু ইহাকে স্নেহ করিতেন। নাম প্রমথনাথ কর, পিতা ৺হেমচন্দ্র কর (ডেপুটি), ভবন কম্বুলিয়াটোলা। দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করেন জানিয়া পিতাঠাকুরকে কহেন, আপনার নিকট এলে ছেলে ভালোই হবে, তবে দয়া করে দেখবেন, যেন সংসারবিরাগী না হয়।!

(২২) রামদাদা

ভক্তির জোরে ধাপার মাঠ কাঁকুড়গাছিতে যিনি প্রভুর চিন্ময় অস্থি সমাহিত করিয়া কৃতার্থ হন, এবং প্রভুর সেবার্চনায় যিনি ঐ পুণ্যক্ষেত্রেই দেহপাত করেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। ভবন—সিমলা মধু রায়ের গলি, এবং বৃত্তি মেডিকেল কলেজে সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে ইঁহার আলয়ে পদার্পণ করিলে আনন্দোৎসব হইত।

ঠাকুর কহেন, এখানকে যখন প্রথম আসে, রাম তখন বড়ই কৃপণ ছিল, এখন কিন্তু মুক্তহস্ত, তাই ভক্তসেবায় অকাতরে অর্থব্যয় করে। দু-চারজন ভক্তকে পালন করায়, ঠাকুর ইঁহাকে ভক্তপালক বলিতেন।

তাঁহার প্রণীত 'তত্ত্বমঞ্জরী' শুনিয়া ঠাকুর বলেন, তা তুমি তো এত লিখেছ, কিন্তু তার কি করলে ? যে লোক শুদ্ধাচারে থাকে, হবিষ্য করে, জলটুকুও ছেঁকে খায়, অথচ ভগবানে ভক্তি নাই, সে বড়—না যে আচারবিচার মানে না, ভগবৎপ্রসঙ্গে অশ্রুপাত করে সে বড় ? রামদাদা নির্বাক।

সর্বপ্রথমে ইনিই ঠাকুরের জীবনী প্রকাশ করেন, এবং বক্তৃতাদানে অনেক ব্যক্তিকে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

(২৩) কালীপদ ঘোষ (দানা)

বলেন—জগাই-মাধাইয়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল হলেও, প্রভু আমাকে নিজগুণে কৃতার্থ করেছেন। প্রভুর গুণগানে ইনি অনেক গীত রচনা করিয়াছেন।

(২৪) চুণিবাবু

অশীতিবর্ষপর বৃদ্ধতম বসুজ চুণিলাল প্রভুর পরমভক্ত। আবাস—বলরাম-মন্দিরের পশ্চিম গায়। দারিদ্র বশতঃ প্রভুর সেবায় অপারগ বলিয়া বিষণ্ণ ; তাই তাঁর প্রাণে শান্তি দিবার বাসনায় ঠাকুর কহেন, ধাতুপাত্রে জল খেতে হাত আড়ষ্ট হয়, তুমি কাচের গেলাস এনে দিও, তাইতে জল খাব। তোমার সে গেলাসের কিসমত বড় মানষের লাখ টাকার চেয়ে বেশী। আর এক দিন কহেন, শূদ্রমুখে প্রণব উচ্চারণ শুনলে, কানে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দ্যায় ; ভগবানের অসংখ্য নামের একটিতে রতি হলে সর্বার্থসিদ্ধি হয়। তখন প্রণব উচ্চারণের কি আবশ্যক ?

(২৫) ছোট নরেন

পঠদ্দশায় প্রভুর বিশেষ স্নেহভাজন হন, ইনি জাতিতে কায়স্থ, তেলিয়াপাড়ায় বাড়ি। ভগবানের ধ্যানে সমাধি হইত। ঠাকুর বলেন, এর খুব উচ্চ অবস্থা ; যদি কামিনী-কাঞ্চনে ছোব না দ্যায় (দংশায়), তাহলে এ একজন মহাযোগী হবে। বিধি-নির্বন্ধে বিবাহ হইলে দাম্পত্য জীবন তেমন সুখকর হয় নাই, এবং উকিল হইলেও সেরূপ অর্থাগম হয় নাই। অধুনা দিব্যধামে।

(২৬–২৯) নারাণ, হরিপদ, তেজচন্দ্র, পদ্মবিনোদ

সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের ছাত্র ও বাগবাজার পল্লীর ছেলে। মাষ্টার মহাশয়েরই কল্যাণে প্রভুর কৃপাপাত্র হন। সরলতা এবং নির্ভীকতা দেখিয়া ঠাকুর ইঁহাদের আদর করিতেন।

মাহেশের রথে জগবন্ধু দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইলে, বিশেষ পৌরুষে ইঁহারা প্রভুকে কৌতূহলী যাত্রীর ভিড় হইতে নিরাপদ স্থানে আনেন। নারাণের আগ্রহেই ঠাকুর গিরিশ বাবুর চৈতন্যলীলা নাটক দেখিতে যান। কোনো এক রমণী হরিপদকে গোপালের মতো আদর করে শুনিয়া প্রভু কহেন- সাবধান, গোপাল ভাবের পর যেন মদনগোপাল না করে। ইহারা সকলেই প্রভুর পাশে গিয়াছেন; তার একটা নিদর্শন দেখেছি, শেষ অবস্থায় প্রভুর নাম করতে করতে তেজচন্দ্র পলায়ন করিল।

(৩০) ভবনাথ

এমন প্রেমিক আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মণতনয় হইলেও আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মজ্ঞানী, ঘর বরাহনগর। অঙ্গকান্তি যেমন গৌর, অন্তরও সেইরূপ। পড়িবার সময়ই প্রভুর বিশেষ স্নেহভাজন হন। ঠাকুরের প্রতি ইঁহার যেরূপ ভালোবাসা, তার কণামাত্র পেলে আমরা কৃতার্থ হই। ভগবানের ভজনসময় ইনি এমন রোদন করিতেন তাতে পাড়ার লোক জমা হয়ে যেত। যেন একটা কি কাণ্ড ঘটেছে।

'তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার' তাঁর এই গীতটিতে প্রভু সমাধিস্থ হইতেন, বলিতেন—নরেনের পুরুষভাব, তাই গম্ভীর, ভবনাথের প্রকৃতিভাব, তাই প্রেম-বিভোর। ভাবাবস্থায় অঙ্গবৈকল্য ঘটিলে শ্রীমতীর অংশ বাবুরাম, এবং বিবাহিত ভবনাথ ভিন্ন অন্য কোনো ভক্ত প্রভুকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইত না; ইহাতে বুঝা যায়, ইঁহারা অসাধারণ পবিত্রাত্মা।

মাতা-পিতার আগ্রহে বিবাহ, পত্নী যাতে ধর্মচর্যায় সহায়ক হয়, এই অভিপ্রায়ে তাকে দক্ষিণেশ্বর আনিলে ঠাকুর নব দম্পতিকে শুভাশিস করেন। প্রভুর যে গভীর সমাধিস্থ প্রতিকৃতি, অধুনা যাহা ঘরে ঘরে পূজিত, ভবনাথেরই আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির বিষ্ণুমন্দিরের রোয়াকে গৃহীত হয়; এজন্য ভক্তমাত্রেই ভবনাথের নিকট ঋণী। ভবনাথ প্রভুর ধামে গিয়াছে।

(৩১) পূর্ণ

কায়স্থশরীর হইলেও, ঠাকুর বলিতেন—পূর্ণ নারায়ণের অংশ, পূর্ণর আগমনে আমার ভক্তকুল পূর্ণ হল। পিতা রায়বাহাদুর দীননাথ ঘোষ, ভবন শ্যামবাজারে। পড়িবার সময় মাষ্টার মহাশয়ের কৃপায় প্রভুর পুণ্য দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর ইঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন; ছোট ছেলে দক্ষিণেশ্বর গমনে পাছে কষ্ট পায়, এবং বাড়িতেও গণ্ডগোল করে, তাই প্রভু কৌশল করিয়া বলরাম-মন্দিরে আনাইতেন, কখনো বা স্কুলের সন্নিকটে অপেক্ষা করিতেন, এবং মাস্টার মহাশয় দ্বারা কাছে আনাইয়া মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন।

দৈবযোগে একদিন দক্ষিণেশ্বর আসিলে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে তোর কি মনে হয়? পূর্ণ বলে—আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে দেখি। ঠাকুর বলেন—আসতে না পারলে চিঠিতে মনোভাব জানাবি। পূর্ণর ভাবপূর্ণ পত্র ঠাকুর আমাদের পড়াতেন।

আমরা যদি একটু ভজন করি তো ঢাক পিটে বেড়াই; নিরভিমান পূর্ণ বলিত—মানবদেহে যে ভগবানের নাম করতে পারছি, এ মহাভাগ্য। পূর্ণ বিবাহিত এবং প্রভুর সন্তান প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। কাল পূর্ণ হইলে নারায়ণাংশ নারায়ণেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

(৩২) যোগীন সেন

বৈদ্যবংশজ যোগীনের জন্মস্থান নদীয়া কৃষ্ণনগর, বৃত্তি সরকারী ছাপাখানার সহকারী কোষাধ্যক্ষ। যোগীন যেদিন প্রভুর কৃপালাভ করে, আমি উপস্থিত। আত্মীয় বোধে পার্শ্বে বসায়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, ভগবানের কোন্ রূপ দেখে আনন্দ হয় ? যোগীন বলে, তা তো জানি না, তবে 'বারোয়ারী পুজোয় চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখে খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ি ; আজ কিন্তু আপনাতেই সেই রূপ দেখছি।

কামিনীকাঞ্চনমধ্যে অবস্থান করিয়াও অনাসক্ত, অতিশয় ধ্যাননিষ্ঠ ও সরলপ্রকৃতি এবং রাখাল মহারাজের অনুরক্ত।

ঠাকুরের জন্য সরভাজা ও সরপুরিয়া দেশ হতে আনিলেও বাপের ভয়ে নিজে না গিয়া দ্বারবান দ্বারা পাঠায়ে দেন। বাহকের কথায় সন্দিগ্ধ হইলেও, মিষ্টান্ন পরশে প্রভু কহেন—কোনো ভক্ত হয়তো পাঠিয়েছে, নইলে ছুঁতে পারব কেন ? পরে জানা যায়, যোগীনই পাঠায়েছে। যোগীন এখন প্রভুর ধামে।

(৩৩) মাষ্টার মহাশয়

অকাতরে প্রভুর কথামৃত বিতরণে যিনি অগণন নরনারীর কল্যাণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আলয় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। ইনি একজন পুরাণ ঋষি, ভাবাবেশে প্রভু ইঁহাকে মহাপ্রভুর সংকীর্তনে দেখেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুরের স্কুলে হেড মাষ্টার থাকবার সময়, অনেক ছাত্র ইঁহারই প্রেরণায় প্রভুর পুণ্যদর্শনে ধন্য হয়, এ কারণে ঠাকুর রহস্য করে বলিতেন—ছেলেধরা মাষ্টার। মহিমায় মুগ্ধ হইয়া মূকবৎ অবস্থান করায় কহিতেন—তিনটে পাশ (বি, এ.) করেও এমন মেনিমুখো মাষ্টারও দেখিনে। দেখেছি, প্রভু ইঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

আনন্দই ব্রহ্ম। প্রভু কহেন—মাষ্টারের আনন্দ লাভ হয়েছে বলেই গুন্ গুন্ করে গান করে। আনন্দ নামধারী অনেক হলেও অন্তরে আনন্দ হয়েছে কি না জানি না ; কিন্তু প্রভুর কৃপায় শ্রীমর আনন্দলাভ বড় কম কথা নয়।

দেখিয়াছি, ইঁহার সহধর্মিণীকে ঠাকুর যেরূপ স্নেহাদর করিতেন, তাহা অপর স্ত্রী-ভক্তদের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সন্দেহ। প্রভুর লীলাবসানে শ্রীমাতৃদেবী যখন বৃন্দাবন যান, ইনি শিশু কন্যা ফেলে প্রাণের টানে শ্রীমার সঙ্গে যান, পরে কালীভায়ার সঙ্গে শ্রীমা ইঁহাকে ঘরে পাঠাইয়া দেন।

মাষ্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ কিশোরীকে ঠাকুর স্নেহ করিতেন—বলিতেন—এ মাষ্টার অপেক্ষা সরল। দুই ভাইয়েই প্রভুর ধামে গিয়াছেন, তবে মাষ্টার মহাশয়ের দেহ কাশীপুর শ্মশানে প্রভুর ছায়া-শরীরের সমাধি-পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে। ভক্তিমতী সাধ্বী পাগলী ঐ সমাধিদ্বয়ের উপর মন্দির স্থাপনায় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(৩৪) অক্ষয় মাষ্টার

একদিন বৈকালে দক্ষিণেশ্বর যাইয়া দেখি—একজন কৃষ্ণকায় লোক দেবালয়ের সকলকে কুল্পি বরফ খাওয়াচ্ছে। বরফওয়ালাও আপনার ভক্ত না কি জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সহাস্যে কহেন—বরফওয়ালা নয় রে, কায়স্থর ছেলে, এখানকে আসে যায় ; কলকাতার ঠাকুরদের বাড়িতে ছেলে পড়ায়। ওর নাম অক্ষয় সেন। বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘর। কদাকার দেখিয়া

নরেন্দ্রনাথ নাম দেন শাকচুন্নি মাষ্টার। ভক্তিভরে প্রণাম করিতে গেলে ঠাকুর পিছনে হটে যান দেখে মনঃকষ্ট হল। বলিলাম, আমরা তো আপনাকে ভক্তি করতে জানি না, তথাপি আমাদের ভালোবাসেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে ছুঁতেও দেন না কেন? ঠাকুর কহেন—ও একটা আছে রে! সবই কি সমান? আসুক যাক, মনের ময়লা কাটুক, এর পর হবে। কল্পতরুর দিন ইহাকে স্পর্শ করিলে, বেঁকে চুরে কেঁদে ফেলিল; মনে হল, যেন জন্মজন্মান্তরের সংস্কারগ্রন্থি ছিন্ন হওয়ায় এইরূপ হন। প্রভুর প্রতিকৃতিকে চন্দনচর্চিত করা, আর একতারা নিয়ে নাম করাই ইহার সাধন ছিল। পরে ইনি ঠাকুরের দেশে গিয়ে অনেক বিষয় জানবার পর কাশীরাম দাসের মতো পদ্যচ্ছন্দে রামকৃষ্ণপুঁথি রচনা করেন, যাহাতে অনেকের কল্যাণ হইয়াছে।

(৩৫) মজুমদার দেবেন্দ্রনাথ

যশোহর জেলার পীরালি ব্রাহ্মণ, হঠযোগী হলেও কবিতা-রচনায় অনুরাগ। প্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হইয়া ভগবানের নামে অশ্রুপাত ও ভাবাবেশ হইত। বিনয়ী মিষ্টভাষী এবং ভাবুক বলিয়া ঠাকুর ইঁহাকে ভালোবাসিতেন। একদিন ইঁহাকে সঙ্গে নিয়ে ধনকুবের ৺যদুনাথ মল্লিকের ভবনে যান, এবং বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করেন।

ভক্ত হইলে কি হয়? মোহ তো সহজে কাটে না, বিলম্ব দেখিয়া ভাবেন—মেয়েমহলে বড় প্রতিপত্তি। জগদ্‌ভ্রম নিরসন জন্য যাঁর আবির্ভাব, তিনি কি আশ্রিতের সংশয় রাখিতে পারেন? তাই অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠান। যাইয়া দেখেন যে, ধনপতির বর্ষীয়সী জননী ভক্তিভরে প্রভুকে স্বহস্তে মিষ্টান্ন খাওয়াচ্ছেন, আর সজলনয়নে বলছেন—চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের লীলা পড়েছি বটে, সে কোন্‌ কালের কথা, কিন্তু আজ বাবা! মূর্তিমান চৈতন্য তোমাকে খাইয়ে আমার জন্ম সার্থক হল। দেবেন্দ্রনাথকে অধোবদন দেখিয়া প্রভু কহেন—আমি কারও ভাব নষ্ট করি না।

প্রাচীন বয়সে জীবিকার্জনে ইটালির দেব বাবুদের বিষয়কার্যে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার ধর্মভাব দর্শনে পল্লীর সকলে শ্রদ্ধান্বিত হয়, তাহাতে কোনো এক সুরসিক কহে—পূজো করতে (অর্থাৎ মনিবের মন যোগাতে) এসে মজুমদার পূজো পেয়ে বসল। অর্চনালয় স্থাপন এবং প্রভুর গুণগান গীত রচনায় ইনি অনেকের ধর্মভাব উদ্দীপন করেছেন।

(৩৬) অধরলাল সেন

সুবর্ণবণিক-শিরোমণি অধরলাল প্রভুর একজন বিশেষ ভক্ত, ভবন বেনেটোলায়। ডেপুটি কালেক্টার হইয়াও প্রভুর পাদবন্দন না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, তাই প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রভুর পাদপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন, এবং ঠাকুরও মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিলে আনন্দোৎসব হইত।

একটি উৎসবে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে দেখি—গিরিশবাবু প্রমুখ অনেক ভক্তের সমাগম; আবার হাকিমের বাড়িতে অনেক হাকিমও প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে বঙ্কিমবাবু প্রধান। অনবধানতায় গিরিশবাবুর কক্ষস্থিত সুরাপাত্র ভাঙিয়া যাইলে, সভামধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য ঘটে। কাঞ্চন উপেক্ষায়, অর্থাৎ প্রভুকে ছাড়িয়া গণ্ডগোল করায়, আমাদের আকৃষ্টকরণ অভিপ্রায়ে ঠাকুর কহেন—ভগবৎপ্রসঙ্গ ছেড়ে ডিঃ গুপ্তের বোতল ভাঙায় কেন উতলা হচ্ছ? ভক্তমর্যাদা-রক্ষক আপ্ত পুরুষের কথায়

আমরা সকলেই ডিঃ গুপ্তর ঔষধের গন্ধ পাইলাম।

কথাপ্রসঙ্গে কবিবর বঙ্কিমবাবুকে কহেন—রাম খাচ্ছ কেবল আমড়া, শস্যের সঙ্গে খোঁজ নেই, সার আঁটি আর চামড়া খেলে হয় অম্লশূল। আবার রহস্য করিয়া কহেন —নামেও বঙ্কিম, কথায়ও বঙ্কিম। কি করে এত বঙ্কিম হলে? বঙ্কিমবাবু লজ্জিত হইয়া বলেন—দাসত্বের চোটে বঙ্কিম হয়েছি।

আমাদের বাড়িতেও হরিনাম হয়, যদি দয়া করে পদধূলি দেন। ঠাকুর সহাস্যে কহেন—কি রকম হরিনাম গো? একটা গল্প শোন—কণ্ঠিমালা তেলক ছাপা এক স্যাকরার দোকানে কেউ সোনা বেচতে গেলে বলত—কেশব কেশব কি না কি রকম লোক? তখনই আর একজন বলত—গোপাল গোপাল—কি না গোবেচারী। তাই শুনে স্যাকরা বলত, হরি হরি কি না সোনা হরণ করি। অন্যজন বললে, হর হর হর—নির্ভয়ে হরণ কর—তা কি এই রকম হরিনাম গো? হাস্যরহস্যের পর উপদেশামৃতে বঙ্কিমবাবুকে পরিতৃপ্ত করেন।

অধরবাবুর প্রতি ঠাকুরের এতই স্নেহ যে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সন্তপ্ত হন।

(৩৭) সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরেশবাবু)

বলেন- ভাই! কান মলতে গিয়েছিলাম, কানমলা খেয়ে এলাম। অভিমানী বলিয়া কোনো মর্মান্তিক ঘটনায় আত্মহত্যায় উদ্যোগী হইলে, প্রতিবেশী রামদাদা বলেন— দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস দেবকে দেখে এসে, তারপর যাহা ইচ্ছা করিও। তাতে সুরেশবাবু কহেন—অনেক হংস দেখিয়াছি, তবে তোমার হংস যদি প্রাণে শান্তি দিতে না পারেন, কান মলে দিয়ে আসব। নিবাস সিমলা ষ্ট্রীটে, বৃত্তি অফিসের মুৎসুদ্দি।

যাইয়া দেখেন—ভক্তপরিবেষ্টিত প্রভু ভাবে বিভোর। রামদাদা পাদবন্দন করিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ উদাসীন। ঠাকুর আপন ভাবে বলিতেছেন—মানুষ বানর-বাচ্ছা না হয়ে বেড়াল-বাচ্ছা হয় না কেন? বানর-বাচ্ছা জোর করে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে দেয়, সেও কিচ্‌মিচ্‌ করে, কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা সুখে থাকে। দেখিসনে—গেরস্তর বাড়িতে বেড়াল তার ছানাকে কখনো ছাইগাদায় রাখছে, তাতে মাও ছাড়া আর কিছু বলে না, পাকশালে রাখলেও মাও, আবার গদী বিছানায় রাখলেও সেই মাও; অর্থাৎ মা যে অবস্থায় রাখুক না কেন, তাতেই তুষ্ট হয়ে, মাও মাও কি না মা, মা, বলে ডাকে। একেই বলে নির্ভয়ের ভাব; মানুষ যদি এই ভাবটি পায় তো সুখে থাকে; আর বানর-বাচ্ছার মতো জোর করে নেব বলে দুঃখ পায়।

অন্তর্যামী প্রভুর অমৃতময় কথায় সুরেশবাবু প্রাণে শান্তি পান, এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেন। তখন ঠাকুর কহেন—জগদম্বার উপর নির্ভর কর, আনন্দ পাবে। তবে মাঝে মাঝে এখানকে আসবে, তাহলে ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা হবে।

বাহিরে পাটোয়ারী চাল চালিলেও, অন্তরটি বালকের মতো, তাই প্রভু তাঁকে বড়ই স্নেহ করিতেন। নিজ ভবনে উৎসব উপলক্ষে গলে মালা পরাইয়া দিলে ঠাকুর গান করেন—ভূষণের বাকি কি আছে রে। আমি জগচ্চন্দ্রহার গলে পরেছি; বলব গিয়ে রাজপথে (অমনি বারান্দায় আসিয়া) আমি জগচ্চন্দ্রহার গলে পরেছি। সে অপরূপ দৃশ্য বর্ণনাতীত।

পানদোষ বশতঃ মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে গোলযোগ করিতেন, তাহাতে রামদাদা কহেন

—ঠাকুরের কাছে যাচ্ছ, আর এইরূপ করছ ; তাতে লোকে কি বলবে ? সুরেশবাবু বলেন—চল প্রভুর কাছে যাই, তিনি যেমন আদেশ করবেন, তাই করব, তবে তুমি যেন কর্ত্তামি করে এ সব ব্যাপার তাঁকে বোলো না। দক্ষিণেশ্বর যাইয়া দেখেন, ঠাকুর নহবৎখানার নিকট বকুলতলায় দণ্ডায়মান। প্রণাম করিবামাত্র কহেন—ও সুরেন্দর ! খাবি, খা, বারণ করিনে, তবে পা না টলে, আর জগদম্বার পাদপদ্ম হতে মন না টলে ; আর খাবার আগে নিবেদন করে বলিস, মা ! তুমি এর বিষটুকু খাও, আর সুধাটুকু আমাকে দাও, যাতে প্রাণভরে তোমার নাম করতে পারি। সুরেন্দ্রনাথ তদবধি তাহাই করিতেন, আর উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন—জয় কালী জয় কালী বল, লোকে বলে বলবে পাগল হল। ভালো মন্দ দুটা কথা, ভালোটা তা করাই ভালো।

নিঃসন্তান হইয়াও একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীর মোহে বিভোর। ঠাকুর গান করেন এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে, বিধি বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে। বলছেন—আঁটকুড়ো হলি, বেশ হল, ঝাড়া হাত-পা কোথায় ভগবানে মন দিবি, তা নয়, বেড়াল, কুকুর, টিয়ে পাখি পুষে, তার জন্য মসগুল ; সুরেন্দরর ঠিক তাই হয়েছে। তাই তাঁকে কহেন—মেয়ে না ভেবে, ভগবতীর মূর্তি ভাবিবি, মা জননী বলিবি, আর ভগবতী বলে সেবা করবি, কল্যাণ হবে।

প্রভুর সেবা এবং তাঁর সন্তান সেবার ফলে সুরেশবাবু যে প্রভুর ধামে গেছেন তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৩৮) ভাই ভূপতি

বাগবাজার রাজবল্লভপাড়ার এক প্রাসাদে জন্ম, আদরের নাম ফুলন, মেধাবী ও গণিতে পারদর্শী, এল. এ. পাশও করেন। শ্যামপুকুরের বাড়িতে প্রভুর কৃপালাভ করিয়া, নানা ভাবের অঙ্গুলি বিন্যাস দেখিয়া ঠাকুর কহেন, এগুলির নাম মুদ্রা (ইষ্টদর্শনে বিভোর ভক্ত করাঙ্গুলি যোগে যে মনোভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম মুদ্রা। ইদানীং পূজা-কালে দেবতাপ্রীত্যর্থে কতকগুলি মুদ্রাপ্রদর্শন প্রচলিত) দারিদ্র্যপেষণে চঞ্চলমতি হইয়া নগ্নপদে বাপের মতো জপ করিয়া বেড়াইলেও, আমাদের কাছে সহজভাবে থাকিতেন। ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগ দর্শনে অনেকে ইঁহাকে আদর্শরূপে বরণ করিয়াছে এবং হাতি-বাগানে ডালিমতলায় ইঁহার স্মৃতিমন্দিরও হয়েছে।

(৩৯) কিশোর রায়

কৃষ্ণনগরের লোক, বলে, ঠাকুর ইঁহার কৌতুকপূর্ণ কথা ভালোবাসিতেন। প্রথম দিন দেখিয়াই আমাকে কহেন, যাকে তাকে আনিসনে ; এক সের দুধে এক সের জল থাকলে মারতে পারি, কিন্তু দশ সের জল থাকলে মারতে হাল্লাক হয়ে যাব। কল্পতরু দিনে ইঁহাকে কৃপা করেন। দীর্ঘশ্মশ্রু থাকায় নরেন্দ্রনাথ নাম রাখেন আবদুল।

(৪০) ধীরু

ঠাকুরদের বাড়ির দৌহিত্র। গৌরাঙ্গ, স্থূলকায়, সত্যনিষ্ঠ ধীরুকে ঠাকুর স্নেহ করিতেন। প্রভু কেবল তো ভারতের জন্য আসেন নাই, সমগ্র জগতের জন্য আবির্ভাব, তাই কাশীপুরে একদিন ভাবাবেশে বলেন, সমুদ্রপারে অনেক ভক্ত আছে, তাদের কৃপা করতে

হলে, তাদের মতো পোশাক পরা দরকার। তাই ধীরু একটি পায়জামা আনিলে পরিয়া আনন্দ করেন।

(৪১) সুরেশ দত্ত

একজন নীরব ভক্ত, প্রভুর উপদেশগুলি গিলিতেন। যাতে সকলেরই কল্যাণ হয়, এজন্য 'পরমহংসদেবের উপদেশ' নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন ; তাহা দেখিয়া কহেন, জানিয়ে ছাপালে ভালো হত।

(৪২) শশীভূষণ সান্যাল

মহাপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও আচারী ভক্ত। ইঁহার নিষ্ঠাচারে প্রীত হইয়া ঠাকুর কহেন, আচারীর আচার ভগবান রক্ষা করেন। বালীতে ৺কল্যাণেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে ইঁহার আলয়ে পদধূলি দানে কৃতার্থ করেন।

(৪৩—৪৭) ডাক্তারের দল

পাথুরেঘাটার নিতাই হালদার পরমভক্ত, গলরোগের সূচনায় ইনিই প্রথমে ঠাকুরকে ঔষধ দেন। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার চিকিৎসা করেন। একদিন মহেন্দ্রলাল সরকার আক্ষেপ করিয়া ঠাকুরকে কহেন, তুমি প্রতাপকে ভালোবাস, তাই তার ঔষধ খাও। বিপিনবিহারী ঘোষ বলরাম বাবুর কুটুম্ব এজন্য প্রভুর প্রতি সমধিক ভক্তি। বলরাম মন্দিরের নিকটস্থ শশীভূষণ ঘোষ নীরব ভক্ত, প্রাণভরে প্রভুকে দেখিতেন ও তাঁর কথা শুনিতেন। ইনি ঠাকুরের একখানি জীবনী লিখিয়াছেন।

(৪৮) দমদম মাণ্টার

ঠাকুরের দেশে পাত্রসায়ারে বাড়ি যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র প্রভুর কৃপালাভ করেন, দমদমার কোনো স্কুলে মাণ্টারি করিতেন বলে নাম দমদম মাণ্টার। কর্মবিপাকে ভক্তসঙ্গবঞ্চিত হইয়া শেষ দশায় দেশেই অবস্থান।

(৪৯) হাজরামশাই (প্রতাপচন্দ্র)

ইনিও ঠাকুরের দেশের লোক, দেবালয়েই অবস্থান করিতেন। লণ্ঠনের নীচে যেমন আঁধার দেখায় প্রভুর নিকটে থাকিয়াও চৈতন্যোদয় হয় নাই, যদিচ বাহ্যে জপনিরত। ঠাকুর বলিতেন, উহার অন্তরে অনেক কামনা বাসনা। নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে বলেন, মরবার সময় ওর ইষ্ট দর্শন হবে।

(৫০—৫৩)

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ব্রাহ্মভক্ত) প্রভৃতিকে কিভাবে দেখিতেন, তৎপ্রণীত হিন্দু সেণ্ট নামে পুস্তিকাতে বিবৃত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় লীলামৃতে অল্প-বিস্তর বলা হয়েছে, প্রভু ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কেশববাবুও ঠাকুরকে কিভাবে দেখিতেন, তাহা আমাদের ভাবনার অতীত। পাড়াগাঁয়ের ছেলে ঠাকুর মুলা-মুড়ি খেতে ভালোবাসেন শুনে, কেশববাবু দক্ষিণেশ্বর এলে মুলো-মুড়ি খেয়ে আনন্দ করতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে চাহিলে কেশববাবু বলেন, মহাশয়, কামারশালায় কি ছুঁচ বেচা চলে ? অমৃতলাল বসু ও চিরঞ্জীব শর্মা এঁরা প্রভুর পরম ভক্ত।

(৫৪) মণিলাল মল্লিক

আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা। ভবন ৮১নং সিন্দুরিয়া পটি, এখন উহা বিধ্বংস। বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ইঁহার আলয়ে যাইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তকে আনন্দদান করিতেন। ইঁহারই গৃহে প্রভুর কীর্তনানন্দ দর্শনে শরৎ ও আমি মোহিত হই। চিরঞ্জীব শর্মার একতারা বাদনে 'নাচ রে আনন্দময়ী ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে' গীত শ্রবণে ভাবাবেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রভু ভক্তগণকে স্বর্গসুধা বিতরণ মানসে বাম বাহু উত্তোলন ও দক্ষিণভুজ কুঞ্চনে, বামপদ আগে ও দক্ষিণ চরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি মেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম। এ নৃত্য দর্শনে ভক্তের তো কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রমিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, বোধ হল, যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে। আশ্চর্য ব্যাপাব এই যে, দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলেও প্রভুর ক্লান্তি নাই। বরং অধিকতর উল্লাসে শ্যামাবিষয়ক মধুর গীতে সকলকেই মোহিত করেন। তাতে বোধ হল, ভাগবতী তনু ব্যতীত মানবদেহ এরূপ বন্যা ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না। বিশ্রামকালে সাধুশ্রেষ্ঠ বিজয় গোস্বামীকে রহস্য করিয়া কহেন, বিজয়ের নাচে ভয় হয়, পাছে ছাত ভেঙে পড়ে, সাধুতে গেরুয়া পরে থাকে, দেখচি বিজয় জামা জুতাও গেরুয়া করেচে—শুনিয়া হাস্যরোল উঠিল।

ভক্ত হইলেও মণিবাবু একটু কৃপণ; তাই তাঁহার কল্যাণ-বাসনায়, ঠাকুর নিজের ব্যবহার জন্য দ্রব্য আনিতে কোনো সেবককে পাঠাবার কালে বলিতেন, তিলি জাতির স্বভাব বলে যদি ইতস্ততঃ করে, জোর করে নিয়ে আসবি—এতে ওর কল্যাণ হবে।

ঠাকুরকে অতি আপনার জানিতেন বলিয়াই পুত্রবিয়োগে শান্তি-কামনায় শ্রীপদে উপস্থিত হন। প্রভু যখন দেখেন যে, শোকগীত গানে হৃদয় খালি হইয়াছে, তখন ভাবাবেশে তাল ঠুকিয়া 'জীব সাজ সমরে' গান করিলে মণি প্রণামপুরঃসর কহেন—আপনার করুণায় সকল শোক ঘুচে গেল।

বিধবা কন্যা নন্দিনী বড় ভক্তিমতী, ইষ্টদর্শন প্রার্থনা জানালে ঠাকুর বলেন—বাড়ির মধ্যে যে ছেলেটিকে খুব ভালোবাস, শ্রীগৌরাঙ্গ ভেবে সেবা করলে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এইরূপ আচরণে অল্পকালমধ্যেই তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র যাকে সর্বাধিক স্নেহ করিতেন, চৈতন্য বোধে সেবা করায় তাঁহার মধ্যে ভাববিভোর নিমাইচাঁদ দর্শনে কৃতার্থা হন। প্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

(৫৫) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখিয়া গৌরাঙ্গভক্ত নদীয়ার মথুরানাথ পদরত্ন কহেন,—আসল না আসিলে নকলের অভিনয় এরূপ হতে পারে না। তাই তিনি ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনমাত্রই তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য বলিয়া স্তুতি করেন।

ভালো বুঝি বা না বুঝি; আমাদের সঙ্গে একমত না হইলে, অথবা পরের কথায়, স্বভাবদোষে আমরা যাকে তাকে নিন্দা করিয়া থাকি; কিন্তু ভাবি না যে, তাহার অন্তরে কত সুধা বিদ্যমান। দিব্যদৃষ্টিতে প্রভু দেখেন,—গিরিশবাবুর তমোন্মুখ চৈতন্য। এই তম আবরণটি অপসরণ করিলেই অমৃত-উৎস প্রবাহিত হইবে। বোধ হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রিয়ভক্ত নারায়ণের আগ্রহে ভক্ত সঙ্গে একদিন 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে যান। গিরিশবাবুর

স্বভাব, কখনো পরের কথায় ভিজিতেন না ; যতক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি না করিতেন-এই স্বভাব বশতঃ কটুকাটব্য করিয়া কহেন, টিকিট কিনিলে তবে থিয়েটার দেখতে পাবে। ভক্তহৃদয়ে ব্যথা লাগিলেও ঠাকুর হাসিমুখে একটি টাকা দেওয়াইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ পান ;- গিরিশবাবুও কি জানি কি ভাবে টাকাটা লইয়া সিন্দুর-চন্দন মাখাইয়া অতি পবিত্রভাবে রাখিতে বলেন। মুখে যাহাই বলুন, অন্তরে বিগলিত হইয়া ভক্তসহ প্রভুকে সসম্ভ্রমে শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশন করান, এবং প্রহরীর মতো পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিনীত ভাবে বলেন- কালিয় বিষ দিয়া যেমন কৃষ্ণার্চন করেছেন, আমিও সেইরূপ আপনার পূজা করিলাম ; তবে ভক্তহৃদয়ে ব্যথা দিয়েছি বলিয়া ক্ষমার পাত্র।

অভিনয় আরম্ভ হইল, কিন্তু দেখে কে ? যিনি দেখিবেন, পূর্বভাব উদ্দীপনে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় দক্ষিণ ভুজ উত্তোলনে দণ্ডায়মান ! ভক্তগণ থিয়েটার দেখিবেন, না রামকৃষ্ণরূপধারী চৈতন্য দেখিবেন ? দর্শকমধ্যে অনেকেরই ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। ভক্তপ্রবর মথুরানাথের কথা স্মরণে নটগুরুও জীবন্ত চৈতন্য দেখিতেছেন এবং ভক্তসেবা করিতেছেন।

অভিনয়ের পর যখন গাড়িতে উঠিবেন, ঠাকুর বলেন- এমন সময় থিয়েটারের কর্তা হয়েও গিরিশ কাদা-কিচ্চড় রাস্তায় সকলের সুমুখে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করিল। পরদিন ঠাকুরের কাছে যাইলে বলেন-কাল গিরিশ ঘোষের থিয়েটারে গিছলুম, প্রথমে মাতৃ-উচ্ছন্ন করে গাল, পরে কাদার উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বল দেখি এ কোন্ দেশী ভক্তি ? ঠাকুরের ধারণা-তিনি মা কালীর গর্ভজাত সন্তান, তাই আকুলভাবে কহেন-হা রে ! মাতৃ-উচ্ছন্ন করায় মা কালী রুষ্ট হবেন না তো ? শুনিয়াই অবাক ! অমনি প্রার্থনাও হল-মা, নেটো নোচা গিরিশ তোমার মহিমা কি বুঝবে ? তার অপরাধ নিও না। আমাকে বলিলেন- যে এমন করে গাল পাড়ে, আবার তার কাছে যাওয়া কি ভালো ? আমি বলিলাম-আমরা কি বুঝি, আপনি জানেন, আর গিরিশ জানে। জনৈক পণ্ডিত কহিল-অমন লোকের নিকট যাওয়া উচিত নয়। আমরা দেখি বাইরের ব্যাপার, প্রভু দেখেন অন্তরের, আবার লোহকে কাঞ্চন করিতে অর্থাৎ জীবোদ্ধার করিতে যাঁর শুভাগমন এবং নিন্দা-স্তুতির পারে যাঁর অবস্থান, তিনি কি নিজের স্বভাবের ব্যতিক্রম করিতে পারেন, কিংবা জীবকল্যাণে বিরত হইতে পারেন ? তাই পণ্ডিতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়ে কহেন-তুমি তো সবই বুঝ। তার যেমন ভাব, তেমনই করচে, তাতে আমার কি হয়েচে ? গালও দিল, ভক্তিও তো করল। তখন বালকের মতো কহেন-একখান গাড়ি আনতো, গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাই।

গিরিশবাবু বলেন-স্বভাবটা আমার চিরদিনই দাম্ভিক। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে ওঠবার সময় পড়বার মতো হলে, প্রাণভয়ে বলেছিলাম-ভগবান, রক্ষা কর ! পরক্ষণেই বলি থু-থু ; যদি কখনো প্রেমভরে ভগবানের নাম করতে পারি, তখন মানব-জন্ম সার্থক, নহিলে ভয়ে ভগবানকে ডাকব না। তাই অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান অযাচিত হয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন।

কোনো এক মহামান্য ব্যক্তি বলেন-আগে আমি আপনার উপর বিরূপ ছিলাম, আজ কিন্তু আপনার ম্যাকবেথ অভিনয় দেখে বড় খুশি হয়েছি। গিরিশবাবু কহেন -সেকালের রাজারা রুষ্ট হলে শূলে, আর তুষ্ট হলে জায়গীর দিতেন ; তা আপনি যখন উহার কিছুই করেন নাই, তখন আপনার রুষ্টি-তুষ্টি একই কথা। আবার তাঁর দক্ষ-প্রজাপতির অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেন-শালা যেন অংখারে মট মট করচে।

কবিরঞ্জন গাহিয়াছেন—গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়। কিন্তু এই দাম্ভিকতাই গিরিশবাবুর পক্ষে মহৎ গুণ হইয়াছিল। যেহেতু দুষ্কর্মে নিন্দা ভয় বা সৎকর্মে যশোলিপ্সা কখনো তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; শাস্ত্রমতে ইহাই প্রকৃত ত্যাগ। ত্যাগও অসাধারণ ছিল, নীরবে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বন্ধু ও আত্মীয়দের সাহায্য করিতেন, ভিখারীকে সিকি দুয়ানীর কম দিতেন না। একদিন হাতে পয়সা না থাকায় এক ভিখারীকে গায়ের শালখানি দিয়া বলেন—শীঘ্র পালাও, অতুল দেখতে পেলে কেড়ে নেবে। কাছে থাকিয়া দেখিয়াছি—মৃত্যুর ৫।৬ দিন পূর্বে এক আশ্রিতকে পাঁচ শত টাকা দিয়া কহেন—প্রভুর কৃপায় তোমার উপকারে আসিয়াছি বলিয়া ধন্য বোধ করি।

বাল্যকাল হতেই নিষেধ বা তাড়না সহ্য করিতে পারিতেন না। পিতার তাড়নায় হিন্দু স্কুল ছাড়িয়া দিয়া বলেন—ঘরে পড়িয়া এমন পণ্ডিত হব, তাতে কেহ সমকক্ষ হতে পারিবে না; বস্তুতঃ মহাপণ্ডিতই হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্‌সেলার স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অনুদিত ম্যাকবেথ পড়িয়া লেখেন—হিন্দু স্কুলে যখন সহপাঠী, তখন তোমার প্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, কেন যে স্কুল ছেড়ে দিলে, জানি না; ভাব ভাষা ও ছন্দ বজায় রেখে সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ বড় সহজ ব্যাপার নয়; এবং এ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত ইহাতে কৃতকার্য হন নাই।

তিনিও শ্রেষ্ঠ কবি, যাঁর ভাবপূর্ণ রচনায় সর্বসাধারণের অন্তরে দিব্য ঝঙ্কারের উদ্ভব হয়। তাঁহার রচিত চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব চরিত, নসীরাম ও বিল্বমঙ্গল নাটক সাহিত্য-জগতে শ্রেষ্ঠ অবদান। শুনা যায় যে, তাঁহার বিল্বমঙ্গল নাটকখানি পাশ্চাত্যে অনেক ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। তবে পৃষ্ঠপোষক অভাবে রবীন্দ্র উপাধি ভাগ্যে ঘটে নাই। আবার এক রাত্রে সীতার বনবাস নাটকখানির রচনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্কের পরিচায়ক।

তিনিই অদ্বিতীয় অভিনেতা, অভিনয়কে যিনি প্রাণবন্ত করিতে পারেন। কোনো একটি অভিনয়ে বাহ্যহারা হইয়া সমাহিত-চিত্তে আদ্যাশক্তিকে এমন ভক্তিপূর্ণ স্তুতি করেন, যাহাতে ভগবতী পরিতুষ্টা হইয়া বর দিতে চাহিলে, স্বভাবদোষই বল বা অকিঞ্চনতাই বল, কহেন, মা! কোথায় তোমার স্তব করিলাম? এ যে অভিনয়, তাতে বরলাভের যোগ্য নই। তথাপি যদি বরদানে উদ্যতা, ভিক্ষা করি—যে অভিনয়ে পরিতুষ্টা, ঐ শক্তিটা যেন ঘুচে যায়। বলিবামাত্রই মাকালীর খাঁড়া পড়িল। গিরিশবাবু বলেন- তদবধি তাঁহার অভিনয়শক্তি আর পূর্ববৎ রহিল না।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ যাদের স্বভাব, তাদের কে আদর করে? ঐশ্বর্য বা অপবর্গে সাধ নাই, হে ভগবান! কেবল তোমাকেই চাই, ইহাই অকিঞ্চনতা। প্রভুর কৃপায় এইরূপ হন বলিয়াই, একদিন ঠাকুরের কৃপা পরশে, সাধককুলের বাঞ্ছনীয় নানা দেবদেবীর দর্শন হইলেও থু, থু, করিয়া বলেন—আপনিই আমার পরমদেবতা, আপনাকে ফেলিয়া অন্য দেবদেবী? তাই প্রভু প্রসন্ন হইয়া কহেন, গিরিশের পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বুদ্ধি।

থিয়েটারে মত্ত এবং অসৎ সঙ্গনিরত, সুতরাং ভজন-সাধনের অবসর কোথায়? নিবেদন করিলে, কৃপানিধি প্রভু কহেন—আমার উপর বকলমা দে অর্থাৎ ভার দে। কিন্তু সংশয় আসিয়া যেমন বলাইল—পাছে পড়ে যাই? ঠাকুর কহেন—ঢ্যামনা সাপে কাটলে মরে না, কিন্তু জাত সাপে (কেউটে গোখ্‌রে) কামড়ালে এক ডাক, দু'ডাক, তার পর মরণ;

অর্থাৎ আমি যখন তোর ভার নিয়েছি, তুই যা খুশি কর না, তোর জন্ম-মরণের মরণ হয়েছে।

ভক্তিভাবে ভগবানের প্রসাদ ধারণে চিত্ত-প্রসাদ শাস্ত্রবাক্য। আমিষ, নিরামিষ, উপকারী বা অনুপকারী বলিয়া ভ্রান্ত আমরা বিচার করিয়া থাকি ; গিরিশবাবুর এ রীতি ছিল না, প্রসাদে এতই ভক্তি যে, পাইলেই আনন্দে গ্রহণ। অসুস্থাবস্থায় যখন অন্নও পরিপাক হয় না, তখন একদিন বেলুড় মঠে ঠাকুরের প্রসাদী লুচি মোহনভোগ খাবার সময় সতর্ক করায় কহেন—প্রসাদ যে রে! এতে অপকার হবে না। পরদিন জানা যায়, তাঁর কোনো অসুখ হয় নাই। একটি আচরণেই বুঝা যায়, ঠাকুরের প্রতি তাঁর কিরূপ অনুরাগ। পিতৃহীন কনিষ্ঠ অতুলবাবু—যাঁকে অপত্যবৎ পালন করেছেন, কোনো এক দিন ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে কহেন—আর তোমার মুখ দেখতে চাই না, এখনই বাড়ি ভাগ করে পাঁচিল তুলে লও। ভক্ত-বেদনায় ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? অতুলবাবু বলেন—মেজ দাদা (গিরিশ) বাড়ি নাই, বৈঠকখানায় একা বসে ভাবছি, ঠাকুর হঠাৎ এমনিভাবে উপস্থিত যে পালাবার পথ পেলাম না। যেমন বলিলেন—তুমি তো বেশ লোক গো, অমনই অবশভাবে মাথাটি তাঁর পায়ে পড়িল। কল্পতরু দিনে প্রভু ইঁহাকে কৃতার্থ করেন।

প্রকৃতির আশ্চর্যময় বালককে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে এমন বিভোর হইতেন যে, বাগ্মিবর হইলেও বালকের মতো ভাবে গলরুদ্ধ হইত। কল্পতরু দিনে প্রভু যখন বলেন 'গিরিশ! তুমি আমায় কি বুঝ?' অমনই নতজানু হইয়া কহেন ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি যাঁর মহিমাগানে অক্ষম, ক্ষুদ্র আমি কেমন করে তাঁকে বুঝব?

করুণাসিন্ধু প্রভু একদিন শ্রীমাতৃদেবীকে কহেন—'কর্ম বিপাকে ভক্তদের যদি কৃষ্ণ—কি না জন্ম-মরণ মার্গে যেতে হয়, তাই তাদের অন্তিমকালে আমাকে আসতে হবে, আর আমারই আলোয় আমি তাদের আমার ধামে নিয়ে যাব।' বড়ই আশাপ্রদ বাণী!! ভক্তগণ উপলক্ষে গমনাগমনে প্রভুর দিব্য আলোকে যে কত শত জীবের দুর্গতি ঘুচবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই গিরিশবাবু অন্তিম সময় ঠাকুরকে দেখিয়া বলেন—'যদি এসেছ—নেশা কাটিয়ে দাও।' অর্থাৎ মোহ নাশ কর, বলিয়া প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরমধামে গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অতুলবাবু ও সহোদরা দাক্ষায়ণী (নদিদি) প্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন।

(৫৬) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চলিয়া গেলে ঠাকুর বলেন 'ছেলেটা বড় গরীব, অথ চার্য়। যখন কল্পতরু-মূলে এসেছে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।' শ্রীবৃদ্ধির পর যত দিন জীবিত, উপেন্দ্র তত দিন প্রভু ও তাঁর সন্তানদের সেবা করেছেন। সুসন্তান সতীশও পিতৃধারা বজায় রেখেছে।

(৫৭) ব্যাংবাবু—দেবেন্দ্রনাথ বসু

আমাদের বহু পূর্বে বাল্যকালে বাগবাজারের ৺দীননাথ বসুর বাঘওয়ালা বাটীতে প্রভুর পুণ্য দর্শন পান। তার পর বহুকাল পরে প্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হন। ইনি গিরিশ বাবুর নিকট-আত্মীয় এবং একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

(৫৮) তুলসী—নির্মলানন্দ

বলেন—যখন বড় একটা লোক থাকত না, তখন প্রভুর নিকট যাইতেন ও তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতেন। এ জন্য আমরা অনেকে কোনো দিনও তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে দেখি নাই। বাগবাজার বোসপাড়ার যে বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণ হইত, ইনি সেই দত্তবাড়ির সন্তান। গঙ্গাধর ও হরিভাই ইহারা এক পল্লীর ও সমবয়সী। স্বামীজীর আকর্ষণে বরানগর মিলনমন্দিরে যোগদান করেন এবং স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি ত্যাগী, সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও রহস্যপ্রিয়। এক সময় কালী (অভেদানন্দ) ও ইনি যেন মাণিকজোড় ছিলেন। এ জন্য কালীভায়া প্রভুর মহিমা প্রচার জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যান। দাক্ষিণাত্যে ঠাকুরের ভাবপ্রচারকল্পে ইনি অনেক মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

(৫৯) বলরাম বসু

শাক্ত বংশে জন্ম, ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ লাভ, নানা স্থানে শিব-শক্তি বিগ্রহ স্থাপন ও পূজাদির ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষে সরকার হস্তে লক্ষাধিক মুদ্রা দান, শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে জলাশয় খনন, উভয় পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ সমন্বিত পুরী সড়কের অসম্পূর্ণ অংশ এবং গঙ্গার পশ্চিম কূলে মাহেশের বিশাল রথ নির্মাণ, অতিথি সেবা, নিত্যনৈমিত্তিক দান, স্বজন পোষণ, গুরু পুরোহিতকে নিষ্কর ভূমি দানে—কৃষ্ণরাম বসু স্বনামধন্য এবং দেব-মানবের আশিস ভাজন হন।

পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু—এই শাক্ত বংশে প্রথম বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহার বংশ বৈষ্ণব নামে খ্যাত। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী৺রাধা শ্যামসুন্দর এবং কলিকাতা ভবনে শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যাম চাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বসু বংশের উড়িষ্যা জমিদারীর প্রধান কেন্দ্র কোঠারে বিরাজমান।

পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণরামবাবুর বংশে ভক্তচূড়ামণি বলরাম বসুর জন্ম। পিতা রাধামোহন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর জীউর আরাধনায় মাতোয়ারা। পিসি বালবিধবা নিত্য দারুব্রহ্ম (জগন্নথে) দর্শনে আকাঙ্ক্ষিনী। আদিষ্ট হইয়া পিসি সহ পুরীধামে গমন ও তৎকালীন বসু বংশের নিজ বাটিকা ক্ষেত্রবাসী মঠে অবস্থান। পিসির সঙ্গে নিত্য দারুব্রহ্ম দর্শন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তের পূত সঙ্গে বলরামের শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভক্তির সূচনা। ফলে—সাধুসন্ত সেবায় আনন্দে দিনযাপন।

ইহাতে পিতা ও অগ্রজদের আনন্দ, কিন্তু অন্তরে ভয়—পাছে গৃহত্যাগী হন। তাই পিসির মৃত্যুর পর তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার কল্পনায় বর্তমান ভবন (বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বোস স্ট্রীট) ক্রয় করা হয়।

পিতা রাধামোহনবাবু জানান—আর পুরীধামে থাকিবার আবশ্যক নাই। হয় কোঠারে আসিয়া বিষয়কর্ম পর্যবেক্ষণ কর, নয় কলিকাতায় থাকিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের লেখাপড়ার তদারক কর। মানব কেন, জীবমাত্রেই তাহার স্বাধীনতা ও স্বার্থভোগে ব্যাঘাত পাইলে মর্মাহত হয়। বলরামেরও তাহাই হইয়াছিল। তাই পুরুষোত্তমকে সজল নয়নে কহেন—আজ কি অপরাধে আমাকে বিদায় করিতেছ ? কিন্তু ভাবিতে পারেন নাই, আর পারিবেনই বা কিরূপে যে তিনি দারুহরির প্রসন্নতায় নরহরি-সন্নিধানে প্রেরিত হইতেছেন। কলিকাতায় আত্মীয়-স্বজন ও বাল্যবন্ধুগণ তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদনে সচেষ্ট হইলেও,

জগবন্ধু অদর্শনে অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। একদিন বাল্যসখা ৺হারাণচন্দ্র চৌধুরী কহেন—দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিরাজ করেন, তাঁহার দর্শনে প্রাণে শান্তি আসিবে। যাইয়া প্রভুর শ্রীমূর্তি দর্শনে বিভোর হইয়া ভাবেন—দারুব্রহ্ম বুঝি জীবন্ত পূর্ণব্রহ্মরূপ দেখাইতে এখানে আনিয়াছেন। প্রভুও ভাবাবেশে কহেন—তুমি একজন পুরাণ ভক্ত, মহাপ্রভুর সংকীর্তনে তোমাকে দেখে ভাবতুম—কবে আসবে। আরও কহেন—সাধন-ভজন ততদিন—যে পর্যন্ত ইষ্টদর্শন না হয়। আমি যখন তোমাকে আপনার করে নিয়েছি, কৃচ্ছ্রসাধনে আর আবশ্যক নাই, জপের মালা-টালা সব আমাকে সমর্পণ কর। বলরামের আনন্দের সীমা নাই। বলেন, আমি তো একা নই। যদি আমার সকলকে গ্রহণ করেন, সকলে মিলে পুণ্য-দর্শন ও লীলামৃতপানে কৃতার্থ হতে পারি। ঠাকুর কহেন, তথাস্তু। আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৃহে গমন করেন। পরিজনবর্গ তো কথাই নাই, দেখিয়াছি, তাঁর গুরুকুল, পুরোহিতকুল এবং শ্বশুরকুল, সন্তানের গৃহশিক্ষক, এমন কি, দাস-দাসীরাও সকলেই প্রভুর ভক্ত। তদবধি প্রভুর পদার্পণে তাঁহার আলয়ে আনন্দোৎসব হইত। রথযাত্রা উপলক্ষে রথোপরি দারুব্রহ্ম দর্শনে ভাব-বিভোর ঠাকুর এমন আনন্দনৃত্য করিতেন, দেখে ভক্তকুল ভাবিত, রথে দারুহরি দেখিব, না নৃত্যরত-গলিত কাঞ্চন-বপু নরহরি দেখিব।

ঠাকুরের মুখে বলরামবাবুর কথা শুনিতাম বটে, কিন্তু দেখিবার সুযোগ হয় নাই। যেহেতু, তিনি তখন পীড়িত। একদিন অধরবাবুর বাড়িতে যাবার উপলক্ষে বাগবাজারের জগন্নাথ ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া, জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে বিভোর হইয়া কহেন—'যথা তথা কৃষ্ণের কালোবরণ দেখি। এখানে নবনীরদবরণ দেখে আনন্দ হল ; কৃষ্ণের বর্ণ ঠিক ঘাশফুলের মতো, মা কালীর বর্ণও ঐরূপ।' বলরাম-মন্দিরে যাইয়া প্রভু তাঁহার অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন ও ঈশ্বরীয় কথা বলিতেছেন। গৌরকান্তি, দীর্ঘশ্মশ্রু, কোমলকায়, তাতে মাথায় পাগড়ি দেখে মনে হল—ইনি বুঝি শিখ। আর পরিচারকবিহীন অপরিসর শয্যায় শায়িত দেখে ধারণা হল, ভক্ত হলেও স্বভাবে কৃপণ। গাড়িতে উঠিয়া প্রভু কহেন—'শিখ নয় রে! বাঙালীর কায়স্থর ছেলে—বোস। রোগযাতনায় ভগবানকে ভুলে যায় বলে আমি রোগীকে ছুঁতে পারি না, পীড়িত হলেও বলরামের মন ইষ্টচিন্তায় মগ্ন, তাই গায়ে হাত বুলোতে পারলুম ; বিষয়ী হলে পাছে চিত্ত মলিন হয়, তাই ভায়েদের ওপর জমিদারীর ভার দিয়ে যে মাসোহারা পায়, তাইতে সাদাসিদে ভাবে থাকে।

পরে ঘনিষ্ঠতা হইলে দেখি—শরীরের মতো মনও কোমল, সেজন্য প্রেমিক ও মিষ্টভাষী। আমাদের বহু পূর্বে প্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হয়েছেন বলে আমাদিগকে কনিষ্ঠের মতো স্নেহ করিতেন, এবং রহস্য করে বলতেন—তোরা তো আমাদের উচ্ছিষ্ট খাচ্ছিস। অনেক দিন উড়িষ্যা দেশে অবস্থান করায় সামাজিক আচরণ ততটা সুখজনক ছিল না, ভক্তসেবা বিনা আত্মীয়পোষণে আদৌ রুচি ছিল না ; এমন কি, কন্যা, দৌহিত্র ও শ্যালক অনেক দিন বাড়িতে থাকিলে তাদের নিকট খরচার টাকা চাহিয়া লইতেন। বলিতেন—সাধুসেবা ব্যতীত আত্মীয়পোষণ—ভূত-ভোজন মাত্র। ইহাতে পত্নী লজ্জিতা হইতেন। অগ্রজের আগ্রহে কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণময়ীর বিবাহে অনেক টাকা খরচ—তাঁহার মতে অপব্যয়। তাই সারাদিন অস্বস্তি ও মনঃকষ্টে থাকেন। দৈবযোগে প্রভুর প্রিয় সন্তান যোগানন্দ (যোগীন্দ্র) উপস্থিত হইলে, ব্যাকুলভাবে কহেন,—'জানি, সন্ন্যাসীদের

বিবাহেতে খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু তুমি যদি দয়া করে অন্ততঃ একটা মিষ্টি খাও, জানিব, আমার সব সার্থক হল।' তাঁহার কাতরোক্তিতে যোগানন্দকে অগত্যা জলযোগ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়—ইহাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।

শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্য ঠাকুর বলরাম ও তাঁহার পত্নীকে সমধিক স্নেহ করিতেন। তাই কলিকাতায় আসিলেই প্রথমে বলরাম-মন্দিরে পদার্পণ। আবার উৎসব উপলক্ষে ভক্ত-ভবনে অধিক রাত্রি হইলে বলরাম-মন্দিরেই রাত্রি-যাপন। শৌচাগারের দুর্গন্ধে পাছে পীড়া বোধ হয়, বলরামের আগ্রহে তাঁহার প্রশস্ত বারান্দায় শৌচাদি করিলে স্বামী-স্ত্রী সানন্দে প্রভুর মূত্র-পুরীষ মার্জনে ধন্য বোধ করিতেন। পঞ্জিকা-কোণে যে টিপ্পনী থাকিত, তদ্দৃষ্টে জানা যায়, প্রভু শতাধিকবার তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিয়া তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন। কলিকাতায় অগণন ভক্ত থাকিলেও তাহাদের গৃহে কোনো দিনই অন্ন গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-প্রথামত-কুলাচারে শ্রীজগন্নাথদেবকে যে অন্নভোগ নিবেদন করা হইত, শুদ্ধান্ন বলিয়া ঠাকুর তাঁহার আলয়ে সেই অন্ন গ্রহণ করিতেন। বলরামবাবু চিরদিনই জানেন, প্রভু অন্তর্যামী এবং তাঁহার প্রতি সদয় ও স্নেহশীল ; তথাপি খেলার ছলে বা প্রভুর মহিমা প্রচারচ্ছলে একটি থালায় দশ-বারোটি সন্দেশ রাখিয়া প্রভুর নামে উৎসর্গীকৃতগুলি ইতস্ততঃ রাখিতেন এবং ঐ সঙ্গে অপরের নাম করিয়া অবশিষ্টগুলি রাখিতেন। ঠাকুর কেবল তাঁহার গুলিই খাইতেন, আমরা দেখিয়া বিস্মিত।

গুরুপুত্রদের গুরুবৎ শ্রদ্ধা করা বলরামের স্বভাবসিদ্ধ। যে অগ্রজের উপর সমস্ত বিষয়ের ভার, তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের নিন্দা করিলে, ধৈর্যচ্যুত হইয়া কহেন—'বিষয়ী হয়ে সন্ন্যাসীর মর্যাদা তুমি কেমন করে বুঝবে ?' প্রত্যহ গুরুভ্রাতাদের সেবা করা ও সংবাদ লওয়া তাঁহার ব্রত ছিল। বাগবাজার হইতে বরানগর পদব্রজে যাতায়াত করায় কৃপণ বলিলে, কহিতেন- ওরে ইষ্টাপিট ! গাড়োয়ানকে পয়সা না খাইয়ে উহাতে সাধুসেবা ও দরিদ্র-সেবাতে কত মজা (আনন্দ) জানিস ? একদিন মিলন-মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে, আহার্য না থাকায় প্রভুর সন্তানগণ ভজনে এতই মত্ত যে, অন্য দিনের মতো সম্ভাষণে তাঁহারা আজ অক্ষম। গৃহে ফিরিয়া কহেন—সেজবৌ ! আজ ততো সুস্থ নই, কিছুই খাব না। জিজ্ঞাসায় বলেন—ঠাকুরের সন্তানরা উপবাসী থাকবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমার হাতে নানারূপ সুখাদ্য খাব ? শুনিবামাত্র তাঁহার দেবীসমা পত্নী তদ্দণ্ডেই সপ্তাহকালের মতো আহার্য দ্রব্যাদি পাঠায়ে দেন।

কণ্ঠিমালা-তিলকছাপা-নামের ঝুলিধারী বৈষ্ণব তিনি ছিলেন না। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও অনাসক্ত। এমন নিরভিমান দাতা তো সহজে দেখা যায় না ; ভক্ত বা আত্মীয়মধ্যে যেখানে অভাব দেখিতেন বা শুনিতেন, গুপ্তভাবে প্রতিকার করিতেন। ভ্রাতৃদত্ত মাসোহারার টাকায় সংকুলান না হওয়ায় আক্ষেপ করিলে, নরেন্দ্রনাথ যেমন কহেন—নিজের বিষয় নিজে দেখিলে তো স্বচ্ছন্দে থাকিতেন, তাহাতে ব্যথিত হইয়া বলেন—'গড্ অলমাইটি (God Almighty) নরেনবাবু ! আপনার কথা ফিরায়ে নিন্ অর্থাৎ অমন কথা বলিবেন না। আমি কি করে বিষয়ী হব ?' পাঠক এখন বুঝ, বলরাম মানব না দেবতা !

এইরূপে অকৈতব ভক্তিতে প্রভুর সেবা, তাঁর সন্তানদের সেবা এবং দেবদ্বিজ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা—আপনি আচরি ধর্ম অন্যরে শিখায়। এই ব্রত অর্ধশতাব্দী উদ্‌যাপন করিয়া কলিকাতায় প্রথমাগত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে দেহত্যাগ করতঃ প্রভুর পাদপদ্মে স্থান লাভ করেন।

বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সস্ত্রীক সাধুবাবু প্রভুর কৃপালাভে কৃতার্থ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নিত্যানন্দ ঠাকুর ও শ্রীমাতৃদেবী এবং প্রভুর সন্তানগণের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন।

(৬০) জায়া—কৃষ্ণভাবিনী

সন্তানবাৎসল্যে মাতৃজাতি চিরদিনই পূজিতা এবং সন্তানের মা বলিয়া সম্ভাষণে গর্বিতা। প্রভুর কৃপালাভের পর পুত্র হইলে রামকৃষ্ণ নাম রাখা হয়, যেহেতু পুত্রকে ডাকিলে প্রভুরই নাম করা হইবে। সম্ভাষণ সঙ্গে ভগবানের নামে চিত্তপ্রসাদ হয় বলিয়া সকলে তাঁহাকে রামকৃষ্ণের মা বলিত। বিত্তবানের তনয়া ও জায়া বলিয়া কোনো দিনও গরিমা হয় নাই। বসনভূষণে তেমন স্পৃহা না থাকায় এমন সাদাসিদে ভাবে থাকতেন, যাতে জমিদারের ঘরণী বলে বোধ হত না। এত শান্তপ্রকৃতি যে, পরিজনমধ্যে সহসা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমিত হইত না; এতই দাতা যে, হস্তস্থিত বলয় দানে এক প্রতিবেশিনীর কন্যাদায় উদ্ধার করেন। ঠাকুর বলিতেন—'ভগবানের কৃপাপবন তো অনুক্ষণই বহিতেছে, অমানী হয়ে তাতে গা ঢালতে পারলে আনন্দ পাওয়া যায়', এই কারণে রামের মা সদাই অমানী। ঠাকুর বলতেন- 'কৃপণের ধনের উপর যেমন টান, সতীর পতির ওপর যেমন টান, এমনি টান ভগবানের উপর হলে সর্বার্থসিদ্ধি হয়।' প্রভুর প্রতি রামকৃষ্ণের মার যে কি অদ্ভুত টান, তাহা একটি ঘটনায় জানতে পারবেন।

লীলাবিলাস অভিপ্রায়ে যিনি এক হইয়াও বহু এবং রসো বৈ সঃ হইয়াও যিনি আপ্তরস-আস্বাদনে একাকী তৃপ্ত না হইয়া ভক্তকুলকে সে রস পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন, এমন যে প্রভু, (রামলাল দাদা কহেন) একদিন বৈকালে বালকেব মতো বায়না ধরেন—দ্যাখ রামলাল, ঠাকুরবাড়িতে যে দুধ খাই, তাতে স্বাদ-গন্ধ নেই, বড়ো সাধ—সাদা সাদা ধোবা ধোবা মেটো মেটো (মিষ্ট) গন্ধ এমন একটু খাঁটি দুধ খাই; বাজারে কি গয়লা-বাড়ি গিয়ে দেখ দেখি, যদি এমন দুধ মেলে। রামলাল দাদা শুধু হাতে ফিরিলে কহেন—তাই তো? এদিকে বলরাম-মন্দিরে রামের মা সন্ধ্যাবেলা দুধ জ্বাল দিতে দিতে কাঁদছেন আর সঙ্গিনী যোগেন-মাকে বলছেন—দ্যাখ দিদি, এমন দুধ প্রাণভরে ভগবানকে খাওয়াতে পারলাম না, কেবল বাড়ির লোকদের পেটপুজো হবে। তুই যদি পারিস, দুধ নিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যেতে, তাহলে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঠাকুরকে দুধ খাইয়ে আসি। রাতও হয়েছে, কেউ টেরও পাবে না। এই বলিয়া একটা ঘটিতে আধসেরটাক দুধ একটা বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ায়ে দক্ষিণেশ্ব যান। ঘরে প্রবেশ করিলেই প্রভু কহেন—তোমরা বুঝি আমার জন্যে দুধ এনেছ? বিকেল থেকে মনে হচ্ছে, একটু ধোবা ধোবা মেটো মেটো খাঁটি দুধ খাই। বিস্মিতা ও পুলকিতা হয়ে দুজনে কাছে বসে, নন্দরাণী যেমন গোপালকে খাওয়াতেন, তেমনি ভাবে ঠাকুরকে দুধ খাওয়ান এবং আচমন-কল্পনায় আঁখিবারি বর্ষিতে থাকেন। পাঠক দেখ, কি শুদ্ধা ভক্তি এবং প্রভুর কি আকর্ষণ! ঠাকুর বলিতেন—চুম্বকই কেবল লোহাকে টানে না, লোহাও চুম্বককে টানে। ভগবান যেমন ভক্তকে টানেন, ভক্তও তেমনই ভগবানকে টানে, তবেই মধুর মিলন। বৃন্দাবন-চন্দ্রের বংশীরবে ব্রজগোপীরা যেমন কুলশীল জলাঞ্জলি দিয়া তাঁর সনে মিলিয়াছিলেন, এঁরাও সেইরূপ প্রভুর পাদপদ্মে মিলিয়াছেন। এ কারণ ইঁহাদের শুদ্ধাভক্তিসম্পন্না গোপিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়-ক্লেশ, কর্ম-বিপাক-রহিত ভগবান, ষড়ৈশ্বর্য ত্যাগ করে মাধুর্য অবলম্বনে যিনি গুপ্তভাবে এসেছেন, 'তা এখানকে (তাঁহাতে) টান হলে তোদের আর কিছু করতে হবেক নি' বলেই, পরক্ষণে রহস্য করে 'পাগলে কি না

বলে, তোরা আমার কথার ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে নিস' বলে ভুলায়ে দিতেন। দুধ খেয়ে খুশি হয়ে মনে মনে বলছেন—এরাই ব্রজগোপী, শুদ্ধা ভক্তিতে এখানকে (আমাকে) আপনার করে নিলেক। কিন্তু প্রকাশ্যে কপট করে কহিতেছেন—তোমরা কুলের কুলবধূ, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে, তো তোমরা আমার হাতে দাঁড়ি দিবেক না কি? শুনিয়াই এঁরা ভাবেন—যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর। তখন রামলাল দাদাকে দিয়ে একখানা গাড়ি আনায়ে পাঠাবার কালে বলে দেন—বলরামকে চুপি চুপি বলবি—এরা আমার কাছকে এসেছিল, যেন রাগ না করে। হাঁড়ির ভাত একটা টিপলে যেমন জানা যায় সব ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না, তেমনি রামের মার একটি আচরণে জানা যায় যে, ঠাকুরের প্রতি কত অনুরক্তি। সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যোগেন-মাও এ-গল্পটি করেছেন।

(৬১) আত্মজ—রামকৃষ্ণ

প্রতিষ্ঠিত জলাশয়-বারি সুপেয় এবং সন্তান যশস্বী হইলে মানবের পুণ্য-ফল প্রকাশ পায়। বলরামবাবু প্রকৃত পুণ্যবান, নইলে রামকৃষ্ণ অমন সুসন্তান হবে কেন? আবার আত্মজ বলিয়া পিতার গুণরাজি পুত্রেতে বর্তায়। শৈশব হইতেই প্রভুর কৃপাপুষ্ট রামকৃষ্ণ পিতৃপন্থানুসরণ করেন। প্রভুর ভক্ত হরিবল্লভবাবু খুল্লতাত-স্নেহে কৃতবিদ্য হইয়া প্রজাপালনে মনোযোগী হইলেও দেবদ্বিজ-সাধুসঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঠাকুরের সন্তানগণ প্রতি এতই শ্রদ্ধান্বিত যে, তাঁদের সেবা জন্য অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠা করেন নাই। বেলুড় মঠে ঠাকুরসেবা, সাধুদের সেবা, কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমে সাধু-সেবা, সেবাশ্রমে আতুর-সেবা, ভুবনেশ্বরে প্রভুর মানসপুত্র রাখাল মহারাজের সেবা যেন তাঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। এমন দিন ছিল না যে, বাসভবনে বেলুড় মঠের দু-পাঁচজন সাধুর পদধূলি না পড়িত এবং বৃন্দাবন ও পুরীধামের ভবনে সাধুদের ও ঠাকুরের সন্তানদের আশ্রয় ও সেবাদান না হইত। এমন কি, পুরীধামে ঠাকুরের একটি মঠ স্থাপন জন্য মহারাজকে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করেন। শুনিতে পাই, মঠ স্থাপন হইয়াছে।

ঘটনাস্রোত কি ভাবে চলে—বুঝা যায় না। কলিকাতার উন্নতি, না—উজাড় কল্পে বিশাল রথ্যার পরিকল্পনায় বলরাম-মন্দির—ঠাকুরের কেল্লার অনিষ্টাশঙ্কায় কলিকাতাবাসী ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ অভয় দেন যে 'কেল্লা বজায় থাকিবে—যদি উহা সর্ব-সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে অর্পিত হয়।'

রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজ বসতবাড়ি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। ট্রাস্টি করিলেন; রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি যখন অধ্যক্ষ ও সম্পাদক থাকিবেন, সেই দুইজন সাধু এবং পত্নী ও দুই জামাতা। শেষোক্ত তিনজন ট্রাস্টি, তাঁহাদের স্থলবর্তী মনোনীত করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থানুযায়ী দ্বিতল বাড়ির বহির্ভাগের দক্ষিণদিকের দুইখানি ঘর মধ্যে ছোট-খানিতে ঠাকুর ঘর এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইল। হলঘর পাঠ, বক্তৃতা, ভজন, কীর্তনাদির জন্য নির্দিষ্ট রহিল। প্রভুর পূজা ও প্রভুর সন্তানগণের সেবা পূর্ববৎ চলিতে লাগিল।

ধন্য এই বসু পরিবার—যাঁহারা প্রভুকে 'আপনার' করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

(৬২) তনয়া কৃষ্ণময়ী

সকলেই জানে, বিয়ের কনে শ্বশুরঘর যাবার সময় গহনার বাক্স-প্যাঁটরার উপরই মন রাখে। বালযোগিনীর কিন্তু তার বিপরীত। ঠাকুরের যে ছবিখানি নিত্য পূজা করিত, সেই-খানি ও জপের মালা একটি বাক্সে কাঁকে করে গাড়িতে উঠে। শ্বশুরবাড়ি যাইয়াই শাশুড়ীকে কহে—একটি ঘর আমাকে ধুয়ে মুছে দিন, সেখানে এই বাক্সটি রাখব। বরাবরই ঠাকুরের প্রসাদে পুষ্ট, এখানে যাহাতে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হয়, দয়া করে তাই করবেন। নববধূর তপঃপ্রভাব ও নিষ্ঠাভক্তিতে সাহেবীয়ানা স্বামী ও শ্বশুরকুল ধর্মে এতই অনুরক্ত হন যে, সিমলা, দার্জিলিং প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার পরিবর্তে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শনে রত এবং ঈশানুরাগী হন। পাঠক বুঝ—নিষ্ঠাভক্তির কি প্রভাব! ঠাকুর বলিতেন, কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর চোখের মতো।

(৬৩) বলরামের শ্বশ্রূমাতা

বলরামের শ্বশ্রূমাতা এতই ভক্তিমতী যে, আজীবন ঠাকুর প্রণাম করায় কপালের কড়াটি যেন চূড়ামণির মতো হয়েছিল। প্রভুর মধ্যে ইষ্টমূর্তি দর্শনে ধন্যা হইয়া মধ্যমপুত্র বাবুরামকে প্রভুর সেবায় অর্পণ করেন। ঠাকুর বলিতেন—যমে নিলে যতটা শোক না হয়, পুত্র সংসারবিবাগী হলে মায়ের শোকের সীমা থাকে না। কিন্তু এই শান্তমূর্তি তপস্বিনী সানন্দে পুত্রার্পণ করিয়া সমাজে এক বিচিত্র ব্যাপার দেখায়েছেন, জ্যেষ্ঠপুত্র তুলসীরাম ও কনিষ্ঠ শান্তিরাম মাতৃ-দৃষ্টান্তে প্রভুতে সমধিক ভক্তিমান এবং তাঁহার সন্তানগণের প্রতি চিরদিনই শ্রদ্ধাবান।

(৬৪) ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এমন দানবীর ও দুর্গানাম-বিশ্বাসী মহাত্মা সুদুর্লভ। বলেন-যাত্রাকালে দুর্গানাম করিলে শিবদুর্গার তো কথাই নাই, লক্ষ্মীনারায়ণও সযতনে ক্রোড়ে রক্ষা করেন; ব্রহ্মা উচ্চৈঃস্বরে নিরবধি আশীর্বাদ করেন; এমন কি, মৃত্যুর অধিপতি যমও দুর্গানামকারীর স্বস্তিবাচন করেন। ঠাকুর ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অনেকবার ইঁহার ঠনঠনিয়ার ভবনে পদধূলি দিয়াছেন।

(৬৫) যোগেন-মা

বাঙলা দেশে রত্নবেদীতে দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মানসে বহু ব্যয়ে যিনি সহস্রাধিক শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করেন এবং প্রাণতোষিণী প্রণয়নে শক্তিসাধকের সহায়তা করেন, খড়দহের সেই মহাত্মা জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস-বংশের ইনি বধূ। আজকাল মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যেমন আস্তিক্যহীন হয়, ইনি সেরূপ ছিলেন না। ভারত-পুরাণাদি যাহা পড়িতেন এবং কথক ঠাকুরদের মুখে যাহা শুনিতেন, সবই কণ্ঠস্থ, এজন্য অনেক সময় আমরা তাঁর কাছে ভাগবতকথা শুনিতাম এবং নিবেদিতাও তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নকালে ধর্মসম্বন্ধে অনেক উপদেশও গ্রহণ করেন। প্রাচীনা হইয়াও তপশ্চর্যায়—ধ্যান-জপ-পূজায় প্রত্যহ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। যদি আমরা ঘণ্টাকাল ভজন করি তো ঢাক পিটে বেড়াই। এ যোগিনী কিন্তু একেবারে নির্মৎসর! সুতরাং ইঁহাকে বৈদিক যুগের ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসামান্য দানশীলা, মাতৃদেবীর মন্দির নির্মাণকালে অর্থে সামর্থে ও বিবিধ পদার্থে শ্রীমাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ঠাকুর ইঁহাকে সবিশেষ স্নেহ

করিতেন এবং শ্রীমার নিতান্ত অনুরক্তা দেখিয়া মাতৃসখী জয়া বলিতেন। ইঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট প্রভু আশীর্বাদ করেন যে, সমাধিতে দেহাবসান হইবে। লক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্রীমাতৃ-মন্দিরে তাঁর তাহাই হইয়াছিল।

(৬৬) গোলাপ-মা

ব্রাহ্মণতনয়া, নেবুবাগানে বাস। প্রতিবেশিনী বলিয়া ঘনিষ্ঠতায় যোগেন-মা ইঁহাকে গোলাপদিদি বলিতেন। শোকতপ্তা দেখিয়া প্রভু ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করেন। ঠাকুর বলিতেন—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয় (যেহেতু ইহারা ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিকূল), তা ইঁহার সে বালাই ছিল না। লজ্জা তো অনেক কাল পালিয়েছে, উদারতা জন্য ঘৃণাও পরাজিত, মরদানাভাব জন্য নিভীকা, আর 'অসৈরণ সৈতে নারি' বলে স্পষ্টবাদিনী বা মুখরা। গঙ্গাস্নান, দেবদর্শন, শাস্ত্রশ্রবণ যেন স্বভাবজ, দৃঢ় ধারণা, প্রভু তাঁর ইহ ও পরকালের ভার নিয়েছেন। এ বিশ্বাসটি কোটির মধ্যে গুটিকে দেখা যায় কি না সন্দেহ। মাতৃদেবীর প্রতি অনুরক্তা দেখে প্রভু নাম রাখেন বিজয়া; বস্তুতঃ ইঁহাকে বিজয় অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ খোলে জগদম্বার লীলা দেখাবার ইচ্ছায় ঠাকুর একদিন গোলাপ-মাকে দেখান, বদনে যত ওদন দিতেছেন, জ্বালামুখীর মতো জ্যোৎস্নারূপিণী মহাকালী অন্তর হইতে মুখবিবরে প্রকট হইয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিতেছেন। শেষজীবনে মাতৃমন্দিরে আশ্রয় লভিয়া মাতৃদেবী ও তাঁহার ভক্তকূলের প্রাণপাত সেবা করিয়া আমাদের সমক্ষে অন্তিমে ঠিক যেন মাতৃ-অংকে নিদ্রিতা হইলেন।

(৬৭) গোপালের মা

অধ্যাত্ম-রাজ্যের ব্যাপার মানব-বুদ্ধির অগম্য। কোথায় কাঞ্চনপ্রভ, কপালমোচন প্রভু, আর কোথায় মলিনা, মলিনবসনা, কামারহাটির কড়েরাঁড়ি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, যিনি ঠাকুরকে গোপাল বলে ডাকতেন। ভক্ত-প্রদত্ত মিষ্টান্ন উপেক্ষা করে বুড়ীকে বলতেন—কি এনেছ, খেতে দাও, তখন গুটিকতক নারকেল-নাড়ু হাতে দিয়া করুণভাবে কহিতেন, গোপাল! কেমন করে, এই সামান্য খাবার তোমায় দেব? তাতে প্রভু বলিতেন—কেঁদো না গো কেঁদো না, এক সময় (যশোদারূপে) কত ক্ষীর-ছানা খাইয়েছ। গোপালের মা শুনিয়াই অবাক। কলিকাতার কিছু উত্তরে গঙ্গার পূর্বধারে পানিহাটিতে ৺গোবিন্দ দত্তের বাগানবাড়ির একটি নীচের ঘরে থাকতেন। দিবানিশি গোপাল, গোপাল বলে কাঁদতেন আর মালা জপ করতেন। ভাতে-ভাত ফুটাতেও পাছে জপের বিরাম হয়, এজন্য বামহাতে রাঁধতেন, আর ডানহাতে মালা ফেরাতেন। কিছুদিন পরে গোপালকে এমনিভাবে পান যে, গোপাল তাঁর সঙ্গের সাথী হল, গোপাল তাঁর পিঠে চেপে বেড়ায়, হাত মাথায় দিয়ে কোলে শোয়, আবার রান্নার জন্যে বাগানের পালা-পাতাও কুড়িয়ে দেয়, গোপালকে নিয়ে ব্রাহ্মণী এতই বিভোর যে, জপতপ সব ঘুচে গেল, কেবল গোপাল, গোপাল। দক্ষিণেশ্বর আসবার সময় গোপাল পিঠে চেপে আসতেন, কিন্তু ঠাকুরের কাছে এলেই বুড়ীকে ছেড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মিলাইয়া যাইতেন, আবার ফিরিবার সময় বামনীর পিঠে চড়ে যেতেন। খাওয়াইবার সময় ঠাকুর ইঁহাকে বলিতেন—এক সময় কত কি খাইয়েছ, এখন আমি তোমাকে খাওয়াই। মাতৃদেবীকে ইনি বৌমা বলিতেন এবং শ্রীমাও ইঁহাকে শ্বশ্রূবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমধ্যে ইনি গোপালের মা বলিয়া সম্মানিতা। শেষদশায় নিবেদিতার সেবা লইয়া তাকে কৃতার্থা করেন। অবধূতের মতো ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে সদা

ভাবসমাধিতে থাকতেন, বাহিরে হুঁশ ছিল না, কোনো রকমে অল্প অল্প দুধ খাওয়ানো হইত। অবশেষে ভাগীরথীর জলে-স্থলে সজ্ঞানে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগে পরমধামে প্রয়াণ করেন। নিবেদিতা অতিমাত্রায় মুগ্ধা হইয়া কহেন—হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া বাঙালীদের এই অন্তর্জলি প্রথা অতি পবিত্র ও ভগবৎপ্রাপ্তির পরিচায়ক। শাস্ত্র বলেন—এই ব্রহ্মবারি গঙ্গা এবং ইহাতেই প্রাণ বিসর্জন দিতেছি, মনে এই ভাব জাগিলেই কৈবল্যপ্রাপ্তি নিশ্চয়।

পাঠক সন্দ কর না, অধ্যাত্মরাজ্যে সবই সম্ভব। আগমবাগীশ রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত সম্বন্ধে তোমরা যে শোন নাই, এমন নয়। সুতরাং আত্যন্তিক ভক্তিতে ভগবানের প্রকট হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

(৬৮) গৌর-মা (গৌরি-মা)

কালীঘাটের মা কালীর প্রসাদপুষ্টা ব্রাহ্মণ তনয়া যৌবনে বৈষ্ণব তন্ত্রমতে দীক্ষিতা গৌরদাসী ধর্মতৃষা নিবারণে বহু তীর্থ পর্যটন ও বহু সাধুসঙ্গ করেন। পরিশেষে প্রভুর কৃপালাভে ধন্যা হইয়া কহেন—এমনটি তো কোথায়ও দেখি নাই। ঠাকুর ও শ্রীমা ইঁহাকে গৌরদাসী বলিয়াই ডাকিতেন এবং সাধনে সমুন্নতা দেখিয়া প্রভুর নারীভক্তেরা গৌরদিদি বলিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন, আমরাও গৌর-মা বলিয়া ডাকিতাম, ইনিও আমাদের সন্তানের মতো স্নেহ করিতেন। যেমন ত্যাগী, তেমনই বাগ্মী, ভজনগানে আত্মহারা হইতেন এবং সকলকে মুগ্ধ করিতেন। যত দিন সামর্থ্য ছিল, শ্যামবাজার হইতে হাঁটিয়া বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন এবং প্রভুর স্নানের নিমিত্ত এক ঘড়া গঙ্গাজল কাঁকে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাই তাঁহার নিষ্ঠাভক্তির পরাকাষ্ঠা। তপস্যা-প্রভাবে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু কুমারীকে প্রকৃত হিন্দুমতে শিক্ষা দিয়া অক্ষয় কীর্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

(৬৯—৭১) রামলাল দাদা, শিবু দাদা ও লক্ষ্মী দিদি

রামলাল দাদা, শিবু দাদা ও লক্ষ্মী দিদি গুরুবংশ (ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী) বলিয়া গুরুবৎ পূজ্য। ইঁহারা দেবাংশসম্ভূত, এবং দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

(৭২) শরৎচন্দ্র—সারদানন্দ

যদি একাধারে গাম্ভীর্য, তীব্র বৈরাগ্য ও মহাপ্রাণতার সমাবেশ সন্দর্শনে অভিলাষ হয়, শরচ্চরিত্র আলোচনে তাহা পূর্ণ হইবে। কলিকাতার যে স্থলে হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট ষ্ট্রীট মিলিত, তথায় এক অট্টালিকায় জন্ম, এখন উহার উপর দিয়া বড় রাস্তা গিয়াছে। পিতা ৺গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী একজন আদর্শ ভদ্রলোক, মাতা নীলমণি দেবী বহু সন্ততীর প্রসূতি হইলেও স্বভাবে বালিকার মতো। ক্রমান্বয়ে চার কন্যার পর পুত্র হওয়ায় আদরের সীমা ছিল না। স্নেহপুষ্ট না হইলে কোমল হৃদয় অসম্ভব জানিয়া বিধাতা সেইরূপই ব্যবস্থা করেন। প্রথম পুত্র সমুন্নত হইলে কনিষ্ঠ সন্তানগণ তাহার আদর্শ অনুসরণ করিবে, এ জন্য পিতা তাহার সুশিক্ষায় যত্নশীল হন। হেয়ার স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজে বিজ্ঞানাচার্য ফাদার লা'ফোর অধ্যাপনায় বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায়—চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সহায়ে লোককল্যাণ করিবেন। পিতারও উদ্দেশ্য—শরৎ ডাক্তার হইলে তাঁহার ঔষধালয়, তৎসঙ্গে সংসারেরও উন্নতি হইবে।

সনাতন ধর্মে আস্থাবান হইলেও পাশ্চাত্য-শিক্ষা-মহিমায় ব্রাহ্ম সমাজেও সম্পদুপাসনায় যোগদান করিতেন। পরিশেষে সৌভাগ্য বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরে আসিয়া স্নান-পানে পরিতৃপ্ত হন। ইং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন, তখন এল. এ পড়িতেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর চিনিতে পারেন—ইনি ঋষি কৃষ্ণের (যীশু খ্রীষ্টের) পার্ষদ, এবং তজ্জন্য আমরাও পল্‌সাহেব বলে রহস্য করিতাম। এল. এ. পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর কহেন—তাই তো শরৎ, তুই যখন ডাক্তারি পড়চিস, পুঁজ, রক্ত, গু, মুত ঘাঁটবি, তোর হাতে খাব কি করে রে? মনোবিকার নিরাময় জন্য যাঁহার জন্ম, ঠাকুর কেমনে তাঁহাকে দেহবিকার চিকিৎসায় রত হইতে দিবেন? তাই বলেন—ওটা কোনো রকমে ছেড়ে দে না। এক দিকে প্রাণের সাধ, অপর দিকে ঠাকুরের অভিলাষ, এই শ্যাম রাখি কি কুল রাখি দোটানায় পড়ে নিরুত্তর হইলে ঠাকুর বলেন—তুই একবার ছোট নরেনের সঙ্গে দেখা করিস। যাঁহার ইচ্ছায় জীবজগৎ স্ব স্ব কর্মে নিরত, তাঁহারই প্রেরণায় ছোট নরেন কহেন—দেখ শরৎ! সংসারের ভালোবাসা স্বার্থপূর্ণ, ঠাকুরের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, উনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা ভালো বলেন—তাই পালন করা ভালো। প্রভুর ইচ্ছা কি প্রকারে ইঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইল, ভাবিয়া স্তম্ভিত, বলিলেন—তবে আর ডাক্তারি পড়িব না; বরং বি. এ. পড়িয়া প্রকৃতি-রহস্য সমাধানে সচেষ্ট হইব।

ঠাকুর বলিতেন—তিন তাই-এতে শুকদেবের পাকা জ্ঞান হয়েছিল। মনে সংশয় এসেছে বুঝে ব্যাসদেব পুত্রকে জনক রাজের নিকট পাঠান। রাজা গুরু-পুত্রকে বুঝায়ে দেন—আপনার পিতা যে উপদেশ করেছেন, তাই; বিচারে আপনি যা ধারণা করেছেন, তাই, আর আমিও বলছি—আপনি যা বুঝেছেন, আর এখন যা শুনলেন, তাই। এই তিন তাই-এ শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন। শরতেরও তাহাই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিলেন—তোর ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেওয়া ভালো। নইলে হাতে খেতে পারবেন না; সুতরাং উহা ছেড়ে দেওয়া ভালো, ছোট নরেন বলিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় উহা ছেড়ে দেওয়া ভালো, এই তিন ভালোতে ডাক্তারি পড়া বাদ হয়ে গেল। পরদিন শরতের মুখে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিব শুনিয়া ঠাকুর বড়ই খুশি হন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের গুণানুরূপ অনেক রেখা শরৎ অন্তরে বিদ্যমান; সুতরাং তাহা দ্বারা পরিবর্ধন করালে শুভ হইবে। বিদ্যালয়ের শ্রমের পর দূরপথ দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত ক্লেশকর; বরং কলিকাতায় সহজেই সম্মিলনে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিবে। তাই ছায়া নরেন্দ্র গঠন মানসে নরেন্দ্রের নিকট যাইতে বলেন। তদবধি সঙ্গগুণে—নরেন্দ্রগুণে ভূষিত হইতে থাকেন, এবং প্রভুর শ্রীপদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার করুণাধারায় অভিষিক্ত হন।

নবীন ভক্তদের হরিনামের হাটবাজার দেখাতে পানিহাটি যাইলে, ভাবাবেশে বৃষ্টিমধ্যে নৃত্য করায় শৈত্যবশতঃ গলরোগের সঞ্চার হয়। ভক্ত আকিঞ্চনে চিকিৎসা জন্য কলিকাতায় আসিতে সম্মত হন; এবং দিন কতক বলরাম-আবাসে অবস্থান করিয়া, শ্যামপুকুরে একটি বাড়িতে গমন করেন। এখন হইতে যে মহানুভব যুবকগণ প্রভুর সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, শরৎ তাঁহাদের অন্যতম। কিছুদিন পরে প্রভু কাশীপুর বাগানবাড়িতে যাইলে, তাঁহার পরিচর্যা মানসে শৈশব ও কৈশোরের পিত্রাশ্রয় এবং ভাবী উন্নতির সোপান বিদ্যার্জন সানন্দে পরিত্যাগ করেন। নিরাশায় মাতা কহেন—শরৎ!

ছেলেবেলা মাটির পুতুল নিয়ে খেলেছি, তারা কোথায় গেছে ; এখন চামড়ার পুতুল নিয়ে খেলা, ভাবিব, মাটির পুতুলের মতো চামড়ার পুতুল শরৎ আমাকে ফেলে চলে গেল।

বাল্যকাল হইতেই রোগীর সেবা তাঁহার সহজাত ধর্ম, পরিবার মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে, তাহার জন্য সদা ব্যস্ত। কাশীপুরে পর্যায়ক্রমে প্রভুর সেবা করিয়াও, অপর ভ্রাতাকে অবসর দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার হইয়াও শুশ্রূষা করিতেন। সর্বান্তঃকরণে সেবা ও ভ্রাতৃবৎসলতা দর্শনে ঠাকুর তাঁহার প্রতি বড়ই প্রীত হন। সেবাবকাশে সাধনভজনেও সচেষ্ট হইতেন ; এইরূপে সেবা ও সাধন দ্বারা দিনে দিনে আত্মোন্নতি হইতে থাকে। ধ্যানকালে দেবাদি দর্শন বা ভাবপ্রবণতায় আদৌ অভিলাষ ছিল না। আকাঙ্ক্ষা—যাহাতে সর্বভূতে শ্রীভগবানকে দেখিতে পান ; ঠাকুরও আশীর্বাদ করেন—কালে তোর অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

লীলাবসানের প্রাক্কালে প্রভু একদিন নরেন্দ্রনাথকে কহেন—দেখিও যেন এই কটা ছোঁড়া অর্থাৎ সেবকগণ একত্রে সাধন-ভজন করে। তাই বোধ হয় প্রভুর প্রেরণায় হৃদিবান সুরেশ বাবুর প্রচেষ্টায় মুন্সীবাবুদের ভাঙা বাড়িতে মিলন-মন্দির স্থাপিত হয়। প্রভুর অন্তর্ধান পরে শরৎচন্দ্র অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় গৃহে গমন করেন, এবং বি. এ. অধ্যয়নে নিরত হন। কিন্তু পিঞ্জরের পাখি একবার মুক্ত হইলে, আবার কি সে পিঞ্জরে সুখবোধ করে? শরতের ঠিক তাহাই হয়। সান্ধ্যভ্রমণচ্ছলে নরেন্দ্রনাথ বলরাম মন্দিরে আসিয়া প্রভুর লীলামৃত অনুশীলনে প্রত্যহ আনন্দলাভ করিতেন। এমন সময় বাবুরাম ভায়ার মাতার অনুরোধে বড়দিনের ছুটির সময় তাঁহার আঁটপুর ভুবনে যাইয়া মেরিনন্দন প্রভু যীশুর জন্মরাত্রে ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যান ও ভজনকালে কাশীপুরের ব্যাপার স্মরণে বিভোর হইয়া অগ্নি সাক্ষ্যে প্রতিজ্ঞা করেন—আর তো ঘরে যাব না, প্রভুর আরাধনায় প্রাণপাত করিব। সুতরাং দু-চারদিন পরেই মিলন-মন্দিরে সমাগত হন।

মানব আমরা প্রতিদান-কামনায় পুত্রপালন করি, নৈরাশ্যে ব্যথিত হই, এবং হওয়াই সম্ভব। এইরূপে অনেকের পিতা মর্মাহত হইয়া যাইলে শরৎ বলেন—যে মনকে একবার ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি, কি করে আবার তাকে সংসারে নিয়োগ করিব? ঐশ্বর্য কামনায় দশানন যেমন এক একটি করিয়া দশটি মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি দেন, ভগবান লাভ জন্য বহু মস্তক-সমন্বিত আত্মীয়-স্বজনকে তাঁহারই শ্রীপদে আহুতি দিব। যে পশু, সে পিতৃমাতৃস্নেহ উপেক্ষা করিতে পারে? ধৈর্যবলে সহ্য করিব, পিতামাতা হইতে যে ভালোবাসা পাইয়াছি, তদ্দ্বারাই পরম পিতার উপাসনায় ধন্য হইব, এবং জনক-জননীদেরও ধন্য করিব।

ঠাকুর বলিতেন—অনিষ্ট আশংকায় চারাগাছকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। বিশ্বসৃষ্টি-মধ্যে সকলের ছোট আমি, এ সময় প্রতিনিয়ত বাধা পাইলে কিরূপে অভীষ্টলাভ করিব? সুতরাং ঈশানুসরণে বিঘ্নকারীদের নিকট হইতে দূরে পলায়নই শ্রেয়ঃ। এই সিদ্ধান্তে জলধি-কল্লোলে পরাভূত হইয়া যথায় অন্তরের কোলাহল প্রশমিত হয়, অরূপের প্রতীক দারুব্রহ্ম দর্শনে ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া যথায় সকল জাতিতে একত্রে মহাপ্রসাদ লাভে ধন্য হয়, সেই পরম ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সারদা, নিরঞ্জন ও বাবুরামভায়া সহযাত্রী। যিনি জগৎসংসারকে সযত্নে পালিতেছেন, সেই বিশ্বম্ভর কি তাঁহার প্রাণাধিক সন্তানদের উপেক্ষা করিবেন? তাই তাঁহারই প্রেরণায় ভক্ত হরিবল্লভ বাবু কলিকাতা হইতে চাঁদবালি পর্যন্ত জাহাজ, তথা হইতে গো-যানযোগে কটক হইতে ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্র গমনের

ব্যবস্থা করেন। কেবল তাহাই নহে, ভোজন বিনা ভজন কলিযুগে অসম্ভব বলিয়া এমারমঠে ক্ষুৎব্যাধির চিকিৎসা ও অবস্থানের বন্দোবস্ত করেন। কখনো পুরুষোত্তম দর্শনে, কখনো বা সাগরতটে অনন্তের ভাবে এমন বিভোর হইতেন যে, সময়ের ঠিক-ঠিকানা থাকিত না। এইরূপে তপস্যা-প্রভাবে অহমিকা ক্ষয় করিয়া ক্ষীণকায়ে মিলন-মন্দিরে প্রত্যাগত হন।

জগবন্ধু সম্বন্ধে নানা ইতিবৃত্ত আছে। পাণ্ডারা বলেন—দ্বারকাপুরী সমুদ্রগ্রাসিত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভৌতিক দেহ ভাসিতে ভাসিতে এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলে শ্রীবিগ্রহ-পঞ্জর উদ্ধার করিয়া নীলাচলে স্থাপন ও অর্চনা করা হয়। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক বর্তমান অসমাপ্ত বিগ্রহমধ্যে ঐ বিষ্ণুপঞ্জর রক্ষা করত, লক্ষ শালগ্রামশিলানির্মিত রত্নবেদিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা হইতেছে। মনীষীগণ বলেন, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, বৌদ্ধমতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক। এখনও শ্রীমন্দিরের পূর্বাংশে এক মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড ধ্যানমূর্তি আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখা যায়। বুদ্ধদেবের একটি দন্তও জগন্নাথ-বিগ্রহমধ্যে প্রোথিত আছে। বুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া এখানে জাতিভেদ নাই। শাক্তরা বলেন—শ্রীক্ষেত্র একান্নপীঠের এক পীঠস্থান বলিয়া ভগবতী বিমলা দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জগন্নাথ ভৈরবরূপে পীঠ-রক্ষক। পরে বৈষ্ণবগণের শ্রীসম্প্রদায়ের অধিকারকালে মূর্তিত্রয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বলিয়া অর্চিত হইতেছে, এবং শ্রীসম্প্রদায়ের তিলকও মন্দিরচূড়ায় শোভা পাইতেছে।

তীর্থযাত্রা

জ্ঞানলাভেচ্ছায় ঋষিগণ পুরাকালে জ্ঞানদায়িনী জগদ্ধাত্রী দুর্গার অর্চনা করেন। পরে নবদ্বীপরত্ন ভগবতীসন্তান কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বাঙলাদেশে দেবীর প্রতিমাপূজা প্রবর্তন করেন। ঠাকুরের সন্তানগণও মিলন-মন্দিরে জ্ঞানদায়িনী মাতার পূজার্চনা করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছায় শরৎচন্দ্র ভগবতীর জন্মস্থান ভূস্বর্গ হিমাচলোদ্দেশে যাত্রা করেন, ছায়ার মতো আমি অনুগমন করি। বিষ্ণুপাদপদ্ম শিরোধারণে গয়াসুর যথায় পিতৃকুলের মুক্তিক্ষেত্র হইয়াছেন, প্রথমে প্রভুর উদ্ভবস্থান সেই গয়াধামে গমন হয়, তথা হইতে তথাগতের বোধি-প্রাপ্তিস্থান বোধগয়া দর্শনান্তে বিশ্বনাথরাজধানী কাশীধামে যাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃতে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিতেছি। সত্যই কি কাশীনাথ অন্তিম-সময়ে জীবের দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র দান করেন,—এইরূপ আলোচনা করিতেছি, এমন সময় সহসা একটি মূষিক আমাদের সমক্ষে দু-চারবার পাক খাইয়া, মৃতপ্রায় হইলে, কৌতূহল বশতঃ বার বার বামকর্ণ উঠাইয়া দিলেও পূর্ববৎ দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলনে প্রাণত্যাগ করিল। দেখিয়া বিশ্বনাথোদ্দেশে প্রণাম পুরঃসর বলিলাম—প্রভো! তুমি সত্য, তোমার মহিমাও সত্য।

বারাণসীতে সপ্তাহকাল অবস্থানে নানা দেবদেবী দর্শনান্তে লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্র-রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে যাওয়া হয়। ইহা বড়ই শান্তিপূর্ণ তীর্থ; আরত্রিকসময় ঘড়ি-ঘণ্টার সীতারাম নামকীর্তন বড়ই মনোহর। সরযূর পূতসলিলে যথায় সানুজ শ্রীরামচন্দ্র লীলাদেহ ত্যাগ করেন, এবং রাম-বিরহ দুঃসহ বোধে যথায় রামভক্ত অযোধ্যা-বাসী তাঁহার অনুগমন করেন, তাহার নাম স্বর্গদ্বার। এই স্বর্গদ্বার ঘাটে স্নানকালে

মনে ধিক্কার আসিল—হায় রে! সে কাল; আর আমরা কঠিনপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান আজও দেহভার বহিতেছি।

অযোধ্যা হইতে হরিদ্বার। স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডে বর্ণিত—ব্রহ্মবারি সুরেশ্বরী স্রোতোবেগে যেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া জীবোদ্ধার জন্য মর্ত্যলোকে প্রবাহিতা, তাহার নাম গঙ্গাদ্বার। সর্বজীবাশ্রয় ৺কেদারনাথ দর্শন পথের দ্বারস্বরূপ বলিয়া শৈব শাক্তগণ এই স্থানকে হরদ্বার বলেন। আবার বদরিকাশ্রমস্থ শ্রীমন্নারায়ণ-দর্শন যাত্রা জন্য যে ক্ষেত্র হইয়া যাইতে হয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহাকে হরিদ্বার কহেন।

হরিদ্বারের পূর্বদিকে মুক্তিক্ষেত্র মায়াপুরী কনখল—যথায় ভগবতী দাক্ষায়ণী সতী লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন, এবং নারীকুলকে পাতিব্রত্যধর্ম-শিক্ষা-দানোদ্দেশে, পতিনিন্দা শ্রবণে পিতৃপ্রদত্ত দেহ বিসর্জন করেন। আবার মানবকে দাম্পত্য ধর্মজাত পরাপ্রেম শিখাইবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইয়াও প্রেমিক-শিরোমণি দেবদেব সতীদেহ স্কন্ধে ধরিয়া উন্মত্তবৎ নৃত্যকালে নারায়ণচক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বময় নিক্ষেপ করিলে যে মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে, এই মায়াপুরীই তাহার উদ্ভবস্থান। ভাঙ্গড়ের সবই বিটকেল, যখন দেখিলেন যে, স্কন্ধ সতীদেহশূন্য, তখন পরম প্রেমিক ভৈরবরূপে পীঠরক্ষক হইয়া কহিলেন—এই সকল মহাপীঠে অনন্যচিত্তে উপাসনা করিলে, মহামায়ার প্রসাদে সাধক তাঁহার তুরীয় ধামে গমন করিবে। এই মহাপীঠ একান্নটি। অনির্বচনীয় প্রেম। যাহার কণামাত্র লাভে জীব কৃতার্থ হয়। পাণ্ডারা বলেন—সতীশোকে প্রসূতির বিলাপরব আজও পর্যন্ত রাত্রিশেষ হইতে দিবা প্রথম প্রহর পর্যন্ত ভোঁ ভোঁ শব্দে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকেই শোকোচ্ছ্বাস ডাড়ু কহে। মায়াপুরীর উত্তরে গঙ্গার পরপারে চণ্ডীর পাহাড়, যথায় মা রণচণ্ডী মহিষাসুরাদি অসুর বিনাশ করিয়াছেন।

হরিদ্বারের দশ-বারো মাইল উত্তরে পুণ্যস্থান হৃষীকেশ। পথিমধ্যে সুষুয়া—সোয়াং নামে দুটি খরস্রোতা তটিনী; ইহাদের বারি এমন হিতকারী যে, স্নান-পানে জরযোগে ক্ষীণকল্মষ হইতে হয়। স্কন্দপুরাণে উক্ত—পুরাকালে রৈভ্যদেবের তপস্যায় প্রীত হইয়া নারায়ণ কুব্জ আম্র হইতে প্রকট হইয়া বর দিতে চাহিলে মহর্ষি কহেন—এই তপঃক্ষেত্রে অকিঞ্চন হইয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করিবে, আপনার প্রসাদে তাহার যেন সিদ্ধিলাভ হয়; এই হেতু ইহার নাম কুব্জাম্রক ক্ষেত্র। ভগবতী গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গুপ্তভাবে সরস্বতী তীর্থ সম্মিলিত হওয়ায় প্রয়াগ বলিয়াও বর্ণিত। কুল, বেল, আম, ডুম্বুর ও দেবদারু প্রভৃতি পাদপ-পরিশোভিত হৃষীকেশের সৌন্দর্য অনুপম, হিমালয়ের এক উপত্যকায় অবস্থিত। চেতন জাহ্নবী অহর্নিশ হর হর রবে প্রবাহিতা। অন্য স্থানে চিত্তনিরোধ জন্য কতই না প্রয়াস পাইতে হয়, কিন্তু এই পুণ্যক্ষেত্রে সুরধুনী নিশ্বসিত হর হর রবে মনঃসংযোগ করিলে মন সহজেই বিভূমহিমায় বিভোর হয়; কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ। তবে মনের অবস্থা বিশেষে উপভোগ্য। বস্তুতঃ এমন শান্তিপূর্ণ স্থান জীবনে এই প্রথম মিলিল। সহস্রাধিক সাধুসমাগম হেতু ইহার আর একটি নাম ফকিরাবাদ, মহাপ্রাণ কম্‌লিবাবার প্রচেষ্টায় ধার্মিক ধনিকগণের দানে অন্নসত্র স্থাপনে আহার্যও সুলভ। শীত দুর্দান্ত; জীর্ণ কুটিরে তৃণশয্যায় জাহ্নবীপ্রসাদীবায়ু-পরশে নিদ্রা অসম্ভব। চৈতন্যদায়িনী ভগবতী হর হর রবে যেন বলিতেছেন—তাপস! এ স্থান নিদ্রার নয়, উঠ, ভগবৎধ্যানে নিরত হও; বস্তুতঃ এ প্রচণ্ড শীতে ধ্যানযোগ বিনা দেহকে উষ্ণ রাখিবার উপায়ান্তর নাই। প্রাচীনতম শংকরগিরি নামে এক সাধু এখানকার নিয়ামক, কাহারও ত্রুটি-বিচ্যুতি

দেখিলেই ভৎসনা-তৎপর। জিজ্ঞাসায় বলেন—অর্ধশতাব্দী পূর্বে এখানে আমরা মাত্র বিশ পঁচিশজন সাধু ছিলাম, অন্নসত্র ছিল না, আহার্য বন্য ফল ও বেল, কদাচিৎ দূর-পল্লীতে এক-আধখান রুটি মিলিত, তপস্যাই ছিল বৃত্তি। গঙ্গাতীরে ধ্যানকালে এক মহাত্মা ব্যাঘ্র-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও সোঽহং বলিয়া দেহত্যাগ করেন। আর এক মহাপুরুষ গঙ্গাতটে ধ্যানাবস্থায় বন্যা আসিলেও ধ্যানচ্যুত না হইয়া কহেন—অহোভাগ্য! ব্রহ্মবারিতে আজ অহমিকাকে বিসর্জন দিব। অতি বৃদ্ধ আমি এখন মায়ের গদিতে (ক্রোড়ে) থাকিয়া বেদধ্বনি হতেও মনোহর মায়ের এই হর হর ধ্বনি শ্রবণে বিভোর; সুতরাং স্থানান্তর গমনের স্পৃহা নাই, মায়ের ক্রোড়েই সমাধি লইব।

এখানে হরিভাই, কালী ও তুলসীসহ সম্মিলন। সুতরাং মিলন-মন্দিরের ভাবের উদ্দীপন হইল। একত্রে স্নান, ভোজন, ভজন ও প্রভুর লীলামৃত অনুশীলন দেখিয়া এখানকার সাধুরা বলেন—এই বাঙালী স্বামীদের প্রীতিপূর্ণ আচরণ অতীব আনন্দজনক। একদিন শরৎচন্দ্র উল্লাসভরে আমাকে কহেন—প্রভুর কৃপায় এই পুণ্যক্ষেত্রে আজ হতে আমি মনের সঙ্গে পৃথক হয়েছি, উহার কার্যকলাপ আর আমাকে ভুলাতে পারিবে না, এখন আমি যেন দ্রষ্টা। বড়োই আনন্দ হইল, বলিলাম—বৈদিক ঋষি গাহিয়াছেন—একটি বৃক্ষে দুটি পাখি, একটি ফলাস্বাদে সুখ-দুঃখ বোধ করে, অপরটি দ্রষ্টামাত্র, নিজ মহিমায় বিভোর, তোমার তাই হয়েছে; জীবরূপে জন্মিয়া প্রভুর কৃপায় তুমি যে শিবত্ব লাভ করেছ, এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই।

অমৃতে (মিষ্টান্নে) অরুচি হইলে কটবম্ল সেবনই বিধি; তেমনই তপস্যায় অবসাদ আসিলে তীর্থভ্রমণ শুভকর। তাই শিবচতুর্দশী উপলক্ষে হৃষীকেশের পূর্বদিকে গঙ্গার অপর পারে নীলকণ্ঠ পর্বতে যাত্রা হয়। ইহা একটি উচ্চতর শৃঙ্গ। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশনে সতীদেহ স্কন্ধশূন্য দেখিয়া প্রেমময় শঙ্কর বিশ্বসংকটনাশ বাসনায় নির্বেদচিত্তে তাঁহার হৃদিস্থ সতী ব্রহ্মময়ীর অবাধ চিন্তা উদ্দেশে যে সমুচ্চ পর্বতে গমন করেন, তাহার নাম নীলকণ্ঠ পর্বত। পর্বতের পর পর্বতারোহণে পর্বতমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বোধ হইল—গলিত রৌপ্যধারাসমা স্বর্ণদী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে করিতে কি জানি কি ভাবে আবার যেন স্বর্গপানেই যাইতেছেন। দৃশ্যটি বড়োই মনোহর। স্থানটি বড়োই মনোরম, সান্ধ্যসমীরণ পুষ্পগন্ধ বহিয়া দিক আমোদ করিতেছে, বিহগকুল আশ্রয়-আশে কাকলী করিতে করিতে দিকে দিকে ধাবিত। নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে পীঠ প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে, যেন বলিতেছে—শান্ত হও, আমার মতো শিবগুণ-গানে শান্তিলাভ কর। পাছে যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গ হয়, এই আশংকায় চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পীঠ দর্শনে মনে হইল—যেন আমাদের ধ্যানমঙ্গল বৃদ্ধির অভিলাষে কল্যাণময় শঙ্কর এইমাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দর্শন জন্য ধ্যানযোগই একমাত্র উপায়, আমরাও ধ্যাননিরত হইলাম।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই কবি; শিবব্রতের দিন উপবাসী হইয়াও সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার দর্শন-বাসনায়, এই আসছি বলে অপরাহ্নকালে ভ্রমণে বহির্গত। সন্ধ্যাসমাগমে মনে হইল, এখনই ফিরিবেন, রাত্রি প্রহর-প্রায় তবুও দেখা নাই। উৎকণ্ঠায় শরৎ শরৎ বলিয়া উচ্চ আহবান করিলেও, উত্তর না পাইয়া সশংকচিত্তে মঙ্গল-কামনায় শিব সন্নিধানে সারারাত্রি প্রার্থনা। পরদিন প্রত্যুষে শরৎচন্দ্র প্রকাশ হইয়া আনন্দ দান করেন, বলেন—তোমাদের নিকটেই নীচের পাহাড়েই ছিলাম; অন্ধকারে অগ্রসর অসম্ভব বুঝিয়া বস্ত্রাবরণে এক

শিলাতলে বসিয়া পরম শিবের ধ্যানে কৃতার্থ হইয়াছি। এইরূপে নীলকণ্ঠ পর্বতে শিবব্রত পালন করিয়া পরদিন হৃষীকেশে প্রত্যাবর্তন।

হৃষীকেশে ছয় মাস থাকিবার পর চৈত্র সংক্রান্তিতে শরৎ, আমি ও হরিভাই তিনজনে কেদার-বদরী দর্শনে যাত্রা করি। পাহাড়ে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, সরকার বাহাদুর লছমনঝোলা (মালভোগা গাছের ছাল-নির্মিত দোলায়মান সেতু। এখন সদাশয় সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালার বদান্যতায় লৌহসেতু) পার হইয়া যাত্রিগণের সুগম পথ বন্ধ করিয়া দিলে, বক্র পথ ধরিয়া, অর্থাৎ মনসুরি পাহাড় (মুসৌরি শৈলনিবাস) হইয়া উত্তর-কাশী ও গঙ্গোত্তরী দর্শনান্তে বন্য পথে কেদার গমনের সংকল্প হয়। প্রত্যুষে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিনশেষে ধিনোল্টি নামক স্থানে পেঁছানো যায়। জীবনে এই প্রথম চিরতুষারপর্বতমালা দর্শনে এতই উল্লাস হয় যে, শ্রান্তি বিস্মরণে অনেকক্ষণ ধরিয়া রজতগিরিনিভ চন্দ্রচূড়ের ধ্যানে অতিবাহিত হয়। পরে প্রভুর কৃপায় বিজন পাহাড়ে এক বাবাজীপ্রদত্ত মুষ্টিপ্রমাণ অন্নে ক্ষুৎশান্তি করিয়া এক প্রস্রবণ-পার্শ্বে রাত্রি-যাপন; এইরূপে দিনত্রয় পরে উত্তরকাশী দর্শনে সকল ক্লেশ দূর হয়।

পর্বতমালাপরিবেষ্টিত এবং জাহ্নবীপরিধৌবিত উত্তরকাশী—অতি রমণীয় স্থান; এখানে শতাবধি বিরক্ত সাধু গ্রীষ্মকালে তপশ্চর্যা করেন, এবং সত্র হইতে যে যৎসামান্য আহার্য পান, তাতেই প্রাণ ধারণ করেন। কল্পতরু আশুতোষ ভক্তকে কাশীরাজ্য প্রদান করিয়া এই পুণ্যস্থানে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া ইহার নাম উত্তরকাশী। সুবৃহৎ বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও বারাণসীর মতো শ্রীঅন্নপূর্ণার প্রতিমূর্তি নাই; তৎপরিবর্তে ঘণ্টার মতো কঠিন ধাতুনির্মিত স্থূলকায় ও আট দশ হাত উচ্চ যে একটি শূল প্রোথিত আছে, তাহাকেই শক্তিজ্ঞানে পূজা করা হয়। ইহার গাত্রে যে লিপি ক্ষোদিত, তাহা কোন্ ভাষায়, এ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। এখান হইতে গঙ্গোত্তরী গঙ্গার উৎপত্তিস্থান-দর্শনে যাওয়া যায়।

ভাগ্যবানের পক্ষে বেদনাই বন্ধু, বেদনা বিনা অন্তরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। দেহ সুদৃঢ় হইলেও শরতের পদতল সুকোমল; একারণ নগ্নপদে দু পাঁচ দিন ভ্রমণে এরূপ বিক্ষত হয় যে, অগ্রগমন অসম্ভব। বিজন প্রদেশে বিপন্ন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করায়, সানুনয়ে কহেন—একটিকে ছাড়িলে যদি প্রভুর আর দুটি সন্তান নিরাপদ হয়, আর তিনজনের স্থানে যদি একজন অনাহারে থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি কতটা নির্ভরশীল, বোধ হয়, ইহাই দেখিবার ইচ্ছায় প্রভুর এই বিধান। তোমরা অগ্রজ, আশীর্বাদ কর, যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি। অগত্যা আমরা ব্যথিত-হৃদয়ে বিদায় লই। দৈবযোগে পুনর্মিলিত হইলে একটি গুহা দেখায়ে কহেন—খঞ্জপদে চলিতে অক্ষম হইয়া এই গুহাতে জলশৌচের স্থানে মৃত্তিকা-শৌচ করিতে বাধ্য হই। তখন বলিলাম, আতুরের নিয়ম নাস্তি, ঠাকুরের এই কথাটি কি বিস্মরণ হয়েছ? আরও বলিলাম—রামচন্দ্রের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার জন্য লক্ষ্মণ বশিষ্ঠদেবকে আনিতে গিয়া দেখেন যে, ঋষি আচারবান নহেন; তখন তাঁর সংশয়-নিরসনে ঋষি কহেন—শীতপ্রধান উত্তরাখণ্ড হিমাচলে তপস্যাই সদাচার। সুতরাং অনাচারও এখানে আচারবৎ। আবার প্রভুর কৃপায় যখন শিবত্ব লাভ করেছ, তখন আচার অনাচার তোমার পক্ষে সমতুল। এইরূপ আলাপনে ক্রমে ধরেলিতে উপস্থিত হই।

এক দিকে অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী, অন্যদিকে সমতলক্ষেত্র—ধরেলির দৃশ্য বড়ই মনোরম।

গঙ্গার দক্ষিণ তটে বাঁধা ঘাট, শিবমন্দির ও ক্ষুদ্র পল্লী, উত্তর ভাগে গগনস্পর্শী শিখর হইতে সোপানাবলির ন্যায় বৃহৎ জলপ্রপাত ; তাহার উপর রবিরশ্মি বিকিরণে অগণন ইন্দ্রধনুর প্রকাশ হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল, যেন অনুরাগী নগরাজ বিবিধ বর্ণধারা দিয়া উদাত্তস্বরে সুরধুনীর তর্পণ করিতেছেন ; তাহাতে বাষ্প ও ফেনপুঞ্জের উদ্ভবদর্শনে মনে হইল, ভক্তের আরাধনায় পরিতুষ্টা ভগবতী যেন অবগুণ্ঠিত হইয়া অলক্ষ্যে আশীর্বাদ করিতেছেন। পিষ্টকাকার ভিক্ষান্ন লোভনীয় হইলেও এত তিক্ত যে, ভক্ষণে অন্নপ্রাশনের অন্নই বা উঠিয়া যায়। কিন্তু নির্বিকার শরৎচন্দ্র সানন্দে উদরপূর্তি করিলেন।

এখান হইতে ভৈরবঘাটি, এ স্থানে স্বর্ণদী দুটি ধারায় বিভক্তা। ভৈরবনাথ-সমীপে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে গঙ্গোত্তরী পেঁছানো যায়। হরশিরোবাসিনী সুরধুনী যে স্থান হইতে নিঃসৃতা, তাহারই নাম গঙ্গোত্তরী। কিন্তু অত্যুচ্চ ও অরণ্যপূর্ণ পর্বত আরোহণ প্রাণান্তকর দেখিয়া ভগবান শংকরাচার্য আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া যাত্রিগণের স্নানদানার্থ যে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গোত্তরী তীর্থ কহে। স্থান অতীব শীতল, জলও ততোধিক ; একারণ এস্থানে চাল-ডাল সুসিদ্ধ হয় না ; গঙ্গার পরিসর মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত এবং গভীরতা জানু-পরিমাণ। তুষারদ্রব নীরে কোনোমতে নিমজ্জিত হইলে, অঙ্গ অসাড় হইয়া স্ফীত হইতে থাকে, পরে দেহ অবসাদে কম্পন আরম্ভ হয়। সুতরাং স্নানার্থিগণ স্বাচ্ছন্দ্য-বাসনায় তটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। কম্পনকালে অগ্নিসেবা আরামপ্রদ ; কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় অগ্নির উত্তাপে অনিষ্টাশংকা। স্নানকালে দেখা গেল—তিনটি মেমসাহেব পাহাড়ী-পরিবেষ্টিতা হইয়া যেন কিছু অংকন করিতেছেন। কৌতূহল বশতঃ নিকটে যাইলে জানা যায়—পর্বতগাত্র ও অরণ্যানী কাটিয়া পদরক্ষামতো পথ প্রস্তুতে অতি কষ্টে দুই দিন পরে গোমুখী যাইয়া যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহারই চিত্র লিখিতেছেন। আমাদের বলেন—চিরতুষার পর্বতমধ্যে একটি হ্রদ ; তুষার-রাশি বিক্ষিপ্ত ও গলিত হইয়া ঐ হ্রদে পড়িতেছে। তথা হইতে ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত এবং নিম্নদেশে সংকুচিত দেখিতে যেন অনেকটা গোমুখাকার একখানি শিলাতল দিয়া ঝর ঝর করিয়া যে স্রোতটি বহিতেছে, তাহারই নাম গঙ্গানদী এবং এই সুবৃহৎ শিলার নাম গোমুখী। কিন্তু বহুদিন পূর্বে সরকার বাহাদুরের নিয়োগে যিনি ঐ প্রদেশ পরিদর্শন (survey) করিতে গিয়াছিলেন, বলেন, ঐ হ্রদ হইতে আরও দুটি ধারা ভিন্ন দিকে গিয়াছে, একটি মন্দাকিনী, অপরটি অলকানন্দা ; এবং এই কারণেই মন্দাকিনী ও অলকা-নন্দা গঙ্গা বলিয়াই কথিত। কারণ, মন্দাকিনী ও অলকানন্দার যদি পৃথক উৎপত্তিস্থান থাকিত, তাহা নির্ণীত ও প্রকাশিত হইত। ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ইনি আলমোড়া নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ ব্যক্তি, আলমোড়ায় যাইলে, ইঁহারই মুখে এইরূপ শুনা যায়।

পর্বতারোহণ দুরূহ ব্যাপার, উত্থানকালে ছাতি ফাটিয়া যায়, এবং অধিক সময় লাগে, কিন্তু অবতরণ সহজ হইলেও বিপজ্জনক ; ঠিক যেন কে গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিতেছে, তাল সামলাতে না পারিলেই খাদে (পর্বতমূলে) পতন ও মৃত্যু ; এ-কারণ তৃতীয় চরণ-স্বরূপ যষ্টিই বিশেষ অবলম্বন। গঙ্গোত্তরী হইতে অবতরণ করিয়া ভাটোয়ারীতে আগমন। এখানে সেতু দ্বারা গঙ্গা পার হইরা কেদারনাথ গমনের একটি পাকদণ্ডী অর্থাৎ পা রাখিবার মতো আঁকাবাঁকা পথরেখা আছে ; বিপদসংকুল বলিয়া যাত্রীরা তো এ-পথে যায়ই না, পাহাড়ীরাও ক্বচিৎ চলিয়া থাকে। মনের সংকল্পই যতো অনর্থের মূল ;

'বিচার দ্বারা দমন করা সম্ভব ; কিন্তু যাহারা দুঃসাহসী, বিপদকে বন্ধুরূপে বরণ করে, তাহারাই সমাধানে সমর্থ। ভাটোয়ারী হইতে পদপ্রদর্শক মিলিলেও আমাদের নির্ভরতা পরীক্ষার্থ প্রভুর ইচ্ছায় সে সরিয়া যায়. মনে বল থাকিলেও ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া নিশাগমে বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়ি। গমনেই অধিকার, সুখ-দুঃখে তো নয়, ভাবিয়া প্রত্যুষে ভ্রমণ আরম্ভ, আর উহা বিনা গত্যন্তরও ছিল না। কিন্তু সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তুষারপাত হওয়ায়, অবসন্নভাবে একটি প্রস্রবণসমীপে উপবিষ্ট হইলে, হরিভাই বলেন—পাণ্ডবদের মতো আমাদেরও মহাপ্রস্থান উপস্থিত, এস, প্রভুর ধ্যানেই দেহত্যাগ করি। ধ্যানযোগে সমাহিত বা শৈত্যপ্রভাবে কতোক্ষণ অঘোর ছিলাম, বলা যায় না। মরণ বলিলেই মরা যায় না, যাঁহার ইচ্ছায় প্রাণের সঞ্চার, তাঁহার ইঙ্গিত বিনা বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং মেঘমুক্ত সূর্য-প্রকাশে দেখা যায়—অদূরে উচ্চ পর্বতে একটি পর্ণ-কুটির। তথায় আশ্রয়লাভে বহুক্ষণ অভিভূত অবস্থায় কাটে ; সংজ্ঞালাভে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চলিতে চলিতে সন্ধ্যাগমে বৃক্ষতলে আশ্রয়। গান্ধারী দেবী কহিয়াছেন—বাসুদেব, জরা কষ্ট, পুত্রশোক মহাকষ্ট, কষ্টতরোত্তর ক্ষুধা ; সুতরাং ক্ষুধার তাড়নে একদিন হরিভাই বৃক্ষপত্র-গ্রাসে বমনোদ্যত, শেয়াকুল তুলিতে আমার হাত কণ্টকে ক্ষত, শরৎ কিন্তু ধীর স্থির। এইরূপে দিনত্রয় অনশনে শ্রান্তভাবে বিচরণ করিলে পরদিন অপরাহ্ণে কোলাহল করিতে করিতে কোথা হইতে একদল পাহাড়ী উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে পথহারা ভাবিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। তখন মনে হইল—পরীক্ষা পূর্ণ হওয়ায় প্রভু বুঝি সঙ্গী মিলাইয়া দিলেন।

এবার অবতরণ। পার্বত্য ছাগমেষ পর্বতগাত্রে যেরূপ বিচরণ করে, পাহাড়ীরা তদ্রূপ নামিতে লাগিল, কিন্তু একটি বৃদ্ধাকে অক্ষম দর্শনে মহাপ্রাণ শরৎচন্দ্র জীবনের অবলম্বন যষ্টিটি তাহাকে দিতে দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলাম। প্রচুর অর্থ হইতে যদি কাহাকে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া হয়, সে দানে গৌরব নাই ; কিন্তু নিজ প্রাণকে বিপন্ন করিয়া বা জীব-প্রেমে বিভোর হইয়া যষ্টিদান ব্যাপার একমাত্র শরতেই সম্ভবে। এই উৎকট দান শ্লাঘনীয় এবং আমাদের অনুকরণীয়। হৃষীকেশে আত্মদর্শনে যিনি বিগতভী হইয়াছেন, তাঁর পক্ষে আত্মদান অসম্ভব নহে। অনুযোগ করিলে বলেন—ক্ষোভ করিও না। আমি কোনোমতে নামিতে পারিব। পর্বতের তলদেশে এক খরস্রোতা তটিনী, জল জানুপ্রমাণ হইলেও অবিরত ঘূর্ণমান হওয়ায় তলস্থ শিলাখণ্ড পিচ্ছিল ও গোলাকার; অবলম্বন বিনা অতিক্রমকালে নিপতিত হইয়া স্রোতোবেগে যখন দশ বারো হাত ভাসিয়া যান, তখন আমি ও হরিভাই বহু আয়াসে পরপারে লইয়া যাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শরৎচন্দ্র প্রাণাত্যয়েও অণুমাত্র বিচলিত হন নাই।

দিবাবসানে যে স্থানে পৌঁছানো যায়, তাহার নাম বুড়া কেদার, ইহা একটি জনাকীর্ণ পল্লী। আমরা জানিতাম মাত্র এক কেদার, এখানে শুনা গেল—পঞ্চ কেদার, বুড়া কেদার তাহার অন্যতম। অনশনক্লিষ্ট বলিয়াই হউক বা বালস্বভাবেই হউক, স্নানের সময় শরৎচন্দ্র মনে ভাবেন—ঠাকুর যদি এখানে লুচি খাওয়ান, তবে বুঝিব যে, আমায় ভালো-বাসেন। ভক্তবাসনা ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। তাই নদী হইতে উঠিবামাত্রই এক ব্যক্তি আগ্রহ করিয়া লইয়া যায় এবং বাঞ্ছিত লুচি (পুরি) খাইতে দেয়। আমাদের জন্য চাহিলে সে বলে—তুমি ইচ্ছা করেছিলে, তোমাকেই দেওয়া হইল। ইহাতে প্রতীয়মান হয়; ভক্তবৎসল প্রভুই যেন পাহাড়ী বেশে তাঁহাকে লুচি খাওয়ান। প্রভুর করুণায় বিস্মিত

ও নিজ আচরণে লজ্জিত হইয়া ব্যাপারটি আমাদের বলেন। দিন দুই বিশ্রামের পর কঠিন কেদার দর্শনে যাত্রা করা হয়। অতিকষ্টে অসংখ্য পর্বত লঙ্ঘনে ভূস্বর্গশিখরস্থিত দেবদেব কেদারনাথের দর্শন হয় বলিয়া যাত্রিগণ কঠিন কেদার কহে।

দেশ অপেক্ষা পাহাড়ে বর্ষণ অধিক; অবিশ্রান্ত বৃষ্টিমধ্যে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় ত্রিযুগী নারায়ণে আসিয়া দেখা যায়, চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড ধুনি জ্বলিতেছে। পাণ্ডারা বলেন—এখানে কৈলাসনাথসহ নগরাজতনয়া পার্বতীর পরিণয় হয়, কুশণ্ডিকাকালে নারায়ণ-সমক্ষে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, সেই যজ্ঞাগ্নি তিন যুগ ধরিয়া জ্বলিতেছে বলিয়াই স্থানের নাম ত্রিযুগী নারায়ণ। ইতিবৃত্ত শ্রবণে এবং জনপদের সমৃদ্ধি দর্শনে মনে হইল—হয়তো এক সময় ইহা নগরাজের রাজধানী ছিল। এখান হইতে গৌরীকুণ্ড গমন। স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে উক্ত আছে, উমা মাহেশ্বরী গৌরী সমীপস্থ স্বর্ণদী মন্দাকিনীতে স্নান না করিয়া একটি কুণ্ডে ঋতুস্নান করেন বলিয়াই ক্ষেত্রের নাম গৌরীকুণ্ড। কুণ্ডের বারি গন্ধক-গন্ধবিশিষ্ট। পার্শ্বস্থ মন্দাকিনী এতই শীতল যে, পরশে অঙ্গুলি কাটিয়া লয়, কিন্তু কুণ্ডের জল অত্যুষ্ণ। সমুচ্চ সোপানাবলী বাহিয়া অত্যুচ্চ শিখরে উঠিবার কালে পথিমধ্যে যে স্থানে বিশ্রাম করা যায়, তাহার নাম ভীম-গোড়া। পাণ্ডারা বলেন, পাণ্ডবগণের স্বর্গগমনকালে এই স্থলে মধ্যমপাণ্ডব ভীমের শরীরপাত হয় বলিয়া স্থানের নাম ভীমগোড়া। অতি কষ্টে উঠিবার সময় মনে হইল—যেন স্বর্গেই উঠিতেছি। মধ্যাহ্ন-সময়ে শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি—উহা ক্রোশব্যাপী সমতল ও তুষারাবৃত এবং স্বর্ণকান্তি কোমল শৈবালদলমণ্ডিত।

এত দিনের পর যেন সকল কষ্টের অবসান হইল। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখী পৌর্ণমাসী পর্যন্ত স্বল্পাহারে ও অনাহারে পর্বত আরোহণ অবতরণে শরীর মন অবসন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বর্গশীর্ষে কেদারনাথে প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে সে সকলই অপনোদন হইল। বস্তুতঃ সমগ্র হিমালয়ে এরূপ দৃশ্য আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। তুষারাচ্ছন্ন শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখা যায়, রজত-গিরির মধ্যস্থানে দেবদেবের মন্দির; দিক্‌ব্যাপী অভ্রচুম্বী পর্বতশীর্ষ যেন সগর্বে বলিতেছে—মানব! এই পর্যন্ত তোমার গতি, অতঃপর নহে। শিবপূজায় অশিবনাশ জানিয়া, স্বভাবে কঠিন হইলেও, ভক্তি-বিনম্র শৈল হৃদয় বিদারণ করিয়া শ্বেত, পীত, নীল ও স্বর্ণ কমলদলে ব্যোমকেশ-শিরে অর্ঘ্যদান করিতেছে, সে শোভা বর্ণনাতীত। স্বর্ণদী মন্দাকিনী পুণ্য পীঠ-প্রদক্ষিণে পুণ্যতরা হইয়া জীবোদ্ধার মানসে ত্বরান্বিতা হইলেও স্থানে স্থানে কঠিন তুষারাবদ্ধ হইয়াও অন্তঃশীলাভাবে ধাবিতা। প্রকৃতি দেবী পর্যায়ক্রমে কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার ও রৌদ্ররূপ পঞ্চ কুসুমে পঞ্চবদনের পূজা করিতেছেন। হর আরাধনায় অহমিকা হরণ হওয়ায়, মার্তণ্ডও সন্তাপদায়ক না হইয়া সুখদায়ক হইয়াছেন। চিত্তনিরোধ না হইলে শিবতত্ত্ব আয়ত্ত হয় না, তাই শৈলরাজী বলিতেছে—যদি আমাদের মতো স্থির হও, তবে শিবভাব বুঝিবে। আবার পশুপতির গুণগানে সুন্দর বিহগকুল এমন মধুর কাকলী তুলিতেছে, যাহাতে চিত্ত বিনা আয়াসে পরমপুরুষধ্যানে নিমগ্ন হয়।

উচ্চ মন্দির ও প্রাঙ্গণস্থ বৃহৎ নন্দী (বৃষভবাহন) ভগবান শংকরাচার্যের প্রভাব ও সনাতন ধর্মের গৌরব সাক্ষ্য দিতেছে। গৌরীপট্টের উপর শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান—এই শাস্ত্রবিধি সর্বত্র পালিত হইলেও ভূস্বর্গে ব্যতিক্রম। পরব্রহ্ম বৃহৎ; তাই বুঝি মন্দিরমধ্যে সর্বাশ্রয় কেদারনাথ বৃহদাকার হইয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বতরূপে বিরাজমান;

যাহাতে এককালে দশ-বারোজন করুণাপ্রার্থী আলিঙ্গন করিতে পারে ; যেহেতু ফুলদলের পরিবর্তে, আত্মনিবেদনকল্পে আলিঙ্গনই এই বৃহতের পরা পূজা। পূজকেরা কিন্তু নিম্ন পর্বত হইতে গোলাপ পুষ্প আনিয়া সেই বৃহতের এমন সজ্জা করে যে, দেখিলে মন বিভোর হয়। প্রবাদ আছে, নিজ অঙ্গপ্রভাসম রজতগিরি দর্শনে উল্লাস-ভরে মহেশ্বর যখন এই ক্ষেত্রে বিচরণ করেন—বলদর্পিত বনবাসী ভীমসেন ধরিবার অভিলাষে ধাবিত হইলে, ভক্তি বিনা ভগবৎস্পর্শন অসম্ভব, বোধ হয় ইহাই জানাইবার জন্য, কামরূপী মহিষমূর্তি ধারণে পর্বত অন্তরে প্রবেশোদ্যত হন। কিন্তু সমগ্র দেহ অন্তর্ধান হইবার পূর্বেই ভীম বাহু ও বক্ষ বিস্তারে জংঘা আকর্ষণ করায়, তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া কামরূপী কহেন—ইহাই তোর পরা পূজা। তদবধি আলিঙ্গনই কেদারনাথের পরা পূজা হইয়াছে। পূজার উপচারের বালাই নাই, মাত্র অন্নভোগ, তাহাও সধান্য, এবং স্থান-মাহাত্ম্যে অর্থাৎ অতি উচ্চতা ও শৈত্য প্রযুক্ত অর্ধসিদ্ধ। প্রসাদভক্ষণসময়ে মনে হইল—বুঝি বা আমাদের কর্মভোগ নাশ জন্য ঈদৃশ অন্নভোগ-ব্যবস্থা।

শ্রীমন্দিরের পৃষ্ঠদেশে ভৃগুপন্থা, অর্থাৎ মুক্তিক্ষেত্র। পুরাকালে ঋষিগণ এই ক্ষেত্রে যোগাবলম্বনে পরম শিবে বিলীন হইতেন, কিন্তু কালক্রমে তপোবিহীন অনেক সাধু মুক্তিকামনায় ঝম্প-প্রদানে আত্মহত্যা করে বলিয়া সরকার বাহাদুর এই স্থানটি আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মহাভারত পাঠে জানা যায়, এবং পাণ্ডাদের মুখে শুনা যায়—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই ভৃগুপন্থাবলম্বনে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

প্রবলের কাছে সকলেরই পরাজয়, তাই এখানে দুর্দান্ত শীতের কাছে অগ্নিরও তেমন প্রভাব নাই, ধুনি জ্বালাইয়াও অবশ অঙ্গ কদাচিৎ উত্তপ্ত হয়। পাণ্ডারা বলেন—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত এখানে ৺কেদারনাথের অর্চনা হয় ; হেমন্তাগমে তুষারপাতে শ্রীমন্দির আবৃত হইবার পূর্বে স্তম্ভোপরি প্রচুর ঘৃতপূরিত একটি সুগভীর তাম্রপাত্রে, জ্যোতি (দীপ) জ্বালিয়া মন্দিরদ্বার বন্ধ করা হয় ; ঐ সময় সূক্ষ্মশরীরী দেবগণ বাবার অর্চনা করেন, তখন নিম্নস্থিত গুপ্তকাশীতে কেদারনাথের প্রতিনিধি লিঙ্গের পূজা হয়।

আমরা জানিতাম—মাত্র একটি কাশী, এখানে শুনিলাম পঞ্চ কাশী। (১) উৎকলে একাম্র-কানন-ভুবনেশ্বর, যথায় লীলাময়ী ভবানী ক্রীড়াচ্ছলে গোচারণ করেন, এবং যথায় ভগবান পিনাকী অসুরনিধন করিয়া ভগবতীর রম্য লীলাস্থানে অধিষ্ঠান করেন ; এবং যথায় রুদ্রাবতার হনুমন্তের পূজায় প্রসন্ন হইয়া কহেন—ইহা কাশীক্ষেত্র হউক ; তদবধি ইহার নাম হনুমান-কাশী। (২) অসি-বরুণাপরিবেষ্টিত এবং উত্তরবাহিনী জাহ্নবী-পরিষেবিত বারাণসী, যথায় শ্রীবিশ্বনাথ ও ভবানী জীবগণকে নির্বাণপদে প্রেরণ করেন। (৩) ভক্তকে কাশীরাজ্য প্রদানে আশুতোষ যে পার্বত্য প্রদেশে অধিষ্ঠান করেন—তাহার নাম উত্তরকাশী। (৪) সেবকগণের শীতত্রাণ মানসে বিশ্বত্রাতা যে ক্ষেত্রে গুপ্তভাবে বিরাজ করেন—তাহা গুপ্তকাশী। (৫) কৈলাস সদৃশ চিরতুষারমণ্ডিত যে রজতগিরি-শৃঙ্গে রজতকল্পোজ্জ্বল সর্বজীবাশ্রয় কেদারনাথ বিরাজ করেন, তাহার নাম কেদারকাশী। বস্তুতঃ সকল কাশীই মুক্তিক্ষেত্র। শাস্ত্রে আর একটি কাশীর কথা আছে, ইহা নিজবোধ-রূপ। কোটি কোটি মানবমধ্যে যে কৃতাত্মা অন্তর্বহিঃ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে পরিতৃপ্ত, তিনিই ষষ্ঠ মূর্তিমান কাশী।

শংকরের প্রসন্নতায় হরিভক্তিলাভ শাস্ত্রবাক্য। তাই কেদারনাথের পরা পূজান্তে

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শনে যাত্রা হয়। মহর্ষি বাদরায়ণের নাম হইতেই বদরিকাশ্রম; সেকালে ঋষি-তপস্বীরা ফলমূল অশনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন, তাই পরম কারুণিক পরমেশ্বর নীরস প্রস্তরান্তরে মধুর রসের (প্রস্রবণ) ও পর্বত-অঙ্গে বিবিধ ফল ও ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। একারণ হিমালয়ের স্থানে স্থানে সুগন্ধি জাতি, সেফালি, গোলাপের বৃক্ষ-লতা এবং প্রাণধারণোপযোগী প্রচুর হরিতকী, আমলকী, বিল্ব ও বদরী (কুল) বৃক্ষ দেখা যায়; তন্মধ্যে বদরী সুলভ হওয়ায় আশ্রমের নাম হয় তো বদরিকাশ্রম হইয়াছে;

কেদারকাশী হইতে অবতরণ করিয়া গুপ্তকাশী দর্শনান্তে উখীমঠে উপস্থিত হই। ইহা শিবভক্ত বাণরাজের রাজধানী। বাসুদেবসুত কর্তৃক বাণতনয়া ঊষার হরণোপলক্ষে স্ব স্ব ভক্ত-রক্ষার্থ হরিহরের দ্বন্দ্ব বাধিলে ভগবতীর আবির্ভাবে মিলন হয়। ঊষার নাম হইতেই ক্ষেত্রের নাম উখীমঠ। তথা হইতে গোপেশ্বর মহাদেবপীঠ; সমগ্র হিমাচলে এখানে একটি কূপ দেখা যায়। ইহার পর লালসাঙ্গায় অলকানন্দা পারে বদরীরাজ্যে প্রবেশ। পথিমধ্যে সুউচ্চ শৃঙ্গে তুঙ্গকেদার পীঠ, অতিশয় শীতল। এখানে দেখিতে সুন্দর পশমাবৃত একপ্রকার মক্ষিকাদংশনে সকলেই উৎপীড়িত হইলেও সহিষ্ণু শরৎচন্দ্র প্রায় অর্ধক্রোশ যাইয়া বারি আনয়নে আমাদের জীবন দান করেন; ইহার পর যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ। সনাতন ধর্মপ্রচারকল্পে শিবাবতার শঙ্করাচার্য ভারতে যে চারিটি মঠ অর্থাৎ বিদ্যা ও সাধনকেন্দ্র স্থাপন করেন, তন্মধ্যে উখী ও যোশীমঠ হিমালয়ে। তৎপর বিষ্ণু-প্রয়াগ,—যথায় ধৌলি বা ভোটগঙ্গা এবং অলকানন্দা দুটি খরস্রোতা নদীর সঙ্গমস্থানে কামানগর্জনের মতো অবিরত উচ্চশব্দ; নদীতটে রক্তমণি (চুণি) চূর্ণ, এবং অরণ্যে কস্তুরীমৃগ ও হিমালয়ের ঘর্মস্বরূপ শিলাজতু (ঔষধ বিশেষ) পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা অধিবাসীরা লাভবান হয়। এখান হইতে তিব্বত-গমনের একটি পথ আছে। পথিমধ্যে যে সকল স্থান অতিক্রম করা হয়, অনাবশ্যক বিধায় উল্লেখ করা গেল না।

বিষ্ণুপ্রয়াগের পর পণ্ডকেশ্বর, শীতকালে যথায় নারায়ণের প্রতিনিধিবিগ্রহ পূজা হয়। এখানে দীর্ঘ স্বর্ণপুচ্ছ পক্ষী দর্শনে ও অন্যবিধ বিহঙ্গের সুমিষ্ট রব শ্রবণে বড়োই আনন্দ হয়। ইহার পরই শ্রীমন্নারায়ণের পুণ্যপীঠ। সুউচ্চ গঙ্গোত্তরী ও কেদারনাথ তুলনায় শীত এখানে সহনীয়, যেহেতু শৈলমালা তুষারাবৃত নহে; বরং একটি উষ্ণ প্রস্রবণ থাকায় স্নানের বড়োই আরাম। স্বর্ণদী অলকানন্দা অলকাপুরী হইয়া নারায়ণ মন্দিরের বামদিকে প্রবাহিতা; ইহার পূততটে যাত্রিগণ পিতৃতৃপ্তি-বাসনায় পিণ্ডদান করে। তপশ্চর্যাই শক্তিলাভের উৎস, এই হেতু পালনীশক্তি লাভার্থে শ্রীমন্নারায়ণ অনাদিকাল হইতে নরনারায়ণ পুরাণ ঋষিদ্বয়রূপে তপশ্চরণ করিতেছেন, যদনুসরণে ঋষিগণও তপোনিরত। লোকপালনকল্পে নরঋষি নরাধিপরূপে অবতীর্ণ হইলে, অর্থযোজনা আবশ্যক বিধায়, ধনাধিপ যক্ষরাজ অর্থ বহন করেন; তাই শ্রীমন্দিরে ধ্যাননিরত নর, নারায়ণ ও কুবেরের বিগ্রহ অর্চিত। পূজকের উপাধি রাওল অর্থাৎ রাজা। পার্বত্য-প্রদেশে রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তিস্থাপন ব্যয়সাধ্য বলিয়া সরকার বাহাদুর ইঁহাকে একচ্ছত্রী ক্ষমতা দিয়াছেন। ৺কেদারনাথ অঞ্চলের ব্যবস্থাও অনুরূপ।

নারায়ণের নির্বাণ (নগ্ন) মূর্তির দরশন যাহার তাহার ভাগ্যে ঘটে না; কিন্তু প্রভুর কৃপায় রাওলরাজ সাদরে আমাদের ঐ মূর্তি দেখান এবং সৎকারও করেন। কেদারনাথের মতো নারায়ণমন্দিরও শীতাগমে ছয় মাস রুদ্ধ থাকে এবং কেদারের অনুরূপ ব্যবস্থা হয়।

শ্রীমন্দিরের উত্তরদেশে মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রম। পুস্তক-স্তবক দিয়া গৃহ রচনা করিলে যেরূপ দেখায়, বিশ্বরচয়িতার সৃজন-কৌশলে গুহাটি তদনুরূপ হওয়ায়, উহার নাম ব্যাসপুথি বলে। এই গুহাবস্থানে ব্যাসদেব বেদবিভাগ করেন এবং ভারত-পুরাণাদি প্রণয়নে ভগবৎ-মহিমা প্রচার করেন। ব্যাসপুথির উত্তর-পশ্চিমে কিম্পুরুষ খণ্ড অর্থাৎ যক্ষ-কিন্নরপুরী। নামটি শুনিয়াই আসিতেছি, কিন্তু দেখি নাই কিম্পুরুষ কিরূপ? হিমালয় ভ্রমণকালে দিব্যদৃষ্টিতে স্বামীজী দেখেন ও আমাদের বলেন—কিম্পুরুষ অতি রূপবান, কিন্তু হয়গ্রীব। ব্যাসপুথির নিকট দিয়া তিব্বতগমনের একটি পথ; দোভাষী (যাহারা পাহাড়ী ও তিব্বতী ভাষা জানে) সহায়তায় গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ সর্বপ্রথম এই পথেই তিব্বতে যান।

নেপালের পশ্চিম সীমায় কুমায়ুন ও গাড়োয়াল। এক সময় এই প্রদেশস্থ যাবতীয় তীর্থ-পীঠ শ্রীনগররাজের অধিকারে ছিল। ইহা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর নয়। পুরাকালে যে পুণ্যক্ষেত্রে ভবানীপতি কিরাতরূপে বনবাসী অর্জুনের বীর্য পরীক্ষা করেন এবং প্রীত হইয়া পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেন, কেদারখণ্ড মতে ইহা সেই কিরাতা-র্জুনীয় ক্ষেত্র, ভীল্বকেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রাজ্যলিপ্সাবশতঃ নেপালরাজ প্রতিবেশী শ্রীনগররাজ্য আক্রমণ করিলে সরকার বাহাদুর সাহায্যার্থ সেনা যোজনা করেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শ্রীনগররাজ সমগ্র কুমায়ুন এবং গাড়োয়ালের অধিকাংশ—যাহাতে ৺কেদার ও বদরীপীঠ বিদ্যমান, সরকারকে সমর্পণ করেন; এবং ভাবী আক্রমণভয়ে রাজধানী শ্রীনগর হইতে আরও পশ্চিমে স্থানান্তর করিয়া গঙ্গা ও ভীল্বঙ্গনা নদী-সঙ্গম-স্থান টিহরীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি শ্রীনগররাজ পরিবর্তে অধিপের নাম হইয়াছে টিহরীরাজ। কেদার ও বদরীপীঠে যাত্রিপ্রদত্ত প্রণামী ও উপঢৌকন দ্বারা যে অর্থাগম হয়, সরকার বাহাদুর অর্ধাংশ গ্রহণে যাত্রীর স্বাচ্ছন্দকল্পে পথঘাটাদির ব্যবস্থা করেন; এ-কারণ ৺কেদার ও বদরীর পথ সুগম ও পান্থশালাপূর্ণ। অপরার্ধ রাওল-রাজেরা পাইয়া দেবতার সেবা, রাজস্বসংগ্রহ ও শান্তিশৃঙ্খলা সম্পাদন করেন। এখন এই তীর্থপীঠগুলি টিহরীরাজকে প্রত্যর্পণ করিবার জল্পনা হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই, হয়তো এত দিনে বা হইয়াই থাকিবে। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী তীর্থগুলি টিহরীরাজের অধিকারে থাকায়, স্বল্পরাজস্বহেতু তাদৃশ সুগম পথঘাটাদি নাই।

নারায়ণক্ষেত্র হইতে অবতরণকালে নন্দপ্রয়াগ হইতে হরিভাই দেবপ্রয়াগ অভিমুখে চলিয়া যান; শরৎ ও আমি আলমোড়ার দিকে যাই। প্রয়াগতীর্থ সাতটি—একটি মর্ত্যে ও ছয়টি ভূস্বর্গে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এলাহাবাদে যথায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সম্মিলিতা, যথায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে যাহাকে প্রয়াগরাজ বা তীর্থরাজ করিয়াছেন। নখলোমাশ্রয়ে দুষ্কৃতির অবসান, সুতরাং মুণ্ডিত হইয়া এই তীর্থরাজে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়—শাস্ত্রবাক্য; তাই প্রবচন—পৈরাগে মুড়ায়ে মাথা, মর গে পাপী যথা তথা। গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গমস্থান হৃষীকেশ দ্বিতীয় প্রয়াগ। জাহ্নবী ও অলকানন্দা মিলনক্ষেত্র দিব্য বা দেবপ্রয়াগ—ইহাই তৃতীয়; দেবগণ ইহার সেবা করেন। চতুর্থ নন্দপ্রয়াগ। পঞ্চম কণ্ব বা কর্ণপ্রয়াগ। নীল ও দুধগঙ্গা অর্থাৎ মন্দাকিনী ও অলকানন্দার আলিঙ্গনস্থান রুদ্রপ্রয়াগ, যেন হরিহরমিলন, বড়ই রমণীয়; নীল ও শ্বেত বারির আনন্দ-নৃত্য দর্শনে উৎফুল্ল চিত্তে আত্মবিসর্জনে মনে কুণ্ঠা আসে না। রুদ্রদেবের আরাধনায় দেবর্ষি নারদ সঙ্গীত-বিদ্যা লাভ করায়, তীর্থের নাম রুদ্রপ্রয়াগ। ধৌলি বা

ভোট গঙ্গাসহ অলকানন্দার মিলনস্থান বিষ্ণুপ্রয়াগ সপ্তম। স্রোতোবাহিত তৃণের ন্যায়, অদৃষ্টস্রোতে ভাসমান আমরা ভ্রমণশীল ভ্রাতৃসহ মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা জনপদ দর্শনান্তে অবশেষে কাশীধামে আগমন করি, তথা হইতে বরাহনগর মিলন-মন্দিরে।

আচরণ ও কীর্তিকলাপ

গঙ্গা যেমন মড়া এলেন না, সেবাপ্রিয় শরৎ তদ্রূপ, তবে পূর্বে ছিল জীববুদ্ধিতে, এখন সেবা শিববুদ্ধিতে। স্বজনপরিত্যক্ত মহামারীগ্রস্ত রোগীকে সযতনে পরিচর্যা করিতেন॥ আবার অসাধারণ ইন্দ্রিয়জিৎ। সুযোগ অভাবে আমরা সাধু হইতে পারি, কিন্তু গভীর নিশায় একাকিনী যুবতীকে পাইয়াও নির্বিকার; বলেন-প্রভুর কৃপায় সকল নারীতে ভগবতীবোধ হইয়াছে। গিরিশবাবুর ভৈরবের ভাব শুনিয়া বলেন—ঐ ভাবটি আমার ভালো লাগে, তাতে ঠাকুর কহেন—তোর গণেশের ভাব। খেলার সময় একটি বিড়ালীকে মারিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন যে, ভগবতীর অঙ্গে দাগ পড়িয়াছে; জিজ্ঞাসিলে ভবানী বলেন—স্ত্রীজাতি আমারই প্রতিমূর্তি, তাই বিড়ালীকে মারায় আমারই অঙ্গে বাজিয়াছে। এই হেতু নারীকে মাতৃমূর্তি জানিয়া গণপতি বিবাহ করেন নাই।

কুম্ভীর যেমন দন্তগ্রস্ত পদার্থ সহজে পরিত্যাগ করে না, দৃঢ়চিত্ত শরৎ একবার যাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, নিন্দা বা বিদ্রূপ ভয়ে কখনো তাহাকে বা তাহার পরিজনকে পরিহার করেন নাই। সহ্যগুণ অপার। কিছুতেই বিরক্তি বা চাঞ্চল্য নাই; এজন্য স্বামীজী বলিতেন—শরতের শরীরে মাছের রক্ত, কিছুতেই তাতে না। বক্ষ যেমন বিশাল, মহাপ্রাণতাও সেইরূপ, এ জন্য সকলকেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেন; এমন কি, বিপথগামী বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিলেও, বিপদভয় তুচ্ছ করিয়া তাদের আশ্রয় দিতেন ও নিজ আদর্শে তাদের গঠন করিতেন। তাঁর এ কীর্তিধ্বজা এখনও মঠে ও মিশনে বিদ্যমান।

প্রভুর প্রসন্নতায় ব্রহ্মজ্ঞানই কাম্য, প্রচারক হবার সাধ তো মনে কোনো দিনও জাগে নাই। ঠাকুর বলিতেন—অষ্টম খষ্টম না কাটলে অর্থাৎ মান-যশে বিচলিত না হলে, রাসফুল খাওয়া কি না ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; তাই বুঝি প্রভুর বিধানে আহ্বান আসিল—আমাকে সহায়তা কর। বিদ্বান হইয়াও বিনয়-গুণে ধারণা-যেন কিছুই জানেন না; তাই নরেন্দ্রনাথকে জানান—আমার বিদ্যাবুদ্ধি তো জানো, তবু ডাকছ, যাচ্ছি,—এই বলিয়া বিলাত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ইটালীর রাজধানী রোম নগরে সেণ্টপিটার গির্জা দেখিয়া পূর্বভাব জাগরণে (যীশুর পার্শ্বদ কি না) কিছুক্ষণের জন্য অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, কিন্তু ধৈর্যবলে সংযত হন। নরেন্দ্রনাথের আগ্রহে লণ্ডনে পণ্ডিত-সভায় এমন এক হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ করেন, যাহাতে সকলেই আনন্দিত হয়। আবার নরেন্দ্র-প্ররোচনায় প্রভুর লীলার এমন একটি পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন, যদবলম্বনে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলার ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রচার করেন। অধুনা এ দেশে এবং ও দেশে যে কোনো ভাবুক বা ভক্ত প্রভুর লীলানুশীলন করুক না কেন, তার মূলে শরৎচন্দ্র। অতি নিকট অবস্থান হেতু চক্ষু যেমন অঞ্জন দেখিতে পায় না, নিরভিমান দোষে শরৎও সেইরূপ তাঁর গুণগ্রাম জানিতে পারেন নাই।

লণ্ডন হইতে আমেরিকায়। বৎসরাধিক কাল ধর্ম বিষয়ে তথায় এমন সব অভিনব বাণী প্রদান করেন, যাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিত-সমাজে মহাভারত সম্বন্ধে এমন একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন, যাহা সদ্য সদ্যই মুদ্রিত হয়। যাঁহার আতিথ্য

গ্রহণ করেন, সেই বিদুষী মিসেস্ ওলিবুল বলেন—স্বামী বিবেকানন্দের প্রভা মার্তণ্ডসম, সহজে পেঁছানো যায় না ; কিন্তু সারদানন্দ (শরৎচন্দ্র) চন্দ্রমাসম স্নিগ্ধ। আমি বলি চাঁদে কলঙ্ক আছে, শরৎ নিষ্কলঙ্ক ; এবং শরতের চন্দ্র বলিয়া স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল। বিদুষী আরও বলেন—স্বামীজী এ দেশে যে ধর্মবীজ বপন করিয়াছেন, সারদানন্দ তাহাকে ফলবান করেছেন। স্বামীজী যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছেন, সারদানন্দ তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন। জ্ঞানগরিমায় স্বামীজী মার্কিন বিজয় করিয়াছেন বটে, সারদানন্দ কিন্তু অসীম শিষ্টাচার ও মহাপ্রাণতায় তাহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা অনেকে কিন্তু বুদ্ধিবৈগুণ্যে এমন চন্দ্রে কালিমা দিতে প্রয়াস পাই। মহত্ত্বমুগ্ধ জগৎ স্বামীজীকে শিরোমণি করিলেও, কেবল খোঁটা খাবার অর্থাৎ উপহাস ভয়ে অথবা স্বার্থসিদ্ধি বাসনায় যখন সদয়ভাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করি, তখন চন্দ্রে দোষদৃষ্টি বড় বেশী কথা নয়।

প্রভুর মহাবাক্য-প্রেরণায় বৈরাগ্যবানের তপঃকেন্দ্র এবং ত্যাগী ও গৃহীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার জন্য যুগাবতার স্বামীজী মঠ ও মিশনের কল্পনা করেন ; কিন্তু কাহাকে ভিত্তি করিয়া সৌধ রচনা করিবেন, তাই তাঁহার ছায়াসম সমদর্শী শরৎকে মার্কিণ হইতে ফিরাইয়া আনেন। স্বামীজী বলেন—বাল্যাবধি ভাবরাজ্যে বিচরণ করায়, উদ্দেশ্য ও উপায় নির্ধারণে সক্ষম, কিন্তু সকল দিক বজায় রাখিয়া কার্য সম্পাদনে অক্ষম। এই কারণে সহনশীল, সমদরদী ও নিরভিমান শরৎকে প্রয়োজন। শশীও শরতের মতো গুণবান বটে, কিন্তু তাহাকে দক্ষিণাপথে প্রভুর মহিমা প্রচারে মনোনীত করিয়াছি বলিয়া এখানে আবদ্ধ করিতে পারি না। কার্য সম্পাদনে শরৎ-শশী আমার ভুজদ্বয় ; উহারা ভিন্ন এ মহৎ কার্য সাধনে আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখি না।

যৌবরাজে অভিষিক্ত অর্থাৎ স্বামীজীর প্রতিনিধি হইয়া রাজযোগী শরৎ উচ্চ নীচ যাবতীয় কার্য শ্রীভগবানের পূজা বলিয়া সানন্দে সম্পাদন করেন, এবং নবীন সন্ন্যাসীদেরও নবভাবে শিক্ষা দেন। আত্ম-প্রসন্নতা বিনা শাস্ত্র-প্রসন্নতা অসম্ভব ; শরতের উহাই হইয়াছিল বলিয়াই নূতন ভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যায় সক্ষম। ঠাকুর বলিতেন—আগে বস্তু, পরে তালিকা ; যেমন ময়রারা বাবুর বাড়িতে নানা রকম মিষ্টান্ন পাঠাবার সময়, এ এত, ও অত বলে তালিকা করে দেয়। ভগবানই বস্তু, শাস্ত্র তালিকা ; ভগবান লাভ করে ঋষিরা তাঁর বিষয়, আর তাঁকে পাবার উপায় যা বলে গেছেন, তাহাই শাস্ত্র। প্রভুর কৃপায় শরৎ বস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়াই সহজভাবেই শাস্ত্রমর্ম বুঝাইয়া দিতেন। কোনো একজন বেদান্তদর্শন পড়িতে আসিলে বলেন, পড়িয়া যাও, বুঝিতে না পারিলে বলিয়া দিব। ব্যাসসূত্র বেদান্ত উপলব্ধির বিষয়, পাণ্ডিত্যের নয়, অনুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় পুথি না দেখিয়াই তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন। বাসনা না থাকিলেও স্বামীজীর অনুরোধে ধর্মপ্রচার জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে হইত ; তবে আমাদের মতো উপদেষ্টার ভাবে নহে, সমবেদনায় শ্রোতৃবর্গের সংশয় ও বিচ্যুতি আপনাতেই আরোপ করিয়া যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা অপনোদন করিতেন ; এই হেতু তাঁহার বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইত। পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান সহ মিলাইয়া ষট্চক্রবর্ণিত দেহাভ্যন্তরস্থ পদ্ম বা প্রাণশক্তির কেন্দ্রগুলি কিরূপে প্রাণকার্যের সহায়তা করে বা অন্তরে দিব্যভাবের উন্মেষ করে, তাহা এরূপ অভিনবভাবে বুঝাইয়া দেন, যাহাতে সকলেই বিস্মিত হয়।

রসে রসে থাকিয়া সর্বসাধারণের যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান সুখসাধ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক সদাশিব ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম এই ত্রিধারা মিশাইয়া তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেন, যদাশ্রয়ে

বহু লোকের জগজ্জ্বালা নিবৃত্তি পাইয়াছে। কালধর্মে উহাও গ্লানিময় হওয়ায়, পুনরুদ্ভাষণ জন্য ঠাকুর এই মতেও সাধন করেন। যে কারণেই হউক, তখন আমাদের মধ্যে কেহই ইহার অনুশীলন করেন নাই। শরৎ বলেন, প্রভুর ইচ্ছায় শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু যে তন্ত্রশাস্ত্রকে ঠাকুর উচ্চাসন দিতেন, তাহা তো স্পর্শ করাও হয় নাই; বাঞ্ছা, ঐ মতে দীক্ষিত হইয়া সাধ্যমতো অনুষ্ঠান করি। তাই ৺কালীক্ষেত্র কালীঘাটে এক মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশমতো জপযজ্ঞে সমাহিত হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করেন। দেখিয়াছি, বেলুড়মঠে কালীপূজার সময় জপ করিতে করিতে এমন সমাহিত হন যে, মহামায়ার পূজা সাঙ্গ হইলেও সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। যে সুধায় নিজে পরিতৃপ্ত, তাহার পরিবেশ-মানসে 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দিগ্গজ পণ্ডিতেরাও বলেন—এরূপ চিন্তাধারা তাঁহাদের চিত্তে কখনও উদয় হয় নাই। রচনা যেমন উপাদেয়, উৎসর্গও ততোধিক,—যাঁহাদের কৃপায় সমগ্র নারীজাতিকে ভগবতী-বিগ্রহ বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। ঠাকুর বলিতেন—প্রকৃতি-পুরুষ মিলনেই সৃষ্টি, প্রকৃতি শ্রীদুর্গা আর পুরুষ শিব—এই ধারণা হলেই সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। শরতের তাহাই হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ উৎসর্গ-বাণী বলিতে পারিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী (শ্রীমাতাঠাকুরাণীর) মন্দির ও নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিধানে—অর্থাৎ শরতের অভ্যুদয় জন্য স্বাস্থ্যহানি হইলে বলেন—আমা হতে যা হল না, মার পুত্র শরৎ তাহাই করিবে। ঠাকুরের জীবন-বেদ ও গীতাভাষ্য প্রণয়নে অনুরোধ করায় বলেন—কালে শরৎই গীতাতত্ত্ব প্রকাশ করিবে। আর আমাদের মধ্যে যে ভাগ্যবান প্রভুর শ্রীপদে আত্মবলি দিতে পারিয়াছে, সেই মহাত্মাই তাঁহার লীলা-বর্ণনে সমর্থ হইবে, এবং সেই মহাপুরুষই প্রাণাধিক শরৎ।

কে জানিত যে, ঘাস-খড়ের ব্যবসায়ী, উদারপ্রাণ, কেদারনাথ দাস শ্রীমার মন্দির জন্য ভূমি দান করিবে আর উদ্বোধন পত্রিকাও কিছু টাকা দিবে? ইহাতে দেখা যায় যে, আপ্তপুরুষের বাসনা অপূর্ণ থাকে না। উদ্বোধনের সামান্য টাকা হইতে কিছুই হইবে না বুঝিয়া মাতৃগতপ্রাণ শরৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া কার্য সম্পন্ন করেন। মন্দির তো হইল, এবং শ্রীমাও অধিষ্ঠান করিয়া প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু কিরূপে ঋণ শোধ হইবে, শরৎ এখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভিক্ষা দ্বারা আশা পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ প্রণয়নে কৃতসংকল্প হন। এক-আধ দিন নয়, বৎসরাধিক কাল প্রত্যহ একাসনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা মানসিক চিন্তায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকিলেও ভ্রূক্ষেপ নাই; বরং আনন্দ যে, মাতৃমন্দিরের ঋণ শোধে আত্মদান করিতেছি। ঋণ পরিশোধও হইল। বিন্দু বিন্দু তীর্থোদকে উৎকলে ভুবনেশ্বরপীঠে বিন্দুসরোবর যেরূপ পূর্ণ হয়, শরতের বিন্দু বিন্দু রক্তদানে মাতৃমন্দিরও সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বড়োই পরিতাপ—পরের ধনে বরের বাপ আমরা শ্রীমন্দির লইয়া কতোই না গণ্ডগোল করিয়াছি এবং ঈর্ষাবশে উহার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছি; কিন্তু মোহান্ধ হইয়া মুহূর্তকালও ভাবিতে পারি নাই যে, মাতৃসন্তান-হৃদয়ে কতোই না ব্যথা দিয়াছি। বিদেশী ভক্ত যে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষণে প্রাণদানে উদ্যত, আর স্বদেশী সন্তান মোরা মুখে মাতৃভক্তি দেখাইয়া পেটের ছুরিতে পেট কাটিবার মতো আচরণ করিয়াছি। শাঠ্য করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেও, দশে ধর্মে বলিবে—এ অপরাধ অমার্জনীয়।

বিলাতী বিদুষী কুমারী মারগারেট নোবল স্বামীজীর মনীষায় মুগ্ধ হইয়া শিষ্যারূপে কলিকাতায় আসেন, এবং হিন্দু পল্লীতে অবস্থান করিয়া মহিলাগণের নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মাচরণে যোগদানে নিজেকে হিন্দু বলিয়া গৌরব করেন। নানা তীর্থদর্শনান্তে স্বামীজী তাঁহাকে সারদাপীঠ কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ-চরণে ভারত-কল্যাণে নিবেদন করেন বলিয়া নাম হইল নিবেদিতা। ইনি বাগবাজার বোসপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য মহিলাদিগকে ইংরেজি ভাষা ও শিল্পকলা শিখানো, এবং তাঁহাদের সহায়তায় মুখে মুখে সনাতন ধর্ম বিষয়েও জ্ঞানলাভ করা। এই সময় শরৎচন্দ্র গণেন্দ্রনাথ নামে একটি ব্রাহ্মণ বালককে কুড়াইয়া পান ও তাহাকে অল্পবিস্তর লেখাপড়াও শিখান। নিজের ভজন-সাধন ও মঠ-মিশনের কার্যে ব্যাপৃত থাকায় নিবেদিতার সহিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে সকল সময় আলোচনায় অবসর হইত না, এ জন্য গণেনকে তাঁহার কার্যে অর্পণ করেন। শরতের সন্তান বলিয়া শ্রীমাতৃদেবী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করেন, এবং গণেনও শ্রীমার ও শরতের তুষ্টিসাধনে প্রাণার্পণ করে। নিবেদিতা যেমন নানারূপে শিক্ষা দিয়া তাহাকে মানুষ করেন, গণেনও সেই ভাবে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কার্য প্রাণপণে সম্পাদন করে।

বিদ্যালয়টি এতদিন ভাড়া করা বাড়িতে ছিল কেবল শরৎচন্দ্রের উদ্যমে বন্দে মাতরম্ ধনভাণ্ডারের ও অন্যান্য ভক্তের অর্থ-সাহায্যে নিবেদিতা লেনে একটি সুপরিসর ভূমি অর্জিত হইলে, তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় গণেন বহু সাগর ছেঁচে মাণিক আনিয়া, দানবের কল্পনা ও শিল্পীর নৈপুণ্যসম্ভূত প্রাসাদোপম এক বিদ্যায়তন গঠন ও পরিচালন করে। এখন কোথায় সেই গণেন?

শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর মন্দির, নিবেদিতা বিদ্যায়তন, যাহা স্বামীজীর সাধ ছিল, এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও গীতাতত্ত্ব যাহা সংকল্প ছিল, তৎসমুদয়ই শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বে পূর্ণ হইল।

এইবার সারদানন্দ-জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। দেবীভাগবতের আখ্যায়িকা—প্রলয়-পয়োধিতে ভাসমান হরিহরব্রহ্ম দেখেন—কোথা হইতে এক বিমান সমুপস্থিত, আশ্রয়-বোধে আরোহণ মাত্রেই উড্ডীন হইয়া চকিতে ভগবতী শ্রীভুবনেশ্বরীপীঠে অবতরণ করিল। দেবত্রয় মণিময় দ্বীপের অপরূপ শোভা এবং রত্নসিংহাসনস্থা, সখী-পরিবেষ্টিতা মহাদেবী-দর্শনে প্রণতি নিবেদনে অগ্রসর হইলে, মহামায়াপ্রভাবে রমণীত্ব প্রাপ্তে বিস্ময়ে অভিভূত হন। দেখেন, মহাপীঠে সকলেই রমণী; এমন কি পশু-পক্ষীরাও ঐ ভাবাপন্না এবং মহাদেবীর প্রসন্নতাত্মক হ্রীঁ মন্ত্রজপপরায়ণা। পাঠকালে ব্যঙ্গ করিয়া কহেন—পুরুষ নারী হইল—অসম্ভব। এককালে যাকে বিদ্রূপ, হবি তো হ, ভাগ্যে এখন তাহাই ঘটিল। যত বড়ো সাধু হউন না কেন, মোহিনী-পরিবেষ্টিত মহামায়ার সেবাকল্পে আত্মনিবেদন করিলেও, অলক্ষ্যে অনঙ্গ আক্রমণ অসম্ভব নয়; তাই সুপ্রসন্না শ্রীমাতৃদেবী কামজিৎ করণ বাসনায় তাঁহার চিত্তকে প্রকৃতিভাবে পরিণত করিলে শরৎ প্রাণ ঢালিয়া শ্রীসারদেশ্বরী-সেবায় সারদানন্দনাম সার্থক করেন।

আমাদের মধ্যে শরৎই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। প্রভুর প্রসন্নতায় পরাজ্ঞান এবং মহা-প্রাণতায় স্বামীজীর কার্যে আত্মদানে তাঁহার স্নেহাশীষে ধন্য হন। কিন্তু জ্ঞানই বল, আর যোগই বল, স্নেহরস বিনা উৎকর্ষ হয় না; তাই করুণাময়ী শ্রীমাতৃদেবী পীযুষ-ধারায় অভিষেক করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ছায়ারূপে গঠন করেন; সুতরাং শরতেরও পূর্ণতা-প্রাপ্তি হইল। কেবল পূর্ণতা নয়, শ্রীমার অন্তর্ধানের পর, মাতৃভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার

প্রতিনিধিরূপে, তাঁহার সন্তানগণকে তাঁহারই মতো স্নেহ করিতে থাকেন। তাঁহার দেহাবসানে অনেক মাতৃসন্তান বলিয়াছেন—শ্রীমার অন্তর্ধানের পর শরৎ মহারাজের কাছে আমরা যে অবিকল মাতৃস্নেহ পেয়েছি, আজ তার অবসান হইল এবং আমরা আজ প্রকৃতই মাতৃহীন হইলাম। মাতৃভাবাপন্ন বলিয়াই মাতৃকন্যাগণ অসঙ্কোচে তাঁহার কাছে মনোব্যথা জানাইত ; এবং তিনিও তাদের কল্যাণকামনায় এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে, অনেক সময় বিশ্রামলাভও ঘটিত না।

দোষগুণের বিচার না করিয়া অহেতুক ভালোবাসার নাম প্রীতি। এই প্রীতিই পরম সাধন। যাঁহার অন্তরে এই সুদুর্লভ প্রীতির উদয়, আবার সর্বভূতে যাঁর প্রীতি, তিনি দেবতা। এই হেতু ভক্ত, অভক্ত, সাধু, অসাধু সকলের সেবায় শরৎ পঞ্চপ্রাণ নিয়োগ করিতেন ; যদি ষষ্ঠ প্রাণ সম্ভব হইত, তাহাও তিনি সানন্দে উৎসর্গ করিতে পারিতেন। কোনো সময়ে স্বামীজীর সেবা জন্য শিমুলতলায় যাইলে, সাঁওতালদের দারিদ্র্য-দর্শনে বিচলিত হইয়া, অন্নগুলি তাদের দিয়া নিজে মাড় খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, এক আধ দিন নয়, মাসেরও অধিক কাল ; ইহারই নাম পরমা প্রীতি।

জন্মান্তর-সংস্কার বা ইহজন্মের অর্জিত প্রজ্ঞাবলে সদাই গম্ভীরপ্রকৃতি ; মুখে কথা না কহিলেও দেখিয়াছি—তাঁহার গাম্ভীর্যের অব্যক্ত বাণীতে লোকে পরিতুষ্ট হইত ; ব্রহ্ম-বিদ্যা দর্শন মানসে অন্তরে জ্যোতিঃপ্রদীপ জ্বালিয়াছেন বলিয়াই বাঙ্‌নিষ্পত্তিতে অসমর্থ তাই বলেন—ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত সহ্য করব, এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে পরিচয়, তাদের ভাবনায় বিব্রত, তখন নূতন আলাপনে আর কত দুঃখ বাড়াব ? কাজেই গম্ভীর।

হৃদয়ে যাঁর ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠান, তিনি যে মনোজ্ঞ ভাব প্রকাশ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য কি ? এজন্য তাঁহার রচনার ভাব ও ভাষা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। টাউন হলে বিবেকানন্দ সোসাইটির ধর্মমিলন সভায়, ধর্মভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, যাহা শুনিয়া বিদ্বজ্জনমান্য হাইকোর্টের জজ শ্রদ্ধেয় সারদাচরণ মিত্র বলেন—এরূপ সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ রচনা জীবনে শুনি নাই বা পড়ি নাই। এমন কি, ইহার ভাবও কল্পনায় আনিতে পারি নাই ; সারদানন্দ স্বামীর প্রসাদে আমার বিদ্যাগর্ব খর্ব হইল। আবার বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে নূতন ভাবধারায় এমন একটি মনোজ্ঞ অভিভাষণ দেন, যাতে সকলেই মুগ্ধ হয়। তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ আদি পুস্তক ও প্রবন্ধাদি সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য মণিস্বরূপ হইয়াছে।

কথাবার্তায় সহসা অভিমত প্রকাশ না করায় হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন—শরৎ অল্পবুদ্ধি ; কিন্তু তা নয়, স্থিরবুদ্ধিতে জটিলতত্ত্বের সমাধানকল্পে তৃতীয় আশঙ্কা (যে প্রশ্ন উঠা সম্ভব) হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধান্তবাক্যে সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন।

কর্ম করিলেই অভিমান হয়। প্রভুর শ্রীপদে আত্মবলি দিয়াছেন বলিয়াই মঠ ও মিশনের পরিচালনে বিবিধ কর্ম করিয়াও অকর্তা, সুতরাং নিরভিমান। তোমার অনুসরণে লোককল্যাণ হইবে বলায়, বালকের মতো কাঁদিয়া বলেন—আমি কে ? প্রভুর কৃপায় সকলেরই কল্যাণ হবে।

ভগবানে পরাভক্তি এবং তাঁহার মানব সন্তানে পরমা প্রীতি না হইলে প্রকৃত গুরু অর্থাৎ ভবপারের কর্ণধার হওয়া অসম্ভব। শিষ্যের কল্যাণকামনা যাঁর একমাত্র ব্রত, তিনিই যথার্থ গুরু। নচেৎ কাণে ফুঁকে বিত্তহরণ—ব্যবসা মাত্র। শ্রীমাতৃদেবীর অদর্শন পরে,

তাঁরই আদেশমত পিপাসু ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতেন। তাঁহার দীক্ষাদান ব্যাপারও আশ্চর্য, পূজা ও প্রার্থনায় তন্ময় হইয়া ধ্যানযোগে যেন আত্মাকে আকর্ষণ করত মন্ত্রসহ শিষ্য-অন্তরে প্রবেশ করিতেন। ইহাতে উদ্যমজন্য অবসাদ আসিলেও, শিষ্যকে প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আনন্দভাব প্রকাশ পাইত। শিষ্য কর্তৃক গুরুসেবাই চিরন্তন প্রথা দেখিয়াছি—তাহার স্থানে শরৎ আজীবন শিষ্যসেবাই করিয়াছেন। তাহাতে তনুমন, ধনের কার্পণ্যতা ছিল না; শিষ্যপ্রদত্ত পদার্থ গ্রহণে সঙ্কোচ করিতেন, যদি বা কখনো কিছু লইতেন, প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অভাবগ্রস্ত যাহাকে তাহাকে বিতরণ করিতেন; বলিতেন—প্রভুর কৃপায় যখন সকল অভাবই পূর্ণ, তখন দীন-দরিদ্রকে বঞ্চনা করিয়া সঞ্চয়ী হইব?

সহচর হইলেও স্বামীজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বলিতেন, প্রভু সম্বন্ধে আমি বা আমরা যে কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি, তাহা স্বামীজী-প্রসাদাৎ। গুরুপুত্রকে গুরুবৎ জ্ঞানে রাখালরাজকে (ব্রহ্মানন্দকে) অগাধ ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার আদেশপালনে গৌরব বোধ করিতেন। প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, ঠাকুর যাঁদের বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের ন্যায় ঈশ্বরকোটি অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলিতেন, তাঁদেরও সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন; কেবল তাঁদের নহে, সমগ্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উপর তাঁহার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা ছিল। নিরহঙ্কার হওয়ায় কর্মে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু কর্তব্যবোধে কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের বুদ্ধিতে সদোষ হইলেও, প্রভুর কৃপায় সমস্তই নির্দোষ হইত। কলিকাতায় শ্রীমাতৃমন্দির, জয়রাম-বাটীতে সেবাপূজা ব্যবস্থাসহ শ্রীমার স্মৃতি-মন্দির, নিবেদিতা বিদ্যায়তন, কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রম ভবন-অর্জন, এবং রাজপ্রতিনিধির আবাহনে রামকৃষ্ণ মিশনের অপবাদ মোচন প্রভৃতি তাঁহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

ঠাকুর বলিতেন, প্রসূতি নবকুমারের মুখ দেখিলে, গৃহকর্মে আর মন লাগে না, কেবল সন্তানটিকে দেখে আনন্দ পায়। প্রভুর কৃপায় শরতের বিবেক পুত্র জন্মিয়াছিল, অথবা বহুদিন যাবৎ সমুদ্যমে মঠ ও মিশনের বিবিধ কার্যে প্রাণপাত করায়, স্বাভাবিক নিয়মে বিষয়ব্যাপারে বিরাগ আসিয়াছিল। এই হেতু কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীর উপর কার্যভার অর্পণে অবসর লন, এবং অবাধে ভগবচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়।

সর্বপ্রকারে সমুন্নত হইলেও তীর্থদর্শন যে ধর্মাচরণের একটি বিশেষ অঙ্গ, ইহা কদাচ বিস্মৃত হয়েন নাই, অথবা আমাদিগকে তীর্থ-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাবার বাসনায় মধ্যে মধ্যে পুরী ও কাশীধামে যাইতেন। বন্ধুবর্গের শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া স্বচ্ছন্দ গমনে উচ্চশ্রেণীর পাথেয় সমাগম হইলেও, সাধারণের মতো নিম্নশ্রেণীতে যাইয়া অপর পাঁচজনের তীর্থদর্শনের সুযোগ করিয়া দিতেন। যখন যে তীর্থে গমন করিতেন, করণীয় অনুষ্ঠানগুলিও সযতনে পালন করিতেন। যেমন পুরীধামে মহোদধি-স্নান, পীঠদেবতা বিমলার পূজন, স্বর্ণখণ্ড দানে মহাপ্রভুর মুখদর্শন ও প্রদক্ষিণ ইত্যাদি। কাশীধামে জাহ্নবীস্নান, বিশ্বনাথপূজন, ধ্যান, প্রদক্ষিণ, ঘণ্টাবাদন, চরণামৃত পান, প্রাঙ্গনস্থ দেবদেবীর অর্চন; এমন কি, প্রবেশদ্বারের শিকলটিকেও প্রণাম এবং ভক্তপদধূলি গ্রহণ করিতেন। আবার অন্নপূর্ণা-মন্দিরে মহাদেবীর অর্চন, ধ্যান, প্রণাম, প্রদক্ষিণ; জগচ্চক্র-নিষ্ক্রান্তি কারণ মন্দির-পশ্চাতে দেবীচক্রের পূজন ও প্রণমন। তত্ত্ব বুঝি না বুঝি মহাপুরুষ আচরণ অনুসরণ করিতাম। ইহারই নাম আপনি আচরি ধর্ম অপরে

শিখায়। কাশী প্রদক্ষিণ করিলেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বনাথেরই প্রদক্ষিণ হয়, তাই পর্যায়ক্রমে বরুণাতীরে আদি কেশব অসিতীরে দুর্গামাতা, নৃসিংহদেব ও সংকটমোচন পুজা, মধ্যভাগে বীরেশ্বর—যাঁর প্রসাদে মহাবীর নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সংকটনাশিনী দেবী সংকটা, কামাখ্যা বিন্দুমাধব মণিকর্ণিকা, মহাপীঠদেবতা বিশালাক্ষী দেবী এবং পীঠরক্ষক কালভৈরবের দর্শন ও পুজন করিতেন। দেব, পিতৃ ও তীর্থকার্যে বিত্তশাঠ্য করিলে অর্থাৎ অবস্থানুরূপ ব্যয় না করিলে তৎসমুদয়ই পণ্ড হয়, ইহাই শিখাইবার জন্য যাবতীয় দেবস্থানে সাধ্যমত ব্যয় করিতেন। কর্তৃপক্ষ হইলেও কাশীবাসকালে কার্য পরিচালনকল্পে কখনও কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন নাই। বরং অকর্তা হইয়া অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের কর্মিগণ সহ বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেন, এবং অন্ন ও বস্ত্র দানে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তীর্থগুরু পাণ্ডাকে বিশ্বগুরুর অংশ ভাবিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতেন। সুহৃদগণেরও যহাতে চিত্তপ্রসাদ হয়, এ জন্য প্রত্যাগমনকালে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার প্রচুর প্রসাদ আনিয়া তাহাদেরও পরিতোষ করিতেন। আচার্য কি না, তাই আচরণ করিয়া শিক্ষাদান।

বাঙালী আমরা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে স্বতন্ত্রভাবে অর্চনা করিয়া থাকি। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গমধ্যেই একযোগে বিশ্বনাথ-ভবানী বলিয়া পুজা প্রণাম করে। নারায়ণ কর্তৃক সতীদেহ বহুধা দ্বিখণ্ডিত হইলে ভগবতীর অক্ষি বারাণসী-ক্ষেত্রে নিপতিত হওয়ায় ইহা একান্ন মহাপীঠের এক পীঠ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশালাক্ষী এবং পীঠরক্ষক কালভৈরব। তাই প্রাণভরে ইঁহাদেরও পুজার্চা করিতেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে উক্ত—বিশ্বনাথ কাশীরাজ্যে পুনঃপ্রবেশকালে সমাগত দেবতা ও মুনি ঋষিদের কহেন—বারাণসীতুল্য ক্ষেত্র নাই, মণিকর্ণিকাতুল্য তীর্থ নাই, নারায়ণের অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয় নাই, এবং বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ তুল্য দ্বিতীয় লিঙ্গ নাই। যে হেতু ভবানীসহ এই লিঙ্গে আমি অহরহ অধিষ্ঠান করি বলিয়া ঐ দিব্য লিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেন। অধুনা যে অপরিসর মন্দিরে বৃহতের ক্ষুদ্র লিঙ্গ সর্বসাধারণে অর্চনা করে, উহা পরমভক্ত অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের কথায়, বহুকাল ধরিয়া কোটি কোটি ভক্ত ভগবান উদ্দেশে যে ভক্তি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই জমাট বিশ্বনাথভবানী ঐ লিঙ্গে বিদ্যমান। সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ভগবান শংকরাচার্য—কাশীক্ষেত্র আবিষ্কার করত তাঁহার ইষ্টদেবতা ভগবতী অন্নপূর্ণা স্থাপনে কীর্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন। তদবধি সর্ব-সাধারণে মহাপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মাতারই পুজার্চনা করে।

অবতারপ্রতিম স্বামীজী আমাদের ধারণার অতীত। বুদ্ধিমত্তাদোষে বালস্বভাব রাখালরাজের মাধুর্য আস্বাদে বঞ্চিত। পুরুষ হইয়া প্রকৃতিভাব বাবুরাম ভায়ার ভাব বুঝিতে অক্ষম। অজ্ঞ আমরা, সিদ্ধ মহাপুরুষদের ভাব কেমনে বুঝিব? অধ্যাত্মতৃপ্ত তপ্তকাঞ্চনসম শশিভূষণ নিষ্ঠাভক্তির মূর্ত প্রতীক, জড়বুদ্ধি নিষ্ঠাহীন আমরা কিরূপেই বা তাঁর অনুসরণ করিব? শরৎচন্দ্র কিন্তু জীবশিব, অর্থাৎ মানবত্ব হইতে শিবত্বে উপনীত, তাই সমবেদনায় সকলের জন্যই কাতর, এই হেতু তাঁহাকেই আদর্শরূপে বরণ করিতে মনঃপ্রাণ উৎফুল্ল হয়। অসীম করুণায় শ্রীভগবান, যিনি মনোবুদ্ধির অতীত হইয়াও কেবল জীবদায়ে চৈতন্যঘন রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং অভিনব ভাব প্রকাশে সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন ; যে যথায় আছ, আইস, সকলে মিলে তাঁহার স্নেহাকর্ষণে

ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী প্রসন্নতায় তৎসেবিত প্রভুর পদপঙ্কজে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য হই।

প্রাণান্তক পীড়ায় আক্রান্ত হইবার পূর্বে আমায় বলেন—ইচ্ছা শ্রীদুর্গাপূজার পর কাশীধামে যাইয়া শ্রান্ত দেহমনের অবসাদ ঘুচাই, তবে তোমাকেও যাইতে হইবে। যাঁহার আকর্ষণে আগমন, অনুমান—তাঁহারই ত্বরিত আহ্বানে সারদানন্দ সন্ন্যাস রোগে, শান্তচিত্তে জন্মাষ্টমী-বাসরে পরমশিব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হায়! আনন্দ গেল—প্রাণ তো গেল না—ইহাই বিড়ম্বনা! শরৎ কায়া, আমি ছায়া; শরৎ কালো, আমি আঁধার।

এবার আমার পরিচয়, সকলে পূত, আমি ভূত, তাই আদর। প্রথম দর্শনেই প্রভু তাঁর কত কালের আপনার বলে গ্রহণ করলেন এবং মিষ্টমুখও করালেন। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, চিরদিনই ব্রাহ্মণত্বের অভিমান, তাই একদিন জিজ্ঞাসা করেন, সন্ধ্যা করিস? আমি বলি, বারো বৎসর চুটিয়ে করেছি, এখন গায়ত্রী করি। প্রভু বলিলেন—সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। ঔদ্ধত্যর জন্য ধমকও খেয়েছি, তেমনই ভালোবাসাও পেয়েছি, তা এত যে, অপরের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সন্দেহ। আজকাল একটা ঢং উঠেছে যাকে তাকে অন্তরঙ্গ বলে বাড়ানো হয়; আমি কিন্তু বহিরঙ্গ, না হলে প্রভুর খেলা কি করে দেখব বা আনন্দ করব। তবে তিনি আমার অন্তরে বিদ্যমান, এটা অনুমান বা কল্পনা নয়, প্রভুর শ্রীমুখের কথা 'তোর ভেতর আমি যে রয়েছি, তুই না খেলে আমার যে কষ্ট হবে।' একদিন রোক করে বলেন—তোদের এমন করে যাব, যেখানে থাক বা যা কর, সবতাতেই আমাকে দেখবি, যদি এ না হল তো কি হল? ভক্ত নই সে ভক্তি করব, আর ভক্তি কি যা তা ব্যাপার? ঈশ্বরে পরানুরক্তির নাম ভক্তি; আর ঈশ্বর কি পাকা চুল দাড়িওয়ালা একজন দণ্ড ধরে শূন্যে বিরাজ করছেন? যাঁহা হতে স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বসৃষ্টি, এবং যিনি তাঁর সৃষ্টিমধ্যে নানা রূপে বিদ্যমান, এবং অনাগত কালেও যাহা হতে বিশ্ব-সংসার প্রকট হবে, তিনিই ঈশ্বর। এমন ঈশ্বরের ধারণা কোটি কোটি লোকের মধ্যে কাহারও হয় কি না সন্দেহ। তখন তাঁহাতে ভক্তি তো দূরের কথা। ভক্তি ভক্তের ভাবটা যেন কেমন পর পর ঠ্যাকে; প্রভু কতবার বলেছেন, তুই আমার, আমি তোর, তখন আর ভাবনা কি? এমন যে ঠাকুর, মরবার বয়সেও তাঁকে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারলাম না, এই পরিতাপ। পারি না পারি, ঝাঁপ তো দিয়াছি—যদি একটুও ভালোবাসতে পারি, ফল হল উল্টা; প্রভু তো নারাজ, শ্রীশ্রীমাও লাল কাপড় দেখে কেঁদে বললেন, বড় ব্যথা পেলাম; তারপর বাবু বেশ দেখে আহ্লাদ করে বলেন—আশীর্বাদ করছি, তুমি নিত্যজ্ঞানী নিত্যসন্ন্যাসী। সুতরাং আমার ন্যাস এক নূতন রকমের—অপবর্গ আশায় ক্যাংলা কাচ নয়। প্রভু যখন আপনার বলে নিয়েছেন, তখন মুক্তি তো করতলগত। আমি ভালোবাসতে পারিনে বটে, কিন্তু তাঁর ভালোবাসার পার নাই; তাই মাঝে মাঝে দরশনও দেন। এই হেতু গলাবাজী করে বলেছি আর এখনও বলছি—প্রভু আমার জীবন্ত জাগ্রত দেবতা। প্রার্থনা, সকলেরই তাই হউন।

বহুজনবল্লভ প্রভুর ভক্ত অগণন, সুতরাং সকলকে জানা অসম্ভব; তবে যতটা মনে পড়ে আর ভাগ্যবলে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাঁদেরই বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। কিমধিকমিতি।